ইডেনে শীতের দুপুর

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড,
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬
বিক্রয়কেন্দ্র—১১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
৪৪, জনস্টনগঞ্জ, এলাহাবাদ-৩
অশোক রাজপথ, পাটনা-৪

মুদ্রক :
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস,
৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—
মহালয়া—১৩৬৭
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রচ্ছদপট :
শ্রীধ্রুব রায়

অন্যান্য চিত্র :
শ্রীনিত্যানন্দ ভকত

প্রকাশক :
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীজানকীনাথ বসু এম. এ.

মূল্য—৩·৭৫

উৎসর্গ

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মিত্রকে

যাঁর সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে

প্রথম হাজির হয়েছিলুম

ছেলেবেলায় কোলরিজের কাব্যসংগ্রহ পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রী করে দিয়ে নেভিল কার্ডাস ভিক্টর ট্রাম্পারের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। এতবড় আনন্দের বদল কিন্তু তাদেরই হয়েছিল। কাব্যের মূল্যে ক্রিকেটকে কেনার জন্য ক্রিকেটের লেখা কার্ডাসের কলমে সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে। কেবল কার্ডাস নন; আরো অনেক ইংরেজ লেখক মাঠের খেলাকে সাহিত্যের উত্তাপে তুলতে পরিশ্রম করে গেছেন। ক্রিকেটের নেশা আমাকে যখন পেয়ে বসল তখন একদিকে জীবনের মধুর শীতের দুপুরগুলি মাঠেতে দান করলুম ইডেনের প্যাভিলিয়নে বসে, অন্যদিকে রাত্রি দিয়ে এসে চোখ ডুবিয়ে গিলতে লাগলুম ইংরেজীতে লেখা ক্রিকেটের অপূর্ব সব কাহিনী। ক্রিকেট যারা ভালবাসে তারা খেলা কেবল মাঠেই দেখে না, বইয়ের পাতাতেও দেখে থাকে।

দিব্যি আনন্দে খেলা দেখছিলুম এবং খেলার লেখা পড়ছিলুম, বিপদ বাধালেন আমার দুই সংকীর্ণমনা বন্ধু, কথাসাহিত্যিক শংকর ও সুনীলবিহারী ঘোষ। ক্রিকেটের মত আন্তর্জাতিক মৈত্রী-বিধায়ক খেলাও তাঁদের দেশাভিমান দূর করতে পারেনি। সরোষে দাবী করলেন, বাংলাতে ইংরেজীর মত ক্রিকেট লেখা হবে না কেন? এবং হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে আমাকেই পীড়নের লক্ষ্য করলেন। আমি করুণভাবে বললুম, ভাই, একথা সত্যি আমিও ছেলে বয়সে বইয়ের বিনিময়ে খেলা দেখেছি, কিন্তু সে তো কবিতার বই নয়, ইংরেজী গ্রামার বই আর পুরোণো খাতা। বন্ধুরা ছাড়লেন না, বললেন, ওতেই হবে।

সুতরাং কয়েকটি লেখা তৈরী হয়ে গেল। তার একটি গিয়ে পড়ল অগ্রজকল্প শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষের হাতে। সেখান থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীমুকুল দত্তের কাছে। শ্রীযুক্ত দত্ত লেখাগুলোর দায় নিজের ঘাড়ে না রেখে চাপিয়ে দিলেন আনন্দবাজারের খেলাধুলোর পাতায়। প্রকাশের সময় আনন্দবাজারের বার্তা-সম্পাদক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এবং শ্রীভূপেশ মজুমদার নানা উৎসাহ-বচনে আমার সাহস বাড়ালেন। ফলে এক সময় আমি ক্রিকেট-লেখক হয়ে গেলুম। বন্ধু পেলুম অজস্র, এবং শুভানুধ্যায়ী। ক্রিকেট মানুষকে বন্ধু দেয়।

শ্রীবেরী সর্বাধিকারীর কাছে আমি বিশেষ ঋণী, নানাভাবে উৎসাহিত করা ছাড়াও কয়েকটি বই ও ব্লক দিয়েছেন। ক্রিকেটে বাংলার গৌরব শ্রীপঙ্কজ রায় ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু ছবি দিয়েছেন। শ্রীসব্যসাচী সেনের কাছ থেকেও ব্লক পেয়েছি। এবং অবিরত সাহায্য করেছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন ক্রিকেটার-বন্ধু শ্রীপ্রশান্ত ভট্টাচার্য। এ ছাড়াও সাহায্যকারী অনেকে

আছেন, থাকবেনই, কারণ ক্রিকেট খেলে একজন কিন্তু তার জন্ত খেটে মরে এগারো জন। তেমন অনেকের মধ্যে শ্রী[illegible] মিত্র, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ সুনীলকুমার মিত্র, শ্রীনিত্যানন্দ ভকত, শ্রীবিমল ঘোষ এবং শ্রীসন্ধ্যা বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। বুকল্যাণ্ডের বসু ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীগণেশচন্দ্র বসু এবং শ্রীজানকীনাথ বসু এই বইয়ের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্ত চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। এঁরা অন্ধ ফুটবল-ভক্তির জন্ত ক্রিকেটকে দেখতে পারেন না বলে রটনা ছিল, যে দুর্নাম এবার বোধ হয় খণ্ডিত হোল (?)।

ক্রিকেট শুধু খেলা নয় মেলা। মেলা এবং মেলানো তার ধর্ম। কথাটা সত্য, সত্যতর হোক দিন দিন।

মহালয়া, ১৩৬৭ শ. প্র. ব.

১৯৫৯ সালে ইংলণ্ডে ডার্বিশায়ারের সঙ্গে খেলার পূর্বে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ। বাঁ দিক থেকে— মুদিয়া, দেশাই, বোড়পাদে, পঙ্কজ রায়, উমরিগর, বরোদার, মহারাজা, ডি. কে. গায়কোয়াড়, যোশী, নাদকার্নি, কৃপাল সিং, তামানে, সুরেন্দ্রনাথ, আপ্তে, গুপ্তে

আবদুল হাফিজ কারদার
পাকিস্তান ক্রিকেটের সংগঠক

পলি উমরিগর
'তরুণদের মধ্যে তরুণ'

বিজয় মঞ্জরেকর
নিখুঁত স্ট্রোক প্লেয়াররূপে খ্যাত
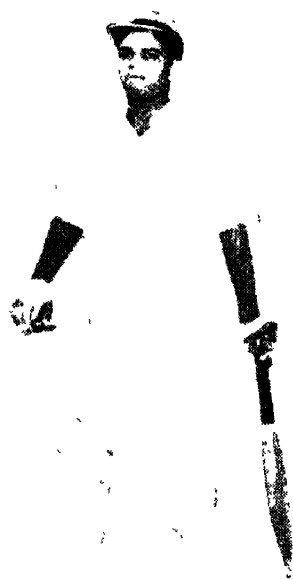
এর নাম ইডেন গার্ডেন

"এর নাম হাইকোর্ট! অবাক হয়ে হাইকোর্টের উঁচু চূড়োটার দিকে চেয়ে আমার মনে হল, এর নাম হাইকোর্ট। বিভূতিদার মুখের দিকে তাকালাম। বিভূতিদার হাত ধরেই এখানে এসেছি।"

একটি সুপরিচিত আধুনিক বাংলা গ্রন্থের সূচনায় এইরকম লেখা আছে। লেখকের উপর আমার বড় রাগ। তিনি আগে থেকে আমার মনের কথা লিখে দিয়ে আমার অরিজিন্যালিটি নষ্ট করে দিয়েছেন। আমার লেখা যিনি পড়তে সুরু করেছেন তাঁকে বিনীত অনুরোধ, ঐ লেখাটি একটু সংশোধন করে নেবেন—হাইকোর্টের বদলে ইডেন গার্ডেন, আর বিভূতিদার বদলে গুণেনদা। পাঠককে বেশী কষ্ট করতে হবে না, হাইকোর্টের উল্টো দিকেই ইডেন গার্ডেন।

গুণেনদার হাত ধরে সেখানে দাঁড়িয়েছিলুম। উঁচু পাতাবাহারের বেড়ার মধ্য দিয়ে যখন প্রবেশ করলুম, হাঁ করে গিলছি সব কিছু। এত সুন্দর বাগান। বা রে, কী সবুজ মাঠ। আঁকাবাঁকা পুকুর। জলে এত শেওলা কেন? ঝিঁঝিঁ পরিষ্কার কবে করবে? সায়েবী বাজনা সুরু হবে কখন? সায়েবী বাজনা কি সায়েবরা বাজায়? ঐ সব নৌকায় শুধু সায়েবরা চড়ে? ঐ ত বাঙালীরা চড়েছে। আমরা চড়ব? বাগানের মধ্যে খেলার মাঠ করার দরকার ছিল কী? কী সবুজ, গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে হয়। ইস, মাঝখানটায় ঘাস করতে পারেনি।

গুণেনদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে হাতে একটি বাদামের ঠোঙা তুলে দিয়ে আস্তে ধমক দিয়ে বললেন,—"চুপ করে বস। খেলা সুরু হবে এবারে।"

খেলা কী দেখেছিলুম, একেবারে কিছু মনে নেই। সবুজ মাঠ, শেওলাভরা ঘন জল, খাঁজকাটা কাঠের প্যাগোডা, সায়েবী বাজনার মাঠ, কলকাতা যাওয়ার অনাস্বাদিতপূর্ব উত্তেজনা, গঙ্গার ভাসমান সেতু। আর সুন্দর সব মানুষ।

অত সুন্দর মানুষে ক্রিকেট খেলে! অমন সুন্দর পোশাকে! পাড়ার অরুণদাও তো খেলতে যায় হাওড়া ময়দানে। কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছি, কেড্‌স জুতোয় সাদা খড়ি লাগাচ্ছে। শার্ট আর প্যাণ্ট বিছানার তলা থেকে বের করে পরেছে। সাবান দিয়ে কেচে ইস্ত্রী হবার জন্য বিছানার তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যখন সেজে বেরুত, আমাদের বলত, দেখবি আজকে সেঞ্চুরী হাঁকড়াব। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম। সন্ধ্যেয় ধরতুম, কী হল অরুণদা, সেঞ্চুরী হল? অরুণদা এমন একটা মুখের ভঙ্গি করত, আমরা একেবারে তুচ্ছ হয়ে যেতুম। কখনও কখনও দয়াপরবশ হয়ে বলত, আজ সেঞ্চুরী হতে হতে বেঁচে গেছে। কতবার যে বেঁচে গেছল সেঞ্চুরী। একবার অরুণদা তার খেলা দেখাবার জন্য আমাদের হাওড়া ময়দানে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, স্টাইলসে নামব দেখবি। রান করা বড় কথা নয় ক্রিকেটে, স্টাইলই আসল। আমি আর আমার ভাইপো খুব ঘাড় নেড়েছিলুম। অরুণদা স্টাইল বলত না সব সময়, বেশী বলত ডাঁট। তা সেবার অরুণদার ডাঁট দেখা হল না। অরুণদার দোষ কী, তাদের ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ঠিক সেই দিনই খেলবার জন্য মাঠে হাজির হয়েছিলেন। অরুণদাই তো তাঁকে জোর করে খেলায় নামিয়েছিল।

যা হক, খুব আনন্দ হয়েছিল। গঙ্গার পালতোলা নৌকোর মত দুটো সাদা পাল টাঙান হয়েছিল মাঠের দু ধারে। লম্বা সাদা আলখাল্লা পরে দুজন রেফারী দুদিকে দাঁড়িয়েছিল। খেলা একদিকে নয়, দুদিকেই হল। ক্যাপ্টেন মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব লোককে ডেকে ডেকে কী সব বুঝিয়ে মাঠের চারধারে পাঠাতে লাগল। তবে খেলাটা খুব সুবিধের হয়নি। ব্যাট্‌সম্যানেরা এমন ভড়কে গিয়েছিল যে, বেশির ভাগ সময় না মেরে বল থামিয়ে দিতে লাগল। জোর বলের সময় তবু দু-একজন মারছিল। আমরা ভেবে পেলুম না, আলতো বলগুলো তারা ছাতু না করে ছেড়ে দিচ্ছিল কেন।

সেবার অরুণদা একেবারে খেলেনি, তা নয়, একজনের পায়ের গোছে বল লাগতে যখন সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেল, অরুণদা তার জায়গায় খেলতে নামল। তারপরে অরুণদা সারাক্ষণ রোদে দৌড়াদৌড়ি

করল, তবু ব্যাটিং করতে দিল না তাকে। আমরা রাগ করলেও অরুণদা না রেগে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিল।

সেবারই মস্ত পাপোষের মত একটা জিনিস দেখেছিলুম মাঠে। অরুণদা হেসে বলেছিল, দূর বোকা, পাপোষ নয়, ম্যাটিং। ওর ওপর খেলা হয়।

গুণেনদার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে গিয়ে হাওড়া ময়দানকে একেবারে যা-তা মনে হতে লাগল। অরুণদার উপর খুব রাগ হল, আমাদের এমন মিথ্যে করে ভুলিয়ে রেখেছিল। এর মাঠ কত বড়। আর পশমের মত ঘাস। রঙ কী। তা ছাড়া মাঠের দুপাশের পাল দুটোও সবুজ। চারদিকে কাঠের সিঁড়ি বসবার জন্য। একটা মস্ত উঁচু কাঠের বাড়িতে কত রান হোল সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যাচ্ছে, গুণেনদা বুঝিয়ে দিলেন। একটা মস্ত টালির বাড়ি থেকে খেলোয়াড়রা বেরুতে লাগল। ঐ গোটা বাড়িটা খেলার জন্য তৈরী হয়েছে? খেলোয়াড়দের জামা-কাপড় কী ফর্সা! অনেকে আবার সিল্কের জামা পরেছে। মাঠটা কত বড়। গোড়ার দিকে খুট-খাট করলেও, শেষে সবাই কী পেটান পেটাতে লাগল। একজন কালো লম্বা লোক নামতে সবাই চেঁচাতে লাগল, ওভার বাউণ্ডারি ওভার বাউণ্ডারি বলে। সে-লোকটাও খানিক পরে তোল্লা মারলে। বল কোথায় উড়ে গেল। একেবারে 'ছুন্নি' হয়ে গেল। তারপরে শুনলুম মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিল। কী চটপট হাততালি পড়ল। আর সেবার গুণেনদা কী খাওয়ান খাওয়ালেন। সারাক্ষণ অবশ্য একটা পিচবোর্ড কিনে (নাম শুনেছিলুম, স্কোরবোর্ড) তার উপর রান টুকতে ব্যস্ত ছিলেন, আমাকে বেশী বকতে দেননি,—কিন্তু খাওয়ার কমতি ছিল না। মসলা-মাখা মুড়ি, আইসক্রীম, প্যাটিস, চপ, কাটলেট মুহুর্মুহু চলল। তাছাড়া চীনে-বাদাম কমলালেবু তো অবিরাম। গুণেনদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আবার কবে আসব?

ইডেন গার্ডেনে যে একবার এসেছে, তার কি রক্ষা আছে। সে আসবে, আবার আসবে। ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা হয়, যার সঙ্গে প্রথম চোখাচোখিতেই প্রেম। To see it is to love it—ইংরেজরা ক্রিকেট সম্বন্ধে বলে। গুণেনদা যদি হাত ধরে ইডেন গার্ডেনে আমাকে না আনতেন,

আমার হিত হত। তাহলে কলেজ কামাই করে খেলার মাঠে ছুটতে হত না। ছাত্ররূপে কলেজ কামাই করে বাড়িতে বকুনি খেয়েছি। আজও বকুনি খাই, তবে প্রিন্সিপালের। শুভার্থীরা অনুযোগ করে বলেন, সিরিয়াস জিনিস ছেড়ে দিয়ে কী ক্রিকেট-সাহিত্য নিয়ে মেতেছি। গুণেনদাই এর জন্য দায়ী। কেন মাঠে আনলেন। একদিন হয়ত বলব, দ্বিতীয় ভাগের মাধবের মত, দাদা, তুমিই এর জন্য দায়ী।

কিন্তু শুধু গুণেনদাকে দোষী করে কী হবে, আমার ভবিতব্য এই। নইলে মিনির স্বভাব অমন হবে কেন। তার যখন ধুলোর তরকারি রান্না করা উচিত কাল্পনিক আগুনে, সে তখন ক্রিকেট খেলবে কেন, আর যদি খেললই, আমাকে টানবে কেন সেই খেলায়? গুণেনদারও আগে মিনি।

আমার মধুর বাল্যকাল।

বসে বসে অঙ্ক কষছি। আমার মহাবীর ভাইপো এসে পিঠে খোঁচা দিয়ে বলল, "এই ছোটকা, চল।"

সে কতদিন আগে হবে। ঠিক মনেও নেই। প্যাণ্টুল পরি, নেমন্তন্ন খাবার সময় গাঁট দিয়ে জরিপাড় কাপড় পরি। ইস্কুলে বেরুবার আগে মা খড়খড়ে কড়া গামছায় মুখ রগড়ে দিয়ে কপালে চুমো খেয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা করেন। তখন দু পয়সায় রসগোল্লা, এক পয়সায় দুটো রসমুণ্ডি, এক মুঠো মুড়িমুড়কি-লজেন্স, কিংবা লাট্টু লেত্তি পাওয়া যায়। এ সেই যুগ, যখন ক্লাস সেভ্‌ন থেকে ইস্কুলে হায়ার ক্লাস সুরু হত, আর তখন থেকে প্যাণ্টুল পরা লজ্জার বিষয় বলে মনে করত ছেলেরা।

ছুটির দুপুর। দাদা বিয়োগ করতে দিয়ে গিয়েছে। মাস ছয়েক ধরে বিয়োগের মহড়া দিচ্ছি, কিন্তু আমার যে উন্নত অবস্থা, তাতে যোগে আছি, বিয়োগে নয়। মরিয়া হয়ে ভাবছি কুলের আচার না আমের আচার, হাঁড়ি থেকে লুকিয়ে কোনটা বিয়োগ করব। ঠিক সেই সময়েই ভাইপোর ডাক। "এই ছোটকা, চল।"

"কোথায় রে!"

"চল না।"

"না রে বিয়োগ আছে, দেখছিস না? দাদা আর আস্ত রাখবে না।"

ভাইপো এমন একটি অঙ্গভঙ্গি করল, যাতে আঁতে ঘা লাগল। কী, আমি এত কাপুরুষ! খিঁচিয়ে বললুম, "কোথায় যাবি বল না?"

"মিনিদের উঠোনে। মিনি, ঝণ্টে, কানাই সবাই সেখানে। কি সব জোগাড় করেছি, দেখ।"

একটা ভোঁতা কাটারি, এক ফালি পিচপাইন কাঠ ভাইপোর হাতে।

উঠে পড়লুম ঝটিতি। সন্ধ্যেয় দাদা ফিরলে খুব পেট কামড়াবে, ঠিক করে ফেললুম। ক্রিকেট খেলতে হবে, পরামর্শ চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। বল, উইকেটের ভাবনা নেই। ব্যাটের জন্যই আটকাচ্ছিল। আজকে বাড়িতে ফলের একটা পেটি আসতে ভাইপো ব্যাটের সমস্যা সমাধান করেছে অবিলম্বে।

মিনিদের উঠোনে 'শিশু টেস্ট' সুরু হল পরমোৎসাহে। ভোঁতা কাটারির সাহায্যে প্রস্তুত খাঁটি কুটিরশিল্পজাত ব্যাট, বড় একটা ভাঙা বালতির উইকেট, কাঠের রঙচটা বল। খেলার নাম ক্রিকেট।

শুধু তাই নয়, প্রগতির লক্ষণ ছিল খেলায়—মিক্সড ক্রিকেট। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলতুম। মিনি ছিল দলের সেরা বোলার।

বয়ঃসন্ধিপূর্বের সেই স্বাধীন আনন্দময় দিনগুলি। তারা গেল কোথায়! যখন যথেচ্ছ খেলা যেত, ব্যাটবলের অভাব হত না (বাড়িতে যতক্ষণ তক্তা-কাঠ আছে), আর আউট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অল্প, চেঁচাবার শক্তি যতক্ষণ।

আমার ছিল চেঁচাবার শক্তি।

ভাইপোর সঙ্গে সেইজন্য ঝগড়া। ভাইপো বটে, কিন্তু প্রায় সমবয়সী। খেলার নিত্য সাথী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কাকা বলতে চায় না, নাম ধরে ডাকে। অনেক রাগারাগি ও খোসামোদের পর তাকে রাজী করিয়েছি। দয়া করে ছোটকা বলে। তবে রেগে গেলে শুধু নাম ধরে ডাকে তাই নয়, নামটাও বেঁকিয়ে ভেঙিয়ে বলে। সে বল দিলে প্রতিটি বল আউটের, না দিলে ঝগড়াঝাটি, চেঁচামেচি। অথচ আউটের ব্যাপারে আমি, কে না জানে, আদালতের পেশাদার সাক্ষী, মিথ্যা বই সত্য বলি না।

ভাইপো আমার থেকে ভাল খেলত। আর মিনিও। বলতে লজ্জা। মিনিকে বড় ভয় করতুম সে যখন নাক কুঁচকে ঘেন্নার সঙ্গে বলত, মিথ্যুক।

মিনি মারা গেল হঠাৎ।

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, সে হারাল তার ভাবী ক্রিকেট-অধিনায়িকাকে।

মরে বেঁচে গেল মিনি। তাকে আমার বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি বলের পর বলতে হল না দীর্ঘশ্বাস ফেলে—My bowled hero. যেমন বলতে হয়েছিল—

বিলেতের মাঠে কেম্ব্রিজের ছোকরা ক্রিকেটার দারুণ তোড়জোড় করে বুক ফুলিয়ে খেলতে নামছে। সেই বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধগমন দেখে মাঠের বাইরে অপেক্ষমানা তার প্রণয়িনী গর্বে উচ্ছ্বাসে স্বগতোক্তি করল—My bold hero.

তার আগে দুটোর নাক থেঁতলেছে, একজনের বুকে বেজেছে বজ্র, চতুর্থ জনের আঙুল ফুলে দুর্ভাগ্যের কলাগাছ। বিপক্ষে বল করছে একটি সাদা ফ্লানেল-ঢাকা দৈত্য।

এই সময় যে বুক ফুলিয়ে নামতে পারে, একজন কেন, সকল দর্শিকাই তার প্রণয়িনী।

প্রথম বল ছিটকে দিল 'আমার হীরোর' হাতের ব্যাট এবং মাঠের উইকেট।

বিমর্ষ তরুণী যথাসাধ্য বুকের ভালোবাসা ও মুখের আলো বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে উচ্চারণ করল—My bowled hero.

আমি জানি, মিনি বেঁচে থাকলে তার দীর্ঘশ্বাসের শেষ থাকত না।

আমরা কিন্তু দ্রুত এগিয়ে গিয়েছি। মিনিদের উঠোন থেকে গলিতে, গলি থেকে পাড়ার মাঠের আনাচে কানাচে।

সাহস বেড়েছে, শক্তি বেড়েছে, আর বেড়েছে কল্পনাশক্তি। খেলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াসধন্য সূচনা। ইস্কুলে যাবার জুতোকে খেলার বুট, ছেঁড়া মোজা কেটে অ্যাংক্লেট ও না-ক্যাপ এবং খড়ের বিঁড়ের চারপাশে কাপড়ের পাড় জড়িয়ে টেনিকয়েট।

সেই সময় একদিন বুকে এসে লাগল একটি বল। এক ধাক্কায় চলে গেলুম ইডেন গার্ডেনে। কথাটা খোলসা করে বলা দরকার।

গুণেনদারা চৌধুরীর সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিলেন স্কুলের মাঠে। সত্যিকারের ক্রিকেট। তেলমাখানো ব্যাট, পায়ে-জড়ানো প্যাড, এবং লাল চামড়ার সেলাই-করা বল। গুণেনদা হাঁকড়ালেন একটা বল। আমি তখন ঝণ্টের সঙ্গে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়দের কাপুরুষতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম। ছিঃ, প্যাড পরে আবার খেলা! বলটা প্যাডহীন খোলা বুকে এসে লাগল।

গুণেনদা সেই থেকে স্নেহ করেন আমাকে। নর্দমার বল কুড়োবার এবং বিনিময়ে খেলার শেষে কয়েক ওভার ব্যাট করার সৌভাগ্য পাড়ার সমবয়সী অন্য ছেলেদের বাদ দিয়ে আমারই জুটে গেল। গুণেনদাকে ধরেছিলুম, ইডেন গার্ডেনে খেলা দেখতে নিয়ে যেতে হবে।

"এই ইডেন গার্ডেন"
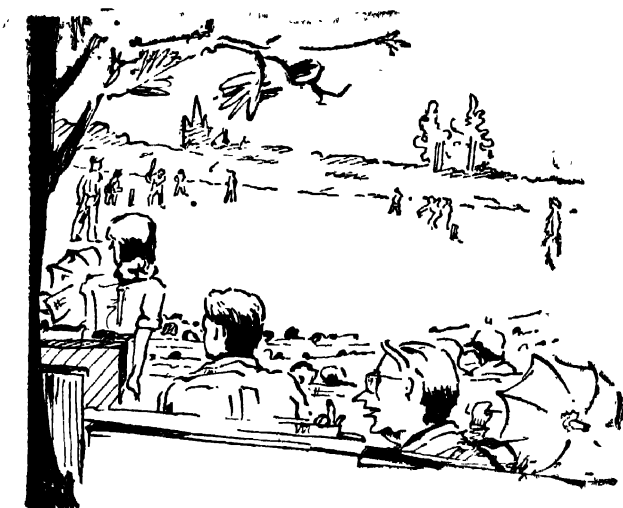
খেলা দেখতে সুরু ক'রে দিয়েছি। রক্তে ঢুকে গেছে ক্রিকেট। গলিতে নেট প্র্যাকটিশ। মাঝে মাঝে বে-পাড়ার সঙ্গে ম্যাচ। হাওড়া ময়দানে, শিবপুরের মাঠে খেলা দেখা। কখনো বা হাঁটতে হাঁটতে গড়ের মাঠে হাজির। এক পয়সায় দুটো আখ কিনে নিয়ে তাই কামড়াতে কামড়াতে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি ভাইপোর সঙ্গে, খেলা দেখার জন্য। বাকি সময় খবরের কাগজে চোখ ডুবিয়ে ক্রিকেটের খবর গেলা। আর স্বপ্ন দেখা। পরীক্ষার আগে মা সরস্বতী একটু রাগারাগি করতেন, বাকি সময় অবাধ্য ছেলেগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশে পাশে উৎসাহও ছিল আমাদের অপকর্মে। সর্বকর্মের শিরোমণি গুণেনদা তো আছেনই। মিত্তিরদার সঙ্গেও ভাব হয়ে গেছে। মিত্তিরদা পাড়ার পুরোনো চাম্পিয়ান খেলোয়াড়। ক্রিকেটের চলন্ত পাঁজি। হাঁ করে তাঁর মুখ থেকে খসে-পড়া গল্প গিলতুম। আর বল পেয়েছিলুম পি চৌধুরীর আশ্রয়ে। তাঁকেই সবচেয়ে শ্রদ্ধা করতুম। চৌধুরী সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, না না কিছু অন্যায় হয়নি, পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলোও চাই। তবে বাড়ীতে বলে যাবি। আমি তখন রগড়ে রগড়ে চোখ লাল করে ফেলেছি। চোখের জলে নাকের জলে মুখ একাকার। বাবা আমাকে ধরে এনেছিলেন চৌধুরীর কাছে। রেগে মেগে বলেছিলেন, দেখুন স্যার ছেলের কাণ্ড, স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে বাবু যাচ্ছেন ভাইপোর সঙ্গে খেলা দেখতে। পড়া-শোনা নেই যত বদ মতলব। কোন্‌দিন গাড়িচাপা পড়ে বাপ-মাকে কাঁদাবে। চৌধুরী বলেছিলেন, ঠিক আছে বোস্‌ মশাই, ওকে বুঝিয়ে বলছি।

আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে নেপোলিয়ানের আবির্ভাব হয়েছিল সেই কালেই। আমার না-দেখা-নেপোলিয়ান কিন্তু সেণ্ট হেলেনায় যান নি। উল্টোপক্ষে ডিউক অব ওয়েলিংটনের যে দুর্দশা হয়েছিল তাঁর হাতে পড়ে—আহা, আমার করুণা হয় সেকথা ভাবলে।

ডন ব্রাডম্যান কি ক'রে নেপোলিয়ানের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন আমার শৈশব-স্মৃতিতে, তা স্পষ্ট ভাবে মনে করা শক্ত। এ ব্যাপারে দেশ পত্রিকার একটা দায়িত্ব আছে। অতি বাল্যকালে ছিল রামায়ণ

মহাভারতের প্রতি আসক্তি। কিছুদিনের মধ্যে তার সঙ্গে যোগ হোল দেশ পত্রিকা এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নেপোলিয়ান। আগাগোড়া তন্নতন্ন করে দেশ পড়তুম,—'কলেজের মেয়ে' উপন্যাস থেকে গ্রেটা গার্বো, মার্লিন ডিয়েট্রিচের সংবাদে ভরা রঙ্গজগৎ এবং খেলাধূলা। অল্প বয়সে সিনেমা দেখার যুগ সেটা নয়, সে চিন্তাও মনের ধারে-কাছে ঘেঁষত না, কিন্তু বলে দিতে পারতুম শার্লি টেম্পল হাসলে তার গালে কতখানি টোল পড়ে। 'কলেজের মেয়ে' বা 'রঙ্গজগৎ' সম্বন্ধে ছিল খাঁটি 'অ্যাকাডেমিক ইনটারেস্ট',—মন জুড়ে থাকত খেলাধূলার পাতা, যদি ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার খেলা হয় আবার। সে সব দিনে আমাদের মন উঠত না দু'শোর কম রানে, সেঞ্চুরী ইত্যাদিকে কেয়ারই করতুম না। সত্তর-পঁচাত্তর ব্যাটসম্যানের ব্যর্থতা বলে মনে হোত, সে ব্যাটসম্যান যদি আবার অস্ট্রেলিয়ার হয়। অস্ট্রেলিয়ার কোনো খেলোয়াড়ের গোল্লা আমার 'কচি' বুকে গোলার মত এসে লাগত। কী স্বাভাবিক মনে হোত ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের শূন্য। তা যেন আমারই দান।

মনেপ্রাণে ইংরেজকে ঘৃণা করতে শিখেছিলুম। সুভাষচন্দ্র, ব্রাডম্যান, নেপোলিয়ান ইংরেজের মহাশত্রু। আমার হৃদয়ের তিন সূর্য, প্রবাদ-বিরোধী হলেও একই আকাশে উদিত, উজ্জ্বল। আজো কি এঁদের বিষয়ে আসক্তি গেছে?

এ সেই বয়স যখন খেলায় মনোরম পঁয়ষট্টির জন্য মন ব্যাকুল হয় না। দুশো পঁয়ষট্টি দেখতে পেলে তবে কিছু খুশী হওয়া যায়। 'কিভাবে করা হোল' নয়, কত সংখ্যায় করা হোল, তার হিসেবে মন ব্যস্ত থাকে। ইংলণ্ডকে মার দিচ্ছে ব্রাডম্যান-পন্সফোর্ড, আর সে কি মার! ভারতবর্ষে যা দিতে পারিনি, বিদেশী লোক ব্যাটের দ্বারা তা দিলেও মনে 'বন্দেমাতরম্' বাজত। নইলে গোষ্ঠপালের ভক্ত ছিলুম কেন? পি. চৌধুরী আমাদের বলেছিলেন, জানিস্ গোষ্ঠপালের খালি পা লোহার মত। এমন কিক্ দেয়, গোরাগুলো তাদের ষাঁড়ের মত চেহারাশুদ্ধ দশহাত দূরে ছিটকে যায়। কতদিন গবেষণা করেছি কোনো এক পরিচিত মোটা লোককে ভেবে নিয়ে, দশ হাত দূরে তাকে লাথি মেরে পাঠানো কি রকম কাণ্ড!

আমার ব্রাডম্যান তাই কোনো দোষ করতে পারেন না। তিনি যে ইংরেজকে নাকাল করেছেন! সেদিন কি দেশ পত্রিকার খেলাধুলার সম্পাদক ভাবতেও পেরেছিলেন, তাঁর রুটিন-মাফিক রচনা (না কি তিনিও আমারই মত অনুপ্রাণিত ছিলেন ?) একটি শিশুচিত্তে কতখানি আলোড়নের সৃষ্টি করত ? কিছু সময়ের জন্য কৃত্তিবাস-কাশীদাস পর্যন্ত 'পরাভূত দেবতা' হলেন। তবে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের উপর শেষ অবধি জেতা শক্ত। তাই ব্রাডম্যান, নেপোলিয়ানের অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করে সহসা বৃহন্নলা হয়ে দাঁড়ালেন। মহাভারতের যে অংশটা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল—বিরাট রাজার গোধন ফিরিয়ে আনার জন্য বৃহন্নলাকে সারথি ক'রে উত্তরের যুদ্ধযাত্রা। গায়ে রোমাঞ্চ হোত যখন আমার হীরো অর্জুন তাঁর দশনামের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন আর উত্তর চোখ বড় বড় করে শুনছে। উত্তরের বিস্ময়ে বিমূঢ় অবস্থা দেখে পরম খুশী হয়ে আমি ভাবছি, তবে রে, কতবার মনে মনে তোকে বলেছি না,—ভয় পাস্‌নি, অর্জুন তোর সঙ্গেই আছে, এখন ? ব্রাডম্যানকে ছদ্মবেশী অর্জুন মনে হোত। জানতুম হেলায় একলা তিনি সমস্ত কুরু-পাষণ্ডগুলোকে গো-হারান হারিয়ে দিতে পারেন। উত্তরা পুতুল সাজাবার কাপড় চেয়েছিল উত্তর ও বৃহন্নলার কাছে। সে ব্যাপারটা কিভাবে জানিনা ব্রাডম্যান-পন্সফোর্ড কীর্তির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ব্রাডম্যান ইংলণ্ডের বোলিং-এর ধার একেবারে ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। তবে কি ভিন্ন ভাষায় তার নাম বোলিং-এর বস্ত্রহরণ ?

সেই সময় একদিন কেঁদে ফেলেছিলুম। মনে করতেও এখন লজ্জা হয়। কী ঘেন্না করেছিলুম হাটনের কুকীর্তিকে। সুভাষ বোসকে জেলে পাঠায় যে ইংরেজ, আর ব্রাডম্যানের রেকর্ড ভাঙে যে হাটন,—দুই-ই এক। গারফিল্ড সোবার্স জেনে রাখুন, ব্যাটিংএ বিশ্বরেকর্ড স্থাপনের পর প্রথম যে মালা তিনি পেয়েছেন তা গেঁথেছে আমার 'মনের মালাকর'। রীতিমত কাব্যিক হয়ে উঠেছিলুম সোবার্সের সৃষ্টিতে। হাটনের রেকর্ড ভেঙে তিনি আমার বুকের কাঁটা উপড়েছেন। সোবার্স রেকর্ড করার পরে তবে ফজল মামুদকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোলার মেনেছি। হাটন সে যুগের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোলার ওরিলির বিরুদ্ধে তাঁর রেকর্ড করেছিলেন।

আমার ব্রাডম্যান কোনো ভুল করতে পারেন না, কোনোদিন ন
কোনোমতে না। এইখানেই ফরাসী নেপোলিয়ানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া
নেপোলিয়ানের তফাৎ। সম্রাট নেপোলিয়ানের সবচেয়ে বড় দো
ইংরেজের কাছে তাঁর পরাজয়। নেপোলিয়ান হারলেন কেন, জিততে বি
বাধা ছিল? ব্রাডম্যান তো হারেন নি। একবার ডিউক অব ওয়েলিংটনে
যুগ্ম অবতার জার্ডিন-লারউড সে চেষ্টা করেছিলেন। সেই নৃশংসতা
বিরুদ্ধে সমস্ত বিশ্বের জনমত জেগে উঠে কী ধিক্কার আর অপমানে
অন্ধকারে দু'জনকে ঠেলে দিল!

সম্রাট নেপোলিয়ানের আর এক ত্রুটি সাধ্বী লক্ষ্মী যোসেফিনকে ত্যাগ
ব্রাডম্যান স্ত্রীকে দারুণ ভালবাসেন।

সুতরাং ব্রাডম্যান নিখুঁত।

বাল্যের সুখস্মৃতির মধ্যে ডুবে যেতে কী ভাল না লাগছে! বাল্যকালটাই ভাল। খুব কম জানি তখন। ব্রাডম্যান ব্যাটে ইংরেজকে পেটালেও রাজা-রানীর কতখানি ভক্ত, তা সেদিন জানতে পারলে ভক্তি হয়ত টিকত না। বরাত ভালো জানতুম না। ফলে আবেগ নিরঙ্কুশ হয়েছিল। আমার সেদিনকার ভাবাবেগকে একটি ভারতীয় বালক ব্রাডম্যানের কাছে লিখে পাঠিয়েছে, ব্রাডম্যান তাঁর বইতে যত্নের সঙ্গে সেটি ছেপেছেন। সে চিঠি আসলে আমারই অলিখিত পত্র।—

স্যর ডন ব্রাডমান, এস্কোয়ার,
অস্ট্রেলিয়া।
প্রিয় মহাশয়,

আমি ভারতের অন্তর্গত আসামের একটি ছেলে। আমার বয়স আট বছর। আপনাকে এই চিঠি লেখা আমার পক্ষে উচিত কি না জানি না। যদি আমার দোষ হয়, দয়া করিয়া কিছু মনে করিবেন না। আপনি নাইট উপাধি পাইতে আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে না লিখিয়া পারিতেছি না। আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিবেন। ইতি—

ব্রাডমানকে হাজার হাজার লোক চিঠি লিখেছে। তার মধ্যে উপরিউদ্ধৃত চিঠিটি তিনি আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। নিম্নের চিঠিটিও ;—

প্রিয় ডন ব্রাডম্যান,

অন্তরের অন্তস্তল হইতে আপনার অনুগ্রহপূর্ণ উত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনার কি অপূর্ব সৌজন্য! আনন্দে আমার হৃদয় নাচিতেছে। আমার বাক্ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমি আর লিখিতে পারিতেছি না।

আমি আবার ধন্যবাদ জানাইতেছি—প্রচুর ধন্যবাদ—আন্তরিক ধন্যবাদ। একান্তই আপনার, হে প্রিয় ডন,—

চিরস্থায়ী স্মৃতির কামনায়—

স্যার ডন মন্তব্য করেছেন,—"কোনো অস্ট্রেলিয়ান বা ইংরেজ বালকের পক্ষে বোধ হয় এ চিঠি লেখা সম্ভব হোত না। স্বাক্ষর দেখার প্রয়োজন নেই—সহজেই স্পষ্ট—বালকটির জন্ম ভারতে।"

ডন, আমাদের—আমাকে—চিনলেন কি করে? আশ্চর্য!

রসের সাধারণীকরণ বলে একটা জিনিস আছে। তার মানে, রস যদি উপভোগ করতে হয়, তাহলে একটি বিশেষ পরিবেশ চাই, সেই পরিবেশে সকল সহৃদয়ের মন এক ভূমিতে অবস্থান করে রসগ্রহণে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। যেমন ধরুন নাটক দেখতে গিয়েছেন। সেখানে প্রথম টিকেট কাটলেন। বইটির প্রশংসা আগেই শুনেছেন সঙ্গী-সঙ্গিনীদের কাছে. এ-বিষয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা কেউ কেউ সঙ্গে আছেন। আপনি ঢুকলেন প্রেক্ষাগারে। ভিতরটা কেমন মৃদু আলোয় রহস্যময়। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জন। সিটগুলো প্রায় ভর্তি। এখনও লোক ঢুকছে। অনেক মানুষ, ব্যক্তিরূপে নয়, মানুষরূপে তাদের পরিচয়। সব সার-সার বসে গিয়েছে। ওধারে ঐকতান বাদন হচ্ছে। আপনি মৃদু স্বরে দু-একটি কথা বললেন। অন্যরাও বলছে। আলো আরও ম্লান হয়ে আসছে। ঐকতান আরও ঝম্‌ঝম্‌ করছে। বাজনার আবেগ চূড়ান্ত স্পর্শ করতে চাইছে। পর্দা বুঝি ওঠে, ঘরের আলো নিবু-নিবু—একেবারে নিভে গেল। পর্দা সরে গেল। মঞ্চ আলোয় আলোময়—আপনি একেবারে চুপ, সকলে একেবারে চুপ। এবারে—

এবার বোলিং সুরু হল।

পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয় বুঝেছেন, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সাধারণীকরণ, সহৃদয়সংবাদ বা তন্ময়ীভবনের ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার জন্য ভাল বই আছে, প্রয়োজন হলে নাম করে দেব। আমি বেনামে ক্রিকেটীয় সাধারণীকরণের কথা বলছিলুম। বলছিলুম কিভাবে শীতের সকালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা দেখতে লাইন দিয়েছি ইডেন গার্ডেনে। খুব ভিড়ের সম্ভাবনা, সিজ্‌ন টিকিটের পয়সা জোটেনি। ভোর ভোর বেরুতে হয়েছে। যখন মাঠে পৌঁছেছি, অলস ঘুমের মত তখনও কুয়াশা জড়িয়ে আছে পাইন দেবদারুর পাতায় পাতায়। ওধারে হাইকোর্টের চূড়োটি কেমন মায়াময়। আবছা আলোয় গড়ের মাঠ। কালো নোঙর-করা নৌকোর মত টেন্টগুলো। ওয়ার মেমোরিয়ালের সামনে মাথা-নামানো পাথুরে সৈনিক দুটোর ভঙ্গিতে সুকোমল নমস্কার।

দৌড়ে দৌড়ে আসতে হয়েছে। ইতিমধ্যে লাইন খুব কম হয়নি। আমরা পাঁচজন। তাড়াতাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে দুজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল খোঁজখবরে,—আমাদের লাইনটা ঠিক লাইন কি না, অন্য গেটে ছোট লাইন আছে কি না, চেনাশোনা কেউ আগে আছে কি না, সেখানে ঢোকবার চান্স কি রকম ? কাঁধের ঝোলাগুলো একবার নেড়ে চেড়ে নিই। ঠিক আছে। ওয়াটার বটল, লেবু, মাখনরুটি, সেদ্ধ ডিম। 'বিশ্ব উদ্ধারে' আসার আগে মার কাছ থেকে খোসামোদ করে অনেক কষ্টে জোগাড় করতে হয়েছে। কয়েকদিন বিনাপ্রতিবাদে বাজার করা ও রেশন আনার প্রতিশ্রুতি। দুপুরে ছোটভাই আরো খাবার আনবে। ওকে আবার একদিন খেলা দেখাতে হবে। দূর ছাই, পয়সা জোটে কোথা থেকে। আর একবার বুক পকেটে হাত দিই, ঝোলায় হাত পুরি। ঠিক আছে, বাদলদার দূরবীন, গুণেনদার স্পোর্টস এণ্ড পাসটাইম। বেলা চড়ছে। কুয়াশা সরে গেছে। পা ধরে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যন্ত্রণা। নটার আগে টিকেট দেবে না। কেনরে বাপু, তোদের গ্যালারি কি খেয়ে ফেলতুম। ওই দেখ গ্যাঁড়াকল। আগে থেকে লোক ঢুকে বসে আছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে লোক থাকলে সব চলে বাবা। ওকি মশাই, লাইনে ঢুকলেন কেন ? পেছন থেকে লাইন ম্যানেজ করতে এসে নিজে সামনে ঢুকে যাওয়া ? যে রক্ষক সেই ভক্ষক ! আরে আরে, সামনে আবার গোলমাল কিসের ? যাতো, বেশী কিছু করলে দুটো রদ্দা ছেড়ে আয়। মাগ্‌না— ভোর থেকে লাইন মারছি। আঃ চুপ করুন না মশাই, এটা ক্রিকেটের লাইন, ফুটবলের নয়, সভ্যমানুষের জমায়েত। yes yes, it isn't cricket। এই-ই চুপ ! শালা পি. বি. এস্। ব্যাটা আবার খেলা দেখতে এসেছে, ক্লাসে একটা প্রক্সি অ্যালাউ করে না।

লাইনের অজগর নড়তে লাগল। এক সময় মাঠে প্রবেশ। তার আগে টিকিট কাটার এক গর্তে পাঁচ হাত ঢোকে, অন্য গর্ত থেকে ডাক আসে, এদিকে আসুন না মশাই। টিকিট পেয়েই ঝোলা ব্যাগ সামলে হুটোপাটি করে দৌড়—টিকিটের কাউণ্টার পার্ট পর্যন্ত ছিঁড়তে দেবার তর সয় না। মনোমত সিটের সন্ধান, প্রাপ্তি, উপবেশন। বন্ধুদের সন্ধান।

যদি-আসে-বন্ধুর জন্য গ্যালারিতে কাগজ বিছানো, অপরে কাগজ বিছোলে তার সঙ্গে ঝগড়া। মাখন-রুটিতে দু এক কামড়। কিছু ক্রিকেটের গল্প, ফুটবলের গল্প, পাড়ার গল্প, সিনেমার গল্প। কিছু ঝগড়া, অল্প পরেই ঝগড়ার লোকটির সঙ্গে সিগারেট বিনিময়। মাখন রুটিতে আবার কামড়। খাবার বার করবার আগে নতুন বন্ধুকে খাবার অফার করলে কতখানি আদিখ্যেতা এবং না করলে কতখানি অভদ্রতা তার মানসিক হিসেব। পঙ্কজ গুপ্তের সারা মাঠ চক্কর, হৈ হৈ চীৎকার, আকর্ণ বিস্তৃত পঙ্কজ-হাসিতে দর্শকদের সম্বর্ধনা, গুপ্তের-ম্যানেজ করবার ক্ষমতার প্রশংসা। প্যাভিলিয়নের ধারে খেলোয়াড়দের নড়াচড়া, মালীদের ব্যস্ততা, নেট খাটানো। খেলোয়াড়দের কারও ব্যাটিং, কারও বোলিং, কারও বা শুধু ফ্রি হ্যাণ্ড একসারসাইজ। কোন্‌টা উইকস্‌, কোন্‌টা ওয়ালকট, কোন্‌টা জোন্‌স, কোন্‌টা বা রে, অ্যাটকিনসন, ক্রিশ্চিয়ানী, তার আলোচনা। ময়লা-পড়া দূরবীন ব্যবহারে কোন ফল না পেয়ে খালি চোখে সিদ্ধান্ত করা—সব ব্যাটা সায়েব আর নিগ্রোর চেহারা সমান। নিগ্রো খেলোয়াড়দের অঙ্গভঙ্গি সম্বন্ধে টিপ্পনী—হাসছে দেখ না, যেন পাথর-বাটিতে দই।—ছিঃ মশাই, রঙ নিয়ে ঠাট্টা করেন কেন?—তা করবেন না? দাদা আমাদের দুধে আলতা। হলে কী হবে সাহেবের কাছে আপনাদের উজ্জ্বল গৌরবর্ণও ব্ল্যাক নিগার। মালীদের নেট সরিয়ে নেওয়া, ক্যাপ্টেনের পিচ পরীক্ষা, আম্পায়ারের আগমন, টস্‌, ফলাফল নিয়ে গবেষণা। লাইট রোলার চালান। উইকেট পোঁতা, আম্পায়ারদের বেল সাজানো। হৈ-হৈ হাততালির মধ্যে বল লুফতে লুফতে একটি শ্বেতাম্বর একাদশের মাঠে প্রবেশ। মাঠের নানাদিকে কখনও ইচ্ছামত, কখনও ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ছড়িয়ে পড়া। বলটি ক্যাপ্টেন কর্তৃক একজনের হাতে দেওয়া। তার পুনরায় ওঠবোস, মুক্তহস্ত ব্যায়াম। আবার করতালি। বধ্যভূমে যথাসাধ্য স্মার্টভাবে দুই বীরের প্রবেশ,—ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে মাঠের মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে দুদিকে ভেঙে পড়ো,—মাথার টুপি, কোমরের প্যাণ্ট সামলে সুমলে উইকেটে নীচু হয়ে গার্ড নেওয়া। তারপর সোজা হয়ে সামনে পিছনে আশে পাশে তাকিয়ে আবার টুপি, তারপর প্যাণ্ট ঠিক করে একটু এগিয়ে গিয়ে পিচের কাল্পনিক

ক্ষতে ব্যাট ঠোকা, কুটো পরিষ্কার করা। তারপর ব্যাট পায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে হাতে গ্লাভস্ পরা। তারপর কোনও খাঁটি বাঙালী দর্শকের স্ব-কল্পিত বিলিতী উচ্চারণে—বো-লি-ং-ফ্রম-দ্য-প্যাভিলিয়ন-এণ্ড। তারপর—

সভা হল নিস্তব্ধ। যদি স্থানীয় দল ব্যাটিং করে তাহলে—'দর্শকজন মুদিল নয়ন।'

যাক বাবা, প্রথম বলটা ঠেকিয়েছে বাছাধন!

এই ক্রিকেট। যদি আপনি একদিন যান, দ্বিতীয় দিন যেতে হবে। দ্বিতীয় দিন গেলে তৃতীয় দিন। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বর্ষ। বর্ষে বর্ষে যুগ। কয়েক যুগের জীবন।

সামনের বৃদ্ধটি বললেন, "সারা জীবনই তো খেলা দেখছি। পঞ্চাশ বছরের উপর হল। খেলতুম—"

আমি কিন্তু আর শুনছিলুম না। পঞ্চাশ বছরের উপর! তা আমারই বা কী কম হল? ইডেন গার্ডেনে সেই কবে গুণেনদার হাত ধরে এসেছি। সেই যে এসেছি, প্রতিবারই ফিরে যাবার সময় চোখের তৃষ্ণা পিছনে ফেলে গিয়েছি। তারই তাড়নায় আবার আসতে হয়েছে। এমনি চলেছে বছরের পর বছর। ইডেন গার্ডেনের মায়া থেকে নিস্তার নেই। যদি একবার কেউ ধরা পড়ে, সে সারা পৃথিবীতে খুঁজে বেড়াবে ইডেন গার্ডেন। আর কোথায় আছে এমন মাঠ, এমন ঘাস, এমন খেলা?

"আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।"

ইডেন গার্ডেনের কথা মনে হলে একটা ছবি ভেসে আসে মনে। নবপুরাণ সৃষ্টি হয় চোখের সামনে। দৃশ্যটি এইরূপ—

হাজারে ব্যাট করছেন, ভিনু করছেন বল। পাঠক ধরে নিন, গতদিন গোটা এবং আজকের মধ্যাহ্নভোজন পর্যন্ত খেলে হাজারে করেছেন ১৬৫ রান। এখন দুপুর দেড়টা। ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর। ফিল্ডারেরা টুপি চোখের ভ্রূ পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। সকল বোলার ফিরে গেছেন ব্যর্থ হয়ে। এক ভিনুই ভরসা। এহেন অবস্থায় ভিনু কি ধরণের বল করবেন—বলুন? আকাশের দিকে একটি সুন্দর লাল জিনিস ছুঁড়ে

দেওয়া হোল। তাতে অঙ্গুলির বিশেষ পেষণে কি যেন মৃদু ছলনা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বল উঠছে তো উঠছে। আকাশ ছুঁই ছুঁই। অতটা না ক'রে, শেষ পর্যন্ত টুক করে খসে পড়ল হাজারের ব্যাটের সামনে। সেখানে পড়েই রাগে লজ্জায় একটু এঁকে একটু বেঁকে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না সখা' করে পালিয়ে গেল এলোমেলো। শ্রীযুক্ত হাজারে সবই দেখলেন। লাল বলকে উপরে ছুঁড়ে দেওয়া, তার লুটিয়ে পড়া, আলুথালু পালিয়ে যাওয়া। অমন অনেক দেখেছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশী বাড়াবাড়ি করলে হাতের লাঠি দিয়ে ঠেলে এপাশে ওপাশে সরিয়ে দিলেন সংযত চিত্তে।

পাঠক কি বুঝতে পেরেছেন ওটি লাল বল নয়—লাল আপেল? ভগবানের প্রিয় ধনুর্ধর সন্তান আদমের অধঃপতনের জন্য শয়তান ও ইভের যৌথ চক্রান্ত? পতন হয়েছিল আদমের। অনেক চেষ্টায় সাধনায় আবার স্বর্গোদ্যানে ওঠা গেছে। এখন আর কোনো শয়তানের বা ইভের সাধ্য নেই স্থানচ্যুত করে। শক্ত পাঁজরে দাঁড়িয়ে থাকেন আদম।

হাজারে নট আউট ঘরে ফিরলেন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষে। প্রথম ইনিংসে শূন্য করেছিলেন।

ক্রিকেট-ইতিহাস যাই বলুক, ইডেন গার্ডেন নামকরণের ঐ আমার ব্যাখ্যা।

এই ইডেনে আমার বীরেরা প্রবেশ করছে একে একে। ডন ব্রাডম্যান দূরের দেবতা। তিনি ইডেন মাড়িয়ে গেলেন না। সে দুঃখের শেষ নেই। তা বলে ইডেন তো দেবহীন থাকতে পারে না। আমরা বহু দেববাদী। পঙ্কজ রায় ঢুকে পড়েছেন সেই মাঠে।

বঙ্গের পঙ্কজ-রবি

(পঙ্কজ রায়)

লেখাপড়া শেষ করে আনছি, কলেজের ছাত্র পঙ্কজ রায় কলকাতার মাঠে ব্যাট হাতে আমাদের ক্রিকেটের মরা গাঙ্গে নতুন জোয়ার আনতে সুরু করেছেন। কতদিন ক্লাস-ফাঁকি পা-ছড়ানো আড্ডা ও চীনেবাদামের সঙ্গে উপভোগ করেছি পঙ্কজের খেলা। পঙ্কজ আমাদের হাসি তামাশা ও আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কী ভরসা পেতুম তাঁকে দেখে। তখন আমাদের সেই বয়স যখন একদিকে আছে উত্তেজনার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, অন্যদিকে 'কনসিস্‌টেনসির' প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। টিকে থাকার একটা প্রত্যয়মিশ্র সম্ভ্রম পঙ্কজ আমাদের মনে জাগাতে পেরেছিলেন।

অথচ তখন ছাত্রসমাজে স্টাইলেও প্রায় অদ্বিতীয় তিনি। চোখ বুজে পেটাতে গিয়ে অবিরত ক্যাচ তুলছে, এমন খেলোয়াড়কে মোটে পছন্দ করতুম না। তা না করে যে বেদম পেটাতে পারত, অথচ বল মাটিতে গড়িয়ে ছুটত, তাকে ভালবাসতে বিলম্ব হয় নি। পঙ্কজ তখন আমাদের কাছে সেরা রান-করিয়ে নন শুধু, শ্রেষ্ঠ স্টাইলিষ্টও বটে। পঙ্কজ অনবরত বাউণ্ডারী করেন।

নিরপেক্ষ পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি দেখেন পঙ্কজ সম্বন্ধে আমার ভাবালুতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যৌবনের ভালোলাগা অনেক সময় ভুল করে ভালবাসা। তবু তেমন মধুস্নিগ্ধ বস্তু অল্পই আছে। পঙ্কজকে আমরা পেয়েছিলুম ক্ষ্যাপা আনন্দের জগতে নন্দন চরিত্ররূপে। আর পঙ্কজও আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি দেখেন তাঁকে নিয়ে অযথা তামাশা করেছি। কারণ দূর থেকে কৌতুকের সহজ অধিকার সেদিন আমরা স্বতঃই নিয়ে নিয়েছিলুম।

যদি বলি পঙ্কজ রায় বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ব্যাটসম্যান, আপনারা কি সেকথা মেনে নেবেন? প্রৌঢ় ও

বৃদ্ধরা একথা শুনে মারমুখী হয়ে উঠছেন বুঝতে পারছি। তাঁদের হৃদ্‌হর বঙ্গপ্রবাসী ইঙ্গ এবং বঙ্গনিবাসী ইঙ্গবঙ্গ খেলোয়াড়েরা রয়েছেন। যদি নেহাত আপোষ করেন, বিধু মুখুজ্যে, মণি দাস, নীরজা রায়ে নামবেন। তার তুলনায় পঙ্কজ রায়? চাপা দাঁতে এরপর যে কথাগুলো বলবেন, তার সাদা অর্থ, অমুকদের মত হতে হলে পঙ্কজকে কয়েক জন্ম ঘুরে আসতে হবে। আমি একবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশেষজ্ঞ জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে ক্ষীণকণ্ঠে বোঝাতে চেয়েছিলুম—এই ধরুন পঙ্কজ রায়,—ভদ্রলোক সহসা এমন উদাসীন হয়ে পড়লেন, পাছে আমার মন্তব্যে তিনি সংসার ত্যাগ করেন,—আমি চুপ করে গেলুম সভয়ে।

না কোন সন্দেহ নেই, পঙ্কজ রায় শুধু ইদানীং কালের নন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্যাটসম্যান।

যদি তর্ক করতে চান, আগে স্কোর বইটা সংগ্রহ করে আনুন—

—টেস্টম্যাচে পঙ্কজের সেঞ্চুরীগুলো ;

—রনজি ট্রফিতে পঙ্কজের কৃতিত্ব ;

—ক্লাব-ক্রিকেটে পঙ্কজের কীর্তি ;

—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় পঙ্কজের সাফল্য।

হিসেবে সমতুল তো দূরের কথা, যদি কেউ এর কাছেও দাঁড়িয়েছে দেখাতে পারেন, তাহলে নতুন একজন কীর্তিমান খেলোয়াড়-বাঙালীর আবিষ্কারের গৌরব আপনারই প্রাপ্য।

হিসেবে যখন আপনি পেরে উঠবেন না, তখন কতকগুলো বাঁধা কথা আওড়াবেন। আপনার, আমার, সকলেরই মুখস্থ করা আছে একটি বিলেতি বচন,—'স্কোরবোর্ড একটি গাধা।' সেই কথাটাই বলবেন তো পঙ্কজের বিরুদ্ধে? সহসা আপনি কত রান করা হোল, তার সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তুচ্ছ করে কিভাবে করা হোল তার তত্ত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন নিশ্চয়। মেরুদণ্ডহীন উত্তেজনার পক্ষে আপনাদের বিবেচনাশূন্য হাততালিই বাঙালীকে টেস্ট ক্রিকেটের বাইরে রেখেছে।

খেয়াল রেখেছেন কি বাঙালীকে টেস্ট ক্রিকেটে তুলে দিয়েছে কে?

এদিকে সুবিধা করতে না পারলে একটা বড় কোমল জায়গায় আঘাত করবেন,—পঙ্কজের ব্যর্থতার হিসাব-গ্রহণে আপনার গণিত-প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। জানিয়ে দেবেন পরপর তাঁর ক্রমিক ব্যর্থতার তালিকা।

পঙ্কজের ব্যর্থতাগুলো যখন আমাদের বুকে গুলির মত এসে বিঁধেছে, তখন তার হিসেব নতুন করে শুনব কি? কেবল স্মরণ করিয়ে দিই বিজয় মার্চেন্টের একটি উক্তি: ব্যর্থতা সত্ত্বেও পঙ্কজ রায়কে দলভুক্ত করে রাখার সার্থকতা এই যোগ্য ওপেনিং খেলোয়াড়টি উপযুক্তভাবে প্রমাণ করেছেন।

স্বয়ং পঙ্কজ কি জানেন, তিনি আমাদের কত প্রভাতের চা বিস্বাদ করে দিয়েছেন সংবাদপত্র মারফত, কত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ বিবর্ণ করে দিয়েছেন রেডিওর সাহায্যে? ভালবাসার অনেক যন্ত্রণা। একটি ঘটনা মনে পড়েছে।

সকালে অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকছেন। ঢুকেই নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন, দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে দাও এখনি।

ব্যাপার হোল, ভারত টেস্ট খেলছে। পঙ্কজ অল্প রান করে বিদায় নিয়েছেন। অধ্যাপকের মতে এখনি ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করা উচিত, কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে পঙ্কজ ভালো কিছু করবেনই। আর পঙ্কজ ভালো না করলে টেস্ট ম্যাচের কোনো মাদকতা নেই অধ্যাপকের কাছে—এবং বাঙালীর কাছে।

পঙ্কজের স্বভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক একটি মোক্ষম কথা বলেছেন,—দ্বিতীয় ইনিংসে তার সাফল্য। এর মধ্যে পঙ্কজের চরিত্রের একটি মূল গুণ খুঁজে পাব।

সে কথা পরে, আমি বিচার করতে বসেছিলুম, পঙ্কজ কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ব্যাটসম্যান। আমার না দেখা বাঙ্গালী ব্যাটসম্যানদের খারিজ করছি রেকর্ড বুকের তরবারি চালিয়ে; দেখা ব্যাটসম্যানদের সম্বন্ধে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

আমাকে যদি এখনি সুন্দরতম বাঙালী ব্যাটসম্যানের নাম করতে বলা হয়, বিনা দ্বিধায় বলব,—নির্মল চ্যাটার্জি। নির্মল চ্যাটার্জি সেই শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা আশা জাগান ব্যর্থতার বেদনাকে গভীর করার জন্য। এতখানি

স্বাভাবিক প্রতিভা নিয়ে ইদানীং কোনো বাঙালা খেলোয়াড় এসেছেন কি না সন্দেহ। নির্মলকে আদরের কৌতুকে বাঙালী বলেছে—বাংলার মুস্তাক। খুব যে বাড়িয়ে বলেছে তা নয়। ক্রীজের মধ্যে থেকে খেলার সময় বলের ইতস্তত বিক্ষেপে নির্মল সহজ লাবণ্যে অনেক সময় ছটফটে মুস্তাককে অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু মুস্তাকের পিছনে ছিল হোলকারের কড়া জমি ও শক্ত অধিনায়কের শাসন। নির্মলকে শেখায় কে? বাঙালীকে শেখায় কে?

অমিতব্যয়ী অপব্যয়ী নির্মল বাংলার মুস্তাক নামে সন্তুষ্ট রইলেন, হোলকারের নির্মল, এই নাম সৃষ্টি করতে পারলেন না।

কয়েক বছর আগে ইডেন গার্ডেনে রণজি ট্রফির একটি খেলা দেখছিলুম। তখন পঙ্কজের উঠতি রূপ। পঙ্কজ সেঞ্চুরী করলেন, এত দ্রুত যে, লাঞ্চের আগেই প্রায় হয়ে যাচ্ছিল। নির্মল করেছিলেন সত্তর-পঁচাত্তর মত রান। দলে স্থান থাকা উচিত কি না এই পটভূমিকায় নির্মল খেলতে নেমেছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছিলুম, নির্মলরা স্বদেশের ক্রিকেটের কতখানি ক্ষতি করতে পারেন। বিপুল সম্ভাবনাকে অপচয় করার মত অন্যায় আর কি আছে?

পঙ্কজের সোজা ব্যাটের প্রবল আক্রমণ কি গদ্যময় মনে হয়েছিল সেই অপরাহ্নে নির্মলের ব্যাটিং-এর বিষণ্ণ মাধুর্যের তুলনায়।

অথচ বাঙালীর মনে নির্মলের জন্য আছে বিরক্ত বিদ্রূপ, আর পঙ্কজের জন্য স্নেহের প্রশ্রয়।

কারণ কি জানেন? সংসারী মানুষ বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। উচ্ছৃঙ্খলতাকে এড়িয়ে চলে, খেলার উচ্ছৃঙ্খলতাকেও। অবাঙালী যদি তেমন পাগলামি দেখায়, বাঙালী তার পিছনে হাততালি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ঘরের ছেলের জন্য চাই দায়িত্বস্থির চরিত্র। অবাঙালী মুস্তাককে আমরা ভালবাসব, আর ভালবাসব বাঙালী পঙ্কজকে—যে সংসারের দায় ঘাড়ে নিতে পারবে। উড়নচণ্ডী নির্মলকে নয়।

আধুনিক কালে ব্যাটস্‌ম্যানরূপে কোন্ কোন্ বাঙালী বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছেন?

বিশালদেহ প্রাণশক্তিধর সুঁটে ব্যানার্জি—
খর্বকায় লঘুপদ কার্তিক বসু—
দায়িত্বহীন সৌন্দর্য-শিহরণ নির্মল চ্যাটার্জি।

নির্মলের কথা বলেছি, ব্যাটসম্যানরূপে সুঁটে সম্বন্ধে বেশী কথা না বললেও চলবে। বড় চেহারা, চোখের জোর, কব্জির শক্তি এবং মনের সাহস থাকলে মাঝে মাঝে ব্যাটিংয়ে যে সাফল্য লাভ করা যায়, সুঁটে তাই পেয়েছেন। বাকি থাকছেন কার্তিক বসু। এইখানে আমাকে একটু থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

কার্তিক বসুর যৌবনের খেলা আমি দেখিনি, পড়তি রূপের সঙ্গে আমার পরিচয়। ইন্দোরে মুস্তাক আলীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকারে আমরা বাঙালী ব্যাটসম্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে মুস্তাক কার্তিক বসুর নৈপুণ্যের কথা বলেছিলেন। প্রৌঢ় ক্রিকেট-রসিক, যাঁদের কাছে বাংলার ক্রিকেট বলতে ফ্রাঙ্ক টারান্ট, ক্যাম্বেল, হোসী, বিধু মুখুজ্যে, মণি দাস এমন কি ফল্গু মালী বোঝায়, তাঁরাও কার্তিক বসুর প্রশংসা করেন যথেষ্ট। বিশেষত অন-সাইডে কার্তিক বসু অনবদ্য।

জনৈক ক্রিকেট সমালোচককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তাহলে টেস্ট ক্রিকেটে কার্তিক বসুর স্থান হয়নি কেন? সোজা উত্তর পেয়েছিলুম, টেমপারামেণ্টের অভাব। বড় খেলা খেলবার একটা মেজাজ আছে। সেটার অভাব থাকলে টেস্ট ক্রিকেটার হওয়া যায় না। তাছাড়া সমালোচক যোগ করে দিয়েছিলেন, সে সময় ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যাটিং শক্তির মান উঁচুতে ছিল। 'এবং',—একটু থেমে,—'বাঙালী কর্মকর্তারা নীচুতে ছিলেন।'

কৌতুকভরে বললুম, অথচ মজা দেখুন, কার্তিক বসু ইদানীং একজন সেরা কোচ। শুনেছি তিনি উঠতি ব্যাটসম্যানদের প্রথমেই সোজা ব্যাটের মাহাত্ম্য বোঝান। এবং—টেমপারামেণ্টের!

যেভাবেই হোক, কার্তিক বসুও তুলনায় টিকছেন না পঙ্কজের সঙ্গে। টেমপারামেণ্ট? পঙ্কজের টেস্ট টেমপারামেণ্ট নেই বলবে কে?

এইখানেই পঙ্কজের জয়। চরিত্রের জয়। বাঙালী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চারিত্র শক্তিতে অনন্যভাবে সমৃদ্ধ পঙ্কজ রায়। আমি ক্রীড়াচরিত্রের কথা বলছি।

পঙ্কজের পক্ষ সমর্থনকালে পক্ষপাতীদের যেখানে সবচেয়ে অস্বস্তিবোধ করতে হয়, সেই পরাজয় ক্ষেত্রেই প্রতি-আক্রমণের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সমূহ সুযোগ। মর্মান্তিক রসিকতা করেছিলেন মিত্তির দা। ইংলণ্ডে যখন পঙ্কজের ধারাবাহিক ব্যর্থতা চলেছে, তখন, তার মাঝখানে একদিন মিত্তিরদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওরে একটা মাতালের কথা শোন্। মাতালটি পূজোর সময় তার বড় ভালবাসার বোনটিকে চিঠি লিখছে দুঃখ করে,—'প্রিয় ভগিনী, গত বৎসর ৺পূজার সময় তোমাকে কিছুই দিতে পারি নাই,—এ বৎসর তাহাও পারিলাম না।'

"এস ভাই", আমাদের মিত্তিরদা ভঙ্গি করে হাত জোড় করে বললেন, "আমরা প্রার্থনা করি, মাতালের যেন অবস্থার উন্নতি হয়, তার প্রিয় ভগিনী যেন আগামীবারে সত্যই কিছু পায়। আমাদের প্রিয় পঙ্কজের যেন ব্যর্থতার ঘোর কাটে, তার ব্যাট-হস্ত থেকে আমরা যেন কিছু পাই।"

পঙ্কজ যেদিন ভিনু মানকদের সঙ্গে টেস্টে প্রথম উইকেটে বিশ্বরেকর্ড করলেন, সেদিনও আড্ডায় গিয়ে দাদার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। কিছু বলবার আগেই দাদা বললেন, ওরে বাঙালী একটি আদর্শ পেয়ে গেছে, এবার ক্রিকেট-জগৎ থেকে। তারপর আমাদের বিস্ময়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, এ জিনিস তো আমাদের ধাতে ছিল না, পঙ্কজ পেলে কোথায়?

আমাদের বাক্যস্ফূর্তির আগেই মিত্তিরদা আবার সুরু করলেন, ছাখ, টেস্টে পঙ্কজের পরপর চারটে জীরো সকলেরই খুব হাসির জিনিস, আমিও কম ঠাট্টা করিনি তা নিয়ে (আহা, কি চিত্ত-চমৎকার স্বীকারোক্তি!), কিন্তু ছেলেটা দেখিয়ে দিলে শিক্ষায় কি হয়! বাঙালীরা যখন কিছু কাজ করে, তখন বড় বেশী স্বাভাবিক প্রেরণার উপর নির্ভর করে। অসাফল্যের মুখে একেবারে ভেঙে পড়ে। কিন্তু এ ছেলেটা আচ্ছা তো? অতবড় শূন্যের গহ্বর থেকে উঠে এল, শুধু তাই নয়, একেবারে উঠে গেল চূড়োয়! বাহবা বেটা!

দাদা ঠিকই বলেছিলেন। এইখানেই আছে পঙ্কজের দ্বিতীয় ইনিংসে সাফল্যের সূত্র। পঙ্কজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করতে পারেন। আমি একথা বলতে বাধ্য, সহজ প্রতিভায় পঙ্কজ অসাধারণ নন। কিন্তু কিভাবে পরিশ্রমের পণ্যে দারিদ্র্য নিবারণ করা যায়, পঙ্কজ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। ক্রিকেটের এমন সাধনা কোনো বাঙালী করেছে কিনা সন্দেহ। আমার জনৈক অল্পবয়সী উৎসাহী বন্ধু বলেছিলেন, ক্রিকেট-মাঠে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে পঙ্কজ বলের পর বল ছুঁড়ছেন উইকেটের উপর, এদৃশ্য তিনি বহুবার দেখেছেন। পঙ্কজ যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রশংসা পান এইজন্য পাবেন। নেটে ব্যাট করার বীরত্ব কিংবা বোলিং-এর কলাকুশলতা নয়,—অবহেলিত ফিল্ডিং—নিষ্ঠাভরে তার অভ্যাস করেছেন তিনি। আমাদের তো ধারণা ছিল, এদেশে যিনি ব্যাট ধরে সেঞ্চুরী করতে পারেন, তাঁর কাছে ফিল্ডিং হোল লজ্জাজনক কায়িক পরিশ্রম।

পঙ্কজের ক্রিকেট-জীবনের সব খুঁটিনাটি উপস্থাপিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও বোধ করি না। খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি ভেসে আসছে। মনে পড়ছে, বাংলায় তিন 'প'-এর আবির্ভাব। টেস্ট ক্রিকেটের নিষিদ্ধ ভূমে প্রথম বাঙালী পদাতিকের নাম প্রবীর সেন। প্রথম 'প'। প্রবীর সেন তাঁর ক্রীড়াজীবনের সূচনায়, যেন মনে পড়ছে, আর একজন তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়ের সঙ্গে সেঞ্চুরী করে এসেছিলেন রণজি ট্রফিতে। খবরের কাগজে তুজনের একসঙ্গে ছবি দেখেছিলুম। ব্যাট করতে পারেন, প্রবীর সেন দেখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবীরের ক্রিকেট-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক দিন অনিশ্চয়ের মধ্যে ছিলুম—তিনি কি শেষ পর্যন্ত ব্যাটসম্যান দাঁড়াবেন? হিণ্ডলেকারের পরে উইকেট-কীপার-ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন প্রবীর। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উইকেট-কীপার রূপে যথেষ্ট সাফল্যলাভও করলেন। ভারতে ফিরেও তার রূপ কিছুটা বজায় রইল। কিন্তু—তুঃখ করে লাভ নেই—নিজের ক্রিকেট-জীবন নিজেই নষ্ট করেছেন পি সেন। যদি করে থাকেন, আমাদের কি বলবার থাকতে পারে?

তিন 'প'-এর দ্বিতীয়—পঙ্কজ। তৃতীয় প্রেমাংশু। প্রথম দুজন টেস্ট ক্রিকেটার। প্রেমাংশু গিয়েছেন টেস্ট ক্যাম্প পর্যন্ত। শেষ রক্ষা হয়নি। এই অত্যন্ত উপযোগী অল-রাউণ্ডার খেলোয়াড়টি নিশ্চয় এতবড় খেলোয়াড় নন যে তাঁকে স্থান না দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলতে পারি; কিন্তু একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, প্রেমাংশুর চেয়ে অনেক অযোগ্য টেস্টে খেলেছে এবং যদি প্রেমাংশুকে স্থান দেওয়া যেত, তিনি নিজের অন্তর্ভুক্তির সার্থকতা প্রমাণ করতেন কোনো না কোনো সময়ে।

বাংলা ক্রিকেট তিন 'প'-কে অবলম্বন করে অনেক স্বপ্ন দেখেছে। আনন্দের কথা, একেবারে ব্যর্থ স্বপ্ন নয়।

পঙ্কজের ক্রিকেট-জীবনের সূচনা অল্প অল্প চোখে আসছে। কলকাতার কলেজ-ক্রিকেটে বড় বড় রানগুলো। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট। রণজি ট্রফি। প্রথম অবতরণে সেঞ্চুরী। ভারতীয় ক্রিকেটে সত্যকার অভ্যুদয় বোধ হয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। সেই বছর বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের হয়ে ভালো স্কোর করলেন আগন্তুকদের বিপক্ষে। তারপর আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেই সেঞ্চুরী করলেন কলকাতার মাঠে। যতদূর মনে পড়ে, নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা কাটাতে তিরিশ মিনিটের উপর সময় নিয়েছিলেন পঙ্কজ।

শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরী করেছিলেন।

দশ বছর আগে অল্পবয়সী ছোকরার স্ট্যামিনার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। দশ বছর পরে তিনিই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সহজ বিজয়ের পথে প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯৫৮ সালের বোম্বাই টেস্টকে পঙ্কজ বোধ হয় একা ড্র করিয়েছেন।

১৯৫১ সালে যখন টেস্ট ক্যাম্পে গেলেন পঙ্কজ, তার আগেই প্রদেশ-ক্রিকেটে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। টেস্ট-খেলতে-না-পাওয়া বাঙালী ব্যাটস্‌ম্যানদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র—রণজি ট্রফি, ক্লাব-ক্রিকেট ও প্রদর্শনী ম্যাচ। তিন ক্ষেত্রেই পঙ্কজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যাট ধরলেই সেঞ্চুরী এমন একটা মনোভাব নিজের সম্বন্ধে সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন তিনি।

দাদা ঠিকই বলেছিলেন। এইখানেই আছে পঙ্কজের দ্বিতীয় ইনিংসে সাফল্যের সূত্র। পঙ্কজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করতে পারেন। আমি একথা বলতে বাধ্য, সহজ প্রতিভায় পঙ্কজ অসাধারণ নন। কিন্তু কিভাবে পরিশ্রমের পণ্যে দারিদ্র্য নিবারণ করা যায়, পঙ্কজ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। ক্রিকেটের এমন সাধনা কোনো বাঙালী করেছে কিনা সন্দেহ। আমার জনৈক অল্পবয়সী উৎসাহী বন্ধু বলেছিলেন, ক্রিকেট-মাঠে একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পঙ্কজ বলের পর বল ছুঁড়ছেন উইকেটের উপর, এদৃশ্য তিনি বহুবার দেখেছেন। পঙ্কজ যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রশংসা পান এইজন্য পাবেন। নেটে ব্যাট করার বীরত্ব কিংবা বোলিং-এর কলাকুশলতা নয়,—অবহেলিত ফিল্ডিং—নিষ্ঠাভরে তার অভ্যাস করেছেন তিনি। আমাদের তো ধারণা ছিল, এদেশে যিনি ব্যাট ধরে সেঞ্চুরী করতে পারেন, তাঁর কাছে ফিল্ডিং হোল লজ্জাজনক কায়িক পরিশ্রম।

পঙ্কজের ক্রিকেট-জীবনের সব খুঁটিনাটি উপস্থাপিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও বোধ করি না। খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি ভেসে আসছে। মনে পড়ছে, বাংলায় তিন 'প'-এর আবির্ভাব। টেস্ট ক্রিকেটের নিষিদ্ধ ভূমে প্রথম বাঙালী পদাতিকের নাম প্রবীর সেন। প্রথম 'প'। প্রবীর সেন তাঁর ক্রীড়াজীবনের সূচনায়, যেন মনে পড়ছে, আর একজন তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়ের সঙ্গে সেঞ্চুরী করে এসেছিলেন রণজি ট্রফিতে। খবরের কাগজে তুজনের একসঙ্গে ছবি দেখেছিলুম। ব্যাট করতে পারেন, প্রবীর সেন দেখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবীরের ক্রিকেট-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক দিন অনিশ্চয়ের মধ্যে ছিলুম—তিনি কি শেষ পর্যন্ত ব্যাটসম্যান দাঁড়াবেন? হিণ্ডলেকারের পরে উইকেট-কীপার-ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন প্রবীর। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উইকেট-কীপার রূপে যথেষ্ট সাফল্যলাভও করলেন। ভারতে ফিরেও তার রূপ কিছুটা বজায় রইল। কিন্তু—তুঃখ করে লাভ নেই—নিজের ক্রিকেট-জীবন নিজেই নষ্ট করেছেন পি সেন। যদি করে থাকেন, আমাদের কি বলবার থাকতে পারে?

তিন 'প'-এর দ্বিতীয়—পঙ্কজ। তৃতীয় প্রেমাংশু। প্রথম দুজন টেস্ট ক্রিকেটার। প্রেমাংশু গিয়েছেন টেস্ট ক্যাম্প পর্যন্ত। শেষ রক্ষা হয়নি। এই অত্যন্ত উপযোগী অল-রাউণ্ডার খেলোয়াড়টি নিশ্চয় এতবড় খেলোয়াড় নন যে তাঁকে স্থান না দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলতে পারি; কিন্তু একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, প্রেমাংশুর চেয়ে অনেক অযোগ্য টেস্টে খেলেছে এবং যদি প্রেমাংশুকে স্থান দেওয়া যেত, তিনি নিজের অন্তর্ভুক্তির সার্থকতা প্রমাণ করতেন কোনো না কোনো সময়ে।

বাংলা ক্রিকেট তিন 'প'-কে অবলম্বন করে অনেক স্বপ্ন দেখেছে। আনন্দের কথা, একেবারে ব্যর্থ স্বপ্ন নয়।

পঙ্কজের ক্রিকেট-জীবনের সূচনা অল্প অল্প চোখে আসছে। কলকাতার কলেজ-ক্রিকেটে বড় বড় রানগুলো। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট। রণজি ট্রফি। প্রথম অবতণে সেঞ্চুরী। ভারতীয় ক্রিকেটে সত্যকার অভ্যুদয় বোধ হয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। সেই বছর বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের হয়ে ভালো স্কোর করলেন আগন্তুকদের বিপক্ষে। তারপর আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেই সেঞ্চুরী করলেন কলকাতার মাঠে। যতদূর মনে পড়ে, নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা কাটাতে তিরিশ মিনিটের উপর সময় নিয়েছিলেন পঙ্কজ।

শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরী করেছিলেন।

দশ বছর আগে অল্পবয়সী ছোকরার স্ট্যামিনার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। দশ বছর পরে তিনিই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সহজ বিজয়ের পথে প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯৫৮ সালের বোম্বাই টেস্টকে পঙ্কজ বোধ হয় একা ড্র করিয়েছেন।

১৯৫১ সালে যখন টেস্ট ক্যাম্পে গেলেন পঙ্কজ, তার আগেই প্রদেশ-ক্রিকেটে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। টেস্ট-খেলতে-না-পাওয়া বাঙালী ব্যাটস্‌ম্যানদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র—রণজি ট্রফি, ক্লাব-ক্রিকেট ও প্রদর্শনী ম্যাচ। তিন ক্ষেত্রেই পঙ্কজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যাট ধরলেই সেঞ্চুরী এমন একটা মনোভাব নিজের সম্বন্ধে সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন তিনি।

যখন দেখলুম টেস্ট ক্যাম্পে পঙ্কজের রেকর্ডই সবচেয়ে ভাল তখন আমাদের কী স্ফূর্তি! টেস্টে স্থান দিতেই হবে পঙ্কজকে,—জোর গলায় চেঁচাতে লাগলুম চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে, রকের অড্ডায়। দেবে তো? ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগলুম। যা স্বজন-তোষণ!

নিগেল হাওয়ার্ডের এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পঙ্কজ স্থান পেলেন। কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরদ্বারে আমরা উপস্থিত—জয় মা, দেখো মা।

প্রথম টেস্টের আগে পঙ্কজের সঙ্গে বিজয় মার্চেণ্টের একটি কথোপকথন হোল। পঙ্কজের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ। মার্চেণ্টের কাছেই যোগ্য উপদেশ পাবেন স্থির করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন—"মিঃ মার্চেণ্ট, খেলা সম্বন্ধে আমাকে কিছু নির্দেশ দিন।"

"দেখ রায়, তুমি খুব ভাল খেলছ, তোমার ভবিষ্যৎ আছে। এই ভবিষ্যৎ আরো নির্দিষ্ট হবে যদি তুমি খেলার স্থান বদল কর।"—তারিফ করেন মার্চেণ্ট।

"কিভাবে?"—বিস্মিত কণ্ঠে পঙ্কজ প্রশ্ন করেন।

—"ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে খেল না কেন? তোমার খেলায় সেই ভঙ্গি ও চরিত্র আছে। তলার দিকে ভালো ব্যাটস্‌ম্যানের অভাব নেই। সেখানে ঠেলে জায়গা করা শক্ত হবে।"

"কিন্তু আপনি এবং মুস্তাক আলী থাকতে প্রথম উইকেটে খেলব আমি?"—পঙ্কজের দ্বিধা কাটতে চায় না।

নিজের মন মেলে ধরেন মার্চেণ্ট—"দুজনের মধ্যে অন্ততঃ একজন সরে যাচ্ছে,—এই বছরের শেষে আমি অবসর নিচ্ছি। সুতরাং একটা জায়গা খোলা পাচ্ছ। মুস্তাকও বা কতদিন খেলবে? প্রথম উইকেটে যদি ভালো রান দিতে পারো, দলকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করবে।"

"আপনার উপদেশের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। নির্দেশমত কাজ করবার চেষ্টা করব।" নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হন পঙ্কজ।

মার্চেণ্ট সহাস্যে বললেন,—"দেখ, তুমি যদি জায়গা পাও এবং আমাকে যদি ডাকা হয়, তাহলে হয়ত দুজনে ভারতের পক্ষে ইনিংস সুরু করতে যাচ্ছি।"

এই কথোপকথনের কথা স্বয়ং মার্চেণ্ট জানিয়েছেন।

মার্চেণ্টের সঙ্গে পঙ্কজ প্রথম টেস্টে ইনিংস স্থরু করতে নামলেন। মার্চেণ্টের শেষ টেস্ট এবং পঙ্কজের প্রথম।

পঙ্কজের অভ্যুদয়ের সূচনা এইখানে। কেবল অভ্যুদয় নয়, দলে স্থান লাভের পক্ষে প্রথম উইকেটের শিশিরসিক্ত ভূমিই পঙ্কজের দুর্গ হয়েছে। মুস্তাক একটি তিক্ত সত্য বলেছিলেন পঙ্কজের বিষয়ে—Either he is No. One or no one in the team. বহু ব্যর্থতার মধ্যেও ভারতীয় দলে পঙ্কজকে আটক রাখা হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, পঙ্কজ হয়ত নৈপুণ্যের প্রত্যাবর্তনে বিপক্ষের বোলারকে আটকে রাখতে পারবেন ইনিংসের স্থরু থেকে।

পঙ্কজকে 'সৌভাগ্যবান' বলেছি। সে সৌভাগ্য অনেক পরিমাণে এই যথাযোগ্য স্থান নির্বাচনের মধ্যে আছে। মার্চেণ্ট-মুস্তাকের ত্যক্ত ভূমে উপযুক্ত দাবীদার আসার আগেই পঙ্কজ প্রবেশ করে গিয়েছিলেন। আর প্রবেশ করেছিলেন জয়পতাকা উড়িয়ে।

প্রথম টেস্টে মা কালী আমাদের কথা শোনেন নি। পঙ্কজ আউট হয়ে গেলেন মাত্র ১২ রান করে এবং আরো সর্বনাশ—সে খেলায় ভারতের পক্ষে কোনো দ্বিতীয় ইনিংস ছিল না, যা পঙ্কজের প্রত্যাবর্তনের পরম লগ্ন।

হাত পা কামড়াতে লাগলুম। আউট না হয়ে কি পঙ্কজ পারতেন না? আর কি পঙ্কজ দলে স্থান পাবেন? সিলেকসন বোর্ডের মেম্বারদের এটুকু জ্ঞানগম্যি আছে তো যে, প্রথম খেলা দিয়েই খেলোয়াড় চেনা যায় না একথা বুঝবেন? প্রথম খেলায় সেঞ্চুরী না করেও পরে অজস্র টেস্ট সেঞ্চুরী করেছে, এবং প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী করেও পরে ডুবে গিয়েছে এমন খেলোয়াড়ের অভাব নেই। হবসের পরে পৃথিবীর সর্বোত্তম ওপেনিং ব্যাটসম্যান হাটনের প্রথম টেস্ট-স্কোর দুটো মনে নেই—'০' এবং '১'?

নির্বাচকের বিরুদ্ধে ইতিহাস মন্থন করে যখন ভূরিভূরি প্রথম-ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে ফেলেছি, তখন প্রাণে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল ডাকওয়ার্থের একটি বাণীতে। তিনি পঙ্কজকে বসিয়ে না দিতে অনুরোধ করলেন,—ছেলেটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় ভবিষ্যৎ আছে।

অপূর্ব ! এই না হলে দূরদৃষ্টি ! সেঞ্চুরী দেখে তো সকলেই বলতে পারে কেমন খেলোয়াড়। ১২ রানের সঙ্কীর্ণ পরিসরে যিনি খেলোয়াড়ের জাত এবং ধাত ধরতে পারেন, তাঁকে ঋষি বলা যায়। জর্জ ডাকওয়ার্থ অবিলম্বে আমাদের কাছে ঋষিত্বে উন্নীত হলেন—সায়েব ঋষি। সেইটেই আরো ভরসা, আমাদের দেশের কর্মকর্তারা এখনো সায়েবদের ভক্তি করেন।

নির্বাচকেরা যে কোনো কারণেই হোক পঙ্কজে বিশ্বাস রাখলেন।

বোম্বাইয়ে দেখা গেল বাঙালীর বোম্বাই কীর্তি।

সজলচোখ বৃদ্ধটিকে আমাদের মনে আছে। কয়েকশো লোক মিলে রেডিও শুনছিলুম রাস্তায় দাঁড়িয়ে। পঙ্কজের সেঞ্চুরীতে যখন রেডিও ফেটে যাবার যোগাড়, বৃদ্ধটি চোখভরা জল নিয়ে সামনের একটি ছোকরার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, দীর্ঘজীবী হও বাবা, বাঙালীর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী।

আবার হাত পা কামড়ালুম আমরা। পঙ্কজের উপর নিরুপায় রাগে ছটফট করতে লাগলুম—দিনের শেষ ওভারে পঙ্কজের আউট হবার কি দরকার ছিল !

প্রথম ইনিংসে ১৪০। দ্বিতীয় ইনিংসে গোল্লা। পঙ্কজের সমস্ত ক্রিকেট-জীবনের সারসংক্ষেপ বোম্বাইয়ে লেখা হোল। সেঞ্চুরী ও শূন্য।

তারপর পঙ্কজকে দেখলুম কলকাতার মাঠে। প্রথম ইনিংসের ৪০ রান আমার দেখা পঙ্কজের শ্রেষ্ঠ টেস্ট ইনিংস। চল্লিশ রান করে নট আউট পঙ্কজ পরদিন অবশ্য প্রভাতেই যথারীতি অফের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে বিদায় নিলেন।

কিন্তু সেদিন পঙ্কজের মধ্যে যা দেখেছিলুম, তা আর দেখবার আশা করি না। ছেলেটির সমস্ত দেহের মধ্য থেকে একটি জিনিস বিচ্ছুরিত হচ্ছিল—আত্মবিশ্বাস। চলা-ফেরা, ব্যাট ধরা, স্ট্রোক করা— সব কিছু সহজ দর্প এবং প্রফুল্লতার ভঙ্গিতে বাঁধা। কোনো বলই তাঁর কাছে সমস্যা নয়। তা বলে কি সেগুলিকে নিরন্তর বাউণ্ডারীতে পাঠাচ্ছিলেন ? মোটেই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু থামাচ্ছিলেন, মারছিলেন মাত্র মারবার বলটি। কিন্তু যেভাবে ক্রীজের উপর ঘোরাফেরা করলেন, যে প্রত্যয়ের অনায়াস

গতিতে, সে জিনিস একমাত্র তার পক্ষেই করা সম্ভব, যে জীবনের প্রসন্ন মুখ দেখেছে। সেই গৌরবর্ণ খর্বকায় বাবু-চেহারার যুবকটি আমাদের মনে একটি সানন্দ মহিমার অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল।

পঙ্কজের ব্যাটিং-এর আরও একটি গুণ সেবারই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলুম। সন্দেহজনক ছু'একটি মার যে না মেরেছিলেন, তা নয়। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পরের বলটি আবার যে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করলেন, তাতে, ব্যাটের সেই প্রশান্ত রূপ দেখে কয়েক মুহূর্ত পূর্বের সন্দেহ সম্পূর্ণ মুছে গেল মন থেকে।

অতি বড় অস্বস্তির মধ্যেও পঙ্কজের এই মানসিক সুস্থিরতা তাঁর খেলার সম্পদ। এবং এই জিনিসই তাঁকে একদিকে নৈরাশের সঙ্গে সংগ্রামে সাহায্য করবে, অন্যদিকে তাঁর পক্ষপাতীদের দূরে রাখবে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে উদ্ভত অনাস্থা থেকে।

পরের ইতিহাস না বললেও চলবে। পঙ্কজ আবার সেঞ্চুরী করলেন মাদ্রাজে। সেই সিরিজে এম-সি-সি-র সঙ্গে ক্রিকেট-সমরে পঙ্কজের মহাদান স্বীকৃত হোল সগৌরবে।

১৯৫২ সালে পঙ্কজ যখন ইংলণ্ড চললেন, তখন পূর্ব পৃথিবীর এক তারকার উদয়-বর্ণনায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্র মুখরিত। পঙ্কজ যখন ফিরে এলেন স্বদেশে, তখনো পঙ্কজের রেকর্ড সম্বন্ধে মুখর ছিল বিলিতি সংবাদপত্র—টেস্ট ক্রিকেটে 'শূন্য' সৃষ্টির কৃতিত্ব নিয়ে।

পূর্ণ থেকে শূন্য। তারপর?

আগের কথায় ফিরে আসতে পারি—ক্রিকেটে চরিত্রবান পঙ্কজ, সংগ্রামী পঙ্কজ, অদম্য পঙ্কজ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যখন গিয়েছিলেন, তখনো ব্যর্থতার ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। একেবারে শেষ টেস্টে পূর্ণ প্রভায় আত্মপ্রকাশ। সেই টেস্ট ভারতের পক্ষে আবার বাঁচালেন পঙ্কজ রায়—ছু' ইনিংসে তাঁর ৮০ এবং ১৫০ রান।

তারপর পাকিস্থানের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলেন না। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিকের টেস্টে একই অবস্থা। স্কোর-ব্যাঙ্কে ওভার ড্রাফট।

কলকাতার মাঠে সম্ভবতঃ বাঙালীর প্রিয় পঙ্কজকে স্থান না দিয়ে উপায় ছিল না। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামলেন নিজের মাঠে পঙ্কজ রায়। সেঞ্চুরী করলেন। জীবনে অমন জঘন্য টেস্ট সেঞ্চুরী দেখেছি মনে পড়ে না। পঙ্কজের অন্য সমর্থক কিংবা স্বয়ং পঙ্কজও বোধ হয় সেকথা স্বীকার করবেন।

কিন্তু পঙ্কজ ও তাঁর সমর্থকেরা একটি কথা জানতেন ও মানতেন,—যে ভাবেই অর্জন করা হোক না কেন, টাকা ইজ্ টাকা। পরের টেস্টে জায়গা পাওয়ার জন্য ঐ সেঞ্চুরীর দরকার ছিল।

এবং বিশ্বরেকর্ড করবার জন্য। পঙ্কজ মাদ্রাজে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভিনুর সঙ্গে প্রথম উইকেটের টেস্ট রেকর্ড করলেন।

ভারতে অস্ট্রেলিয়া এর পর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অন্য সকলের সাহচর্যে ব্যর্থতাসুখ উপভোগ করলেন পঙ্কজ। প্রমাণ করে দিলেন, ভারতীয় ব্যাটসমানদের মধ্যে কারো থেকে তিনি কম নন। সাফল্যে বা ব্যর্থতায়।

তারপর ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। আবার মূল্যবান হয়ে উঠলেন তিনি। একটি টেস্ট তো একলা ড্র করালেন। পরের টেস্টকেও কণ্ট্রাক্টারের সহযোগিতায় ড্র-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আউট হয়ে গেলেন। তখনো অনেকগুলো উইকেট বাকি। সময় এমন কিছু বেশী নয় যে অবশিষ্ট ব্যাটসম্যানেরা তা কাটিয়ে দিতে পারবেন না। আমি জানি বহু ব্যক্তি এই সময় হতাশ হয়ে রেডিও বন্ধ করে দিয়েছিলেন—অব্যর্থ হার! তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয় নি।

পঙ্কজের নির্ভরশীলতার চরম প্রমাণ।

ইংলণ্ডের বেইলীর ভূমিকা নিয়েছেন পঙ্কজ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে গোড়ার দিকে চান্স দেবার পরেও যে অবিচলিত ধীরতার সঙ্গে পঙ্কজ খেলেছেন, বিজয় মার্চেণ্ট তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করেছেন তাঁর দায়িত্ববুদ্ধির এবং খেলোয়াড়ী মনোভাবের। নব্বুই রানের মাথায় আউট হয়ে যাবার পরে পঙ্কজ স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন ক্রীজে কয়েক মুহূর্ত। সে কি আম্পায়ারের ভ্রান্ত।

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য ? পঙ্কজ মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, মোটেই না, আমি মুষড়ে পড়েছিলুম দলের এই বিপদের মুখে নিজের বোকামিতে আউট হয়ে যাওয়ার জন্য'। মার্চেণ্ট সোচ্ছ্বাসে বলেছেন, দলের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উপরে এইভাবে স্থান দিতে পারে এমন কজন খেলোয়াড় আছে ভারতীয় দলে ?

পঙ্কজের মধ্যে মার্চেণ্ট সম্ভবতঃ নিজের উত্তরাধিকারীকে দেখেছেন। তাই তাঁর যোগ্য বা অযোগ্য আচরণে উৎফুল্ল বা পাড়িত হন। আমেদাবাদে খেলার সময় গিলক্রাইস্টের অতি দ্রুত বলের সামনে থেকে লেগের দিকে পঙ্কজের 'পালিয়ে' যাওয়াকে তিনি ক্ষমা করেননি। যে তীব্র ও তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন, তা খুবই অন্যায় সমালোচনা, বিশেষভাবে টেস্টে স্থান পেয়েছে এমন একজন খেলোয়াড় সম্বন্ধে। কোনো ক্ষেত্রেই টেস্ট খেলোয়াড়ের মনোবল নষ্ট করতে নেই। মার্চেণ্ট করেছিলেন কেন—আমার বিশ্বাস, ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে। মার্চেণ্ট কী খুশী হয়েছিলেন পঙ্কজের রূপান্তর দেখে—প্রথম টেস্টের সময় বেতারে মার্চেণ্টের বক্তব্য শুনে তা বোঝা গিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে পঙ্কজ মাত্র ১৯ রান করেছিলেন, কিন্তু বলের মুখে দাঁড়িয়ে, পালিয়ে না গিয়ে। পঙ্কজের প্রশংসা করতে ঐ ১৯ রানই যথেষ্ট ছিল, পরের ইনিংসের ৯০-এর জন্য মার্চেণ্টকে অপেক্ষা করতে হয়নি।

পঙ্কজ মার্চেণ্টকে জানিয়েছিলেন, আমেদাবাদে বলের লাইন থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণ—টেস্টের আগে আহত হওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। প্রথম টেস্টে গিলক্রাইস্টের ভয়ঙ্করগতি বলের সামনে পঙ্কজের সাহস দেখে পঙ্কজ যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মিথ্যে কৈফিয়ত দেননি, মার্চেণ্ট তা বুঝেছেন এবং খুসী হয়ে সেই কর্তব্যবোধের প্রশংসাও করেছেন।

প্রথম টেস্টে পঙ্কজ কিন্তু ঠিক বলের লাইনে দাঁড়িয়ে খেলেন নি, একটু অফের দিকে সরে যাচ্ছিলেন, এবং সেই রকম অবস্থাতেই আউট হয়েছিলেন প্রথম ইনিংসে।

পঙ্কজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এ তাঁর মনের জোরের আর একটি প্রমাণ। লেগস্টাম্পের উপর দ্রুতগামী সটপিচ বলের অস্ত্র হোল হুক। বল বোলারের হাত-ছাড়া হওয়া মাত্র ব্যাটসম্যান যেন সংস্কারবশে বলের লাইনে দাঁড়িয়ে

পড়েন এবং স্বতঃই তাঁর ব্যাট ঝলসে ওঠে লেগের দিকে। একটু পেছিয়ে গিয়ে লেগের দিকে বল এইভাবে থেঁতলে দেওয়ার নামই হুক।

ক্রিকেটের বিশিষ্ট দুই লেখক লিখেছেন, হুক মারের নৈপুণ্য যতটা চেষ্টা করে অধিগত করা যায়, তারো থেকে বেশী—এটা সহজাত। ভালো ব্যাটসম্যান যেন নিজের অজ্ঞাতেই উপযুক্ত বল পেলে স্টাম্পের উপর সরে গিয়ে বল হুক করেন। দ্রুত বলে এই হুক করাতে যে দৃষ্টিশক্তি, মস্তিষ্ক এবং পেশীর তাড়িত সহযোগ প্রয়োজন, সেটা ঠিক অনুশীলন-সাধ্য নয়। বর্তমানকালের যিনি সবচেয়ে বড় প্রথম উইকেটের খেলোয়াড়, অনুশীলন এবং মনঃসংযোগে যিনি অতুলনীয়, সেই লেন হাটন ভালভাবে হুক মারতে পারতেন না।

এবং যিনি সহজে হুক মারতে পারেন, তিনি যদি কোনো কারণে একবার নার্ভ হারিয়ে ফেলেন, (প্রায়ই দ্রুত বলে আহত হয়ে) তাহলে ভবিষ্যতে সেই সহজ অধিকার ফিরিয়ে আনতে অসমর্থ হন। বডিলাইন সিরিজের পরে ব্রাডম্যান পূর্বের মত হুক মারতে পারতেন না। তার অবশ্য ভিন্ন কারণও আছে, যা বর্তমানে আলোচ্য নয়।

যা স্বতঃসিদ্ধ নয়, তাকেই অর্জন করার চেষ্টা যিনি করেন সাহসের সঙ্গে, তিনি মেরুদণ্ডী বীর। পঙ্কজ তাই করেছেন। আর মনের জোরে ঐ জিনিস করতে হয়েছিল বলে আতিশয্য এসে গিয়েছিল।

পঙ্কজ, বিজয় মার্চেণ্টের সমালোচনার জন্য বা যে কোনো কারণের জন্যই হোক বুঝেছিলেন, অতি দ্রুত বলেও বলের লাইন থেকে সরে যাওয়া চলবে না। বলের লাইনে দাঁড়াতেই হবে, এই প্রতিজ্ঞায় চশমাধারী এই ব্যক্তি বলের সোজা দাঁড়িয়েছিলেন। বিশুদ্ধ মনঃশক্তিতে তা করতে হয়েছিল। অতিরিক্ত মনঃপীড়নের উত্তেজনা আছে। তার বশে,—এবং আমার ধারণা, কিছু পরিমাণে নিজের শরীরের সূক্ষ্ম বিদ্রোহে পঙ্কজ একটু বেশী সরে গিয়েছিলেন অফের দিকে।

এই সাহস আমাদের ক্রিকেটের সম্পদ।

পঙ্কজ সম্বন্ধে লেখায় বাড়াবাড়ি করেছি কিনা জানিনা। প্রথমেই স্বীকার করেছি, তাঁর বিষয়ে আমার দুর্বলতা। আমার এইটুকু সান্ত্বনা,

প্রায় সমস্ত ক্রিকেট-রসিক বাঙালীর দুর্বলতার পৃষ্ঠপোষকতা আমি পাব। পঙ্কজ বিরাট ক্রিকেটার হোন বা না হোন,—তিনি ভাগ্যবান,—এতখানি স্নেহ পেয়েছেন সকলের। তাঁর প্রতি বাঙালীর ভালবাসার ধরণটা বড় সুন্দর। তার মূল কথা, বেঁচে বর্তে থাক বাবা! পাঁচটি অপোগণ্ডের মধ্যে একটা কৃতী ছেলে সম্বন্ধে কেরাণী বাবার যে ভালবাসা। পঙ্কজকে প্রশংসা করে বলব, তিনি চালবাজি দেখিয়ে সে ভালবাসাটুকু মুছে ফেলেননি।

বাঙালী ছেলেদের সামনে একটি লোভনীয় ছবিও পঙ্কজ তুলে ধরেছেন, ক্রিকেট খেলে বিখ্যাত হওয়া যায়। ফুটবলের চেয়ে খ্যাতি। সর্বভারতে পরিচিত যে কয়জন আধুনিক বাঙালী আছেন, পঙ্কজ তাঁদের মধ্যে পড়েন। সিনেমার কয়েকজন বাঙালী তারকাও এই তালিকায় আছেন। রূপালী পর্দায় সোনালী প্রেম করব তুলালী নায়িকার সঙ্গে,—এর থেকে অনেক সুস্থ আদর্শ খোলা মাঠে আলো আর খুশীর তরঙ্গে হাল ধরা, দাঁড় টানা। যৌবনের সেই আদর্শ। সিনেমার অনেকখানি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, ক্রিকেটের সবটুকু সর্বসাধারণের।

সর্বসাধারণের স্নেহের, ভালবাসার, আনন্দের পাত্র হওয়া জীবনের পক্ষে গৌরব।

পঙ্কজ রায় একজন সুস্থ সুদেহ বাঙালী।

সচল অগ্নিগিরি

(স্যুঁটে ব্যানার্জি)

শ্রেষ্ঠ ও সৌভাগ্যবান বাঙালী ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের কথা বলেছি। তাঁর পরে আসছেন শ্রেষ্ঠ ও ভাগ্যহীন বাঙালী ক্রিকেটার স্যুঁটে ব্যানার্জি,—নিত্য আক্ষেপের সঙ্গে যাঁর কথা বলে থাকি।

অথচ স্যুঁটে ব্যানার্জি বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র খেলোয়াড় যাঁকে আধুনিক কালে ইনস্টিটিউসন বলা চলে। পূর্ব যুগের কথা বাদ দিচ্ছি,—খেলোয়াড়রূপে যাঁরা কিছু ন্যূন হয়েও গুরুরূপে আরো বড়ো ছিলেন, সেই সারদা রায়, দুখীরাম বাবুদের কথা। ইদানীং কালে স্যুঁটে ব্যানার্জি

ছাড়া যথার্থ গুরুপদবাচ্য ক্রিকেটার আর কে আছেন জানা নেই। কয়েকজন ভালো কোচ অবশ্য আছেন, তাঁদের ছাত্ররাও আছেন, কিন্তু সুঁটে ব্যানার্জিই শিক্ষাদাতা।

অথচ খেলার মাঠে বা মাঠের বাইরে যাঁরা সুঁটেকে দেখেছেন তাঁরা কি এই উত্তপ্ত-হৃদয় প্রচণ্ড মানুষটিকে স্নিগ্ধ সমাহিত গুরুরূপে কল্পনা করতে পারবেন? তবু তিনি গুরুই, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে যা শ্রদ্ধা করেন, তা অনেক শিক্ষকের পক্ষেই লোভনীয়।

প্রশান্তির মহিমা না রেখেও সুঁটে গুরু হলেন কিভাবে? দূর থেকে যা অনুমান করতে পেরেছি, তদনুযায়ী,—আনন্দ পাওয়ার এবং আনন্দ দেওয়ার শক্তিতে। অসীম প্রাণের একটি বিপুল আধার, নিরন্তর ফুটন্ত। সেই অগ্নিগিরির কাছে সম্ভ্রমবোধ না করে উপায় নেই।

সুঁটে তাঁর ছাত্রদের ভালবাসেন। কোমল পন্থায় নয়, প্রবলভাবে। ভীষণতম গর্জন তার মধ্যে পড়ে। ছাত্ররা তাঁদের গুরুকে ভালবাসেন, অতিবড় গঞ্জনার মধ্যেও যা শেষ পর্যন্ত বিচলিত হয় না।

সংগঠনে এবং সংক্রমণে সুঁটে ব্যানার্জির মধ্যে পূর্ব ভারতের সি কে নাইডুকে পেয়েছি।

সি কে নাইডুর মতই ডিক্টেটার।

ছাত্রদের মধ্যে সুঁটে ব্যানার্জি তাঁর আপাতব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা ও সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

সুঁটে ব্যানার্জিকে নিয়ে ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষের খেলা ভারতীয় ক্রিকেটের নোংরা খেলারও অতি নোংরা একটি অধ্যায়। বার্ধক্যে পৌঁছবার পূর্বে সুঁটে টেস্টে স্থান পাওয়ার উপযোগী বিবেচিত হননি, আমাদের নির্বাচকদের এমনই পরিণতি-প্রীতি। আগে নাকি অধিকতর ভালো খেলোয়াড়েরা সুঁটের পথ আটকে ছিলেন। অধিকতর চতুর ও কৌশলী নির্বাচকেরা পথরোধ করে ছিলেন, একথা বললেই বোধহয় সত্য বলা হয়।

একটি ক্রিকেট-পঞ্জীতে সুঁটে সম্বন্ধে লেখা আছে—

"স্বভাবত একজন সত্যকার দ্রুত বোলার। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দুর্ভাগ্যতম ক্রিকেটাররূপে পরিচিত। কারণ তিনি দুবার ইংলণ্ড

সফর করেও একবারের জন্যও টেস্ট খেলতে পাননি এবং যখন মাত্র একবারের জন্য খেলতে পেলেন, তখন তাঁর 'যৌবন' শেষ। প্রথম দিকে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন অমর সিং ও নিসার।"

পঞ্জীকার জানাননি পরের দিকে কে বা কারা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি।

অদম্য সুঁটে জীবনে কারো পরোয়া করেননি, আমার তুচ্ছ সাধুবাদে তাঁর কিছু এসে যাবে না। কিন্তু আমি মুগ্ধ ১৯৪৮-৪৯ সালে তাঁর আক্রমণের রূপ দেখে। তখন তাঁর ছত্রিশ বছর বয়স; এই বয়সেও তিনি প্রায় একলাই হারিয়ে দিলেন ১৯৪৮-৪৯ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মত ব্যাটিং-এ দুর্ধর্ষ দলকে। সেবারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একমাত্র হার সুঁটের হাতেই হয়েছিল এলাহাবাদে,—সুঁটে ৬৭ রানে পেয়েছিলেন ৭টি উইকেট পূর্বাঞ্চলের পক্ষে। ক্রিকেট-কর্তারা এই প্রথম লজ্জিত হলেন সুঁটে সম্বন্ধে,—তাঁকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে ডাকা হোল। বোম্বাইয়ের 'সিমেণ্ট'-বাঁধানো পিচে বল করেও দ্বিতীয় ইনিংসে সুঁটে পেলেন ৫৪ রানে ৪ উইকেট।

সত্যই অসামান্য এই ব্যক্তি। কর্তৃপক্ষের মত নীরস জমিতে লজ্জার ফসল তিনি ফলাতে পেরেছিলেন। অবিবেচনার দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির মধ্যেও হৃতস্বাস্থ্য ভগ্নমন হননি।

বোলার হিসেবে অত বড় হয়েও যিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন এত অল্প, তাঁর বোলিং-সাফল্যের হিসেব নিতে ক্লান্তি বোধ হয়। তবু যেহেতু সুঁটে মূলতঃ বোলার, বলতে হবেই বল-হাতে তাঁর সর্বোত্তম কৃতিত্বের কথা। সুঁটে ১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে যখন সেবার অস্ট্রেলিয়া হারল, সুঁটে ভারতের পক্ষে বোলিং-এ জয়ের নায়ক ছিলেন—প্রথম ইনিংসে ৪।৮৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪।৮১ উইকেট। ১৯৪১-৪২ সালে দু বারের রনজি ট্রফি বিজয়ী মহারাষ্ট্র দলকে নামিয়ে দিয়েছিলেন ৩৯ রানে,—৮।২৫ উইকেট নিজে সংগ্রহ করে। এবং—

যথেষ্ট হয়েছে, থাক। ব্যাটসম্যান সুঁটের দিকে চোখ ফেরাই—যেখানে তিনি প্রত্যাশার বাইরে ছিনিয়ে নিয়েছেন স্বীকৃতি; সারভাতের

সহযোগিতায় সুঁটের শেষ উইকেটের সেই রেকর্ড। সারের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৯৪৬ সালে শেষ উইকেট জুটিতে তাঁরা যে রেকর্ড করেছিলেন, তা এখনো বিস্ময়ের সঙ্গে স্মৃত হয়। শেষ উইকেটে দুটো সেঞ্চুরী বোধ হয় আর দেখা যায়নি। মোট ২৪৯ রান, তার মধ্যে সুঁটের ১২১। কি অসাধারণ ভারতীয় ক্রিকেট! প্রথম উইকেট জুটিতে তার রেকর্ড আছে, শেষ উইকেট জুটিতেও আছে—প্রথম ও শেষের মধ্যে নিরাকার শূন্য।

সুঁটের ব্যাটিং-সাফল্য আমার কাছে একটি তিক্ত ও উচ্চ পরিহাস মনে হয়। প্রত্যাখ্যাত বোলারের অবহেলার সৃষ্টি।

সেই রেকর্ড-সৃষ্টিকারী খেলাটি নয়। ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডের অন্য একটি খেলাকে স্মরণ করছি—ইংলণ্ডে ভারতের প্রথম খেলা। সে খেলার বিজয়া বীর তিনিই।

সেভার্ন নদীর ধারে, ক্যাথিড্রল এবং প্রাচীন বৃক্ষের পটভূমিকায় উরস্টার মাঠে ভারতীয় দল খেলতে নামল—তখন যুদ্ধরিক্ত ইংলণ্ডে নব বসন্তের সূচনা হয়েছে। যুদ্ধের পরে ভারতই প্রথম আগন্তুক দল—দূরশ্রুত সুনামে ঝঙ্কৃত।

ইংলণ্ডে ভারতীয়দের গুণাগুণ 'আলোচিত প্রচারিত ও প্রতীক্ষিত হয়েছে বালকের আগ্রহে।'

"উরস্টারের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে যে দল মাঠে নামল তাকে ইংলণ্ডের ক্রিকেট-ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সোয়েটার-গুরু দল বলা যাবে। ছিমছাম বাবু-বাবু চেহারার মোদী এখন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের মত, মানকদের স্থূলত্ব কদাকারের কাছাকাছি এবং গুলমহম্মদ সাদা পশমের বস্তা বিশেষ।"

"পাতৌদি টসে জিতেও উরস্টারকে ব্যাট করতে পাঠালেন। নিজের দলকে হাত পা ছড়িয়ে নেবার সুযোগ দিতে এবং তাদের মে মাসের গোড়ার দিককার আচ্ছন্ন সূর্যালোকের সঙ্গে পরিচিত করতেই পাতৌদি চেয়েছিলেন। কিন্তু আপাতত তিনি খুবই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কারণ একদিকে আছে উরস্টারের কঠিন ও নবীন উইকেট, অন্যদিকে ধূসর আকাশ ও দংশনশীল শীতল বাতাস,—যা উত্তপ্ত বাষ্পময় নদীবায়ু, প্রান্তরের দগ্ধ ও শুষ্ক স্থলবায়ু

এবং গ্রীষ্মদেশের অপূর্ব সূর্যালোকে অভ্যস্ত ভারতীয়দের কাছে মোটেই প্রীতিপ্রদ ঠেকছিল না।”

খেলাটি তৃতীয় দিনে নিতান্তই ভারতের প্রতিকূলে চলে গেল। উরস্টারের প্রথম ইনিংসের ১৯১ রানের প্রত্যুত্তরে ভারত করেছিল মাত্র এক রান বেশী—১৯২। দ্বিতীয় ইনিংসে উরস্টার করল ২৮৪।

শেষ দিনের চা-পানের সময়ে ভারতীয় দলের স্কোর দাঁড়াল ৬ উইকেটে ১৬১—মোদী ৪৭, অমরনাথ ২২। দু-ঘণ্টার মধ্যে ১২৩ রান করতে পারলে ভারত জিতে যাবে।

অমরনাথ আউট হয়ে গেলেন। হিণ্ডলেকারও, যখন দলের রানসংখ্যা ১৭৭।

নবম উইকেটে সুঁটে ব্যানার্জি খেলতে এলেন মোদীর সঙ্গে। মোদীর তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

ব্যানার্জি যোগদান করার পরে খেলার যা চেহারা দাঁড়াল, তা প্রত্যক্ষদর্শীর একটি চমৎকার বিবরণ থেকে পাওয়া যায়—

“ব্যানার্জি আসামাত্র প্রথম বলেই অন্ততঃ আধ ডজন ফিল্ডার এবং তৎসহ জনতার একটি মোটা অংশ অসুখী ও বিচলিত ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লেগ-বিফোরের আবেদন জানাল। পরের মুহূর্তে মোদী প্রায় পার্কসের বলে প্লেড-অন হয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতীয় দলের এখন একেবারেই ভগ্নদশা। মোদী খাবি খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন,—চেষ্টা করছেন যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে—নিয়োজিত আছেন কষ্টকর টিকে থাকার সংগ্রামে। আর ব্যানার্জি, যদিও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর সেঞ্চুরী আছে, আসলে বহুত-আচ্ছা-লড়ে-যাব শ্রেণীর ব্যাটসম্যান। সমাপ্তি সামনেই।……

“ব্যানার্জি এখন এলোমেলো অনিশ্চিত। পার্কসের বহির্বর্তী বলে আত্মঘাতীভাবে খোঁচাতে লাগলেন। বাম্পারের সামনে বাচ্চা টাট্টু ঘোড়ার মতো ছটফট করে মাথা বাঁচাতে লাগলেন সভয়ে। তবু মারতে ছাড়লেন না, এবং প্রাণপণ করতে লাগলেন খুচরো রান নেবার জন্য। খুব উত্তেজিতও বটে। তাঁর ‘না না না—মোদী ফিরে যাও—ফি-রে-যা-ও-ও’ ইত্যাদি চীৎকার

উরস্টার মাঠের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কিন্তু যখন তিনি জেনকিনসকে ঘুরিয়ে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন, তখন ভারতের রান ২০০-তে পৌঁছে গিয়েছে এবং তখনও খেলা হাতছাড়া হয়নি।

"মোদী ক্যাচ তুলেও অব্যাহতি পেলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন থার্ড ম্যানের দিকে দুটি বল কাট করে, যার ফলে তাঁর রান সত্তরে পৌঁছে গেল। কিন্তু এখন হঠাৎ ব্যানার্জি একেবারে ঘটনার নায়কত্ব নিয়ে নিলেন। ব্যানার্জি আকারে বিরাট, চলাফেরায় দ্রুত ও নাটকীয়তার পক্ষপাতী,—সুরু করলেন প্রচণ্ড বেগে। কুড়ি মিনিট ধরে পাঁয়তাড়া কষার পরে এবার তাঁর প্রমত্ত ও বন্য আক্রমণের সূচনা হোল। কভারে থেঁতলে পাঠালেন জেনকিনসের বলকে, পুনশ্চ থাবড়ে—স্কোয়ার লেগে। পরের ওভারে প্রায় রান-আউট করে দিলেন মোদীকে,—উত্তেজনায় নিজের ক্রীজে নাচতে নাচতে পার্টনার মোদীকে বাধ্য করলেন হুমড়ি খেয়ে কোনোক্রমে অপর ক্রীজে ফিরতে। তারপর হাওয়ার্থের বলে দুবার চার মারলেন—যা নির্ভুল ক্রশব্যাটের দুটি ভয়াবহ থাবা।

"এবার ব্যানার্জি মিড অফের মাথার উপর দিয়া চালালেন সিঙ্গলটনের বল এবং তারপরে হাওয়ার্থের বল চাপড়ে পাঠালেন শ্লিপের মধ্য দিয়ে বাউণ্ডারীতে। সিঙ্গলটনের একটি কড়া বল পায়ে লাগালেন, যন্ত্রণায় লাফাতে লাগলেন, বলটি প্রতিহত হয়ে দূরে সরে গেল। পরের মুহূর্তে ফাইন লেগে যেভাবে গ্লান্স করলেন, পাতৌদির পক্ষেও সে জিনিস সুন্দরতর-ভাবে করা সম্ভবপর ছিল না। সহসা সমস্ত খেলার গতি যেন বদলে গেল। দর্শকেরা তা বুঝল এবং অতঃপর প্রত্যেকটি মার ঔদার্যপূর্ণ উপভোগের দ্বারা সংবর্ধিত হতে লাগল। ব্যানার্জি স্বয়ং তা বুঝলেন, বেশ ভালভাবেই বুঝলেন যে, চোখ ঠিক থাকতে থাকতে এখনি রান করে নিতে হবে, যতশীঘ্র সম্ভব। বিরাট চেহারা অদ্ভুতভাবে চরকির মত ঘুরিয়ে তিনি মিডল স্টাম্পের উপর পাঠানো সিঙ্গলটনের ভালো লেংথের বলকে পাঠিয়ে দিলেন স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারীতে।......

"ভারতের ২৫০ রান হোল। ৩৫ মিনিটে মাত্র ৩৩ রান হলেই ভারত জিতবে। খেলাটি যখন হাতের মুঠোয়, তখন ২৫১ রানের মাথায় মোদী

সিঙ্গলটনের বলে এল-বি হয়ে গেলেন। ব্যানার্জি নিতান্তই চিন্তিত হয়ে পড়লেন,·· ·· প্যাভিলিয়ানের দিকে আধখানা পথ হেঁটে গেলেন নবাগত সিন্ধেকে নিজের পরিকল্পনা বোঝাবার জন্য।

"হাওয়ার্থের বলে একটি বিপজ্জনক হুক মেরে ব্যানার্জি নিজস্ব পঞ্চাশে পৌঁছলেন।

"······কিন্তু অবশেষে ব্যানার্জি—যে ব্যানার্জি নিজের দলকে টেনে তুলেছেন,—এক ঐতিহাসিক জয় অর্জনের জন্য যুদ্ধ করেছেন,—পার্কসের একটি ইনস্যুইঙ্গারের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। ছিন্নভিন্ন স্টাম্পের দিকে যখন তাকিয়ে আছেন হতভম্বভাবে— জয়লক্ষ্মী চলে গিয়েছে অন্যপক্ষে। ১৬ রানে উরস্টার জিতল। ব্যানার্জি ৫৯ রান করেছিলেন ৫৫ মিনিটে, যে রানকে সংখ্যায় ও গতিতে তিনি অন্যত্র অতিক্রম করেছেন, কিন্তু অতিক্রম করতে পারেননি সাহসের ও প্রয়াসের মূল্যে। মধ্যবিত্ততা ও আপেক্ষিক নীরসতা থেকে খেলাটিকে তিনিই উত্তোলন করেছিলেন, নিজ দলের সম্মান রেখেছিলেন। পরাজয়ের মধ্যেও এই খেলার মহান নায়ক তিনি।"

ইংরেজ লেখক যেভাবে ব্যানার্জিকে উপস্থাপিত করেছেন, তারপরে আমার আর কিছু বলার নেই।

স-বল বাঙালী

(কয়েকজন বাঙালী বোলার)

নেভিল কার্ডাস লিয়ারী কনস্টানটাইনের চিত্র আঁকিবার সময় অসতর্ক আতিশয্যে বলে ফেলেছিলেন,—কোনো ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানকে ধীর বোলিং শেখাতে হলে তার ঠাকুর্দা থেকে সুরু করতে হবে। এমন বলার কারণ, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের রক্ত সব সময় টগবগ করে ফুটছে, তাই তারা স্বভাবত ফুটন্ত ছুটন্ত বল দিয়ে থাকে। নিজের সম্বন্ধে কার্ডাসের প্রশংসায় মহান লিয়ারী খুসী হলেও জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন কার্ডাসের ঐ

কথার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের মানুষদেবতা কনস্টানটাইনের চেয়েও বড় প্রতিবাদ এসেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটের ভাগ্যবিধাতার কাছ থেকে,—পৃথিবীর দুজন বিস্ময়-বোলার রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইন স্পিনার রূপেই আবির্ভূত হয়েছেন সে দেশে।

বাংলা ও বাঙালীর সঙ্গে পরিচিত যদি কোনো নেভিল কার্ডাস থাকতেন, তিনি নিশ্চয়ই বলতেন,—কোনো বাঙালীকে ফাস্ট বোলিং শেখাতে হলে দু'এক পুরুষ আগে থেকে আরম্ভ করাই ভাল। তরল কোমল বাঙালীকে জানলে এ মন্তব্য অবধারিত। কিন্তু দ্রুত বোলার সুঁটে ব্যানার্জি জাতি-চরিত্র সম্বন্ধে সেই সহজ সাধারণীবচনের প্রতিবাদস্থল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাংলার আর যে দুজন বোলার টেস্ট খেলেছেন, তাঁরা দ্রুত বোলার না হোন, একেবারে ধীর বোলার নন অন্তত। আমি মণ্টু ব্যানার্জি ও নীরদ চৌধুরীর কথাই বলছি।

কতদিন এই নিয়ে ভেবেছি। যদি বড় জাতের একটা ধীর বোলার থাকত বাংলা দেশের, কি সুন্দর আর স্বাভাবিক হত! যদি একটি গুপ্তে থাকত আমাদের! ঐ ছোটখাট চেহারা, বাঙালীর মাজা ফর্সা রঙ, স্কুলের ছটফটে ছেলের মতো বল দেবার আগে ছোটখাট লাফ কয়েকটি, তারপরেই লেগস্পিন বা গুগলির বুদ্ধিবিকাশ। ফুলহাতা জামা পরা খাটো চেহারার গুপ্তের চলাফেরায় কেমন একটা কৌতুকজনক প্রবীণতা। একটা বুড়োমির ছাপ,—যেমন অনেক বাঙালী ছোকরার মধ্যে থাকে, কিন্তু তার পিছনে কুশাগ্র বুদ্ধির সিনিক্যাল বক্রতা। গুপ্তেকে কত সহজে বাঙালী করে নেওয়া যায়। বাঙালীর অতিপ্রিয় নাম তাঁর—সুভাষ। আর গুপ্তের 'এ'-কার কেটে দিলে যে পদবী হয়, সেই গুপ্ত পদবীতে তো বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ইদানীং একান্ত অধিকার। সুভাষ গুপ্ত—সুন্দর একটি বাঙালী নাম ও বাঙালী চরিত্র।

চতুর নরম বাঙালী কোনো বড় শ্লো-স্পিনার সৃষ্টি করতে পারল না! যারা গীতিকাব্য লেখে তারা ধীর স্পিন দিতে পারে না, এ বড় আশ্চর্য। তার উপর বাঙালী ছোটগল্প লেখে। খেলায় স্পিন বল গীতিকাব্য ও ছোট গল্পের বুনন। এক দিকে গীতিকাব্যের কোমল প্রলোভন, অন্যদিকে ছোট

গল্পের সহসা সমাপ্তি এবং অসমাপ্তির ব্যঞ্জনা—এ জিনিস ক্রিকেটে একমাত্র স্পিন বলেই পাওয়া সম্ভব। ঘোমটা-ঢাকা কটাক্ষের মত নরম মাটিতে বলের বিদ্যুৎ-আঁখি। ফল—বৈষ্ণব কবি বলে গেছেন—'পাঁজর ধ্বসিয়া গেল।' ক্রিকেটে সেই পাঁজর উইকেটের। পরোক্ষে ব্যাটসম্যানেরও।

সেখানে বাংলার শ্রেষ্ঠ বোলার কিনা সুঁটে ব্যানার্জি—অহেতুক বীররসের কোলাহল। ছি!

মণ্টু ব্যানার্জিকে অবশ্য আমি জাতীয় স্বভাবের পক্ষে প্রশংসা করি। তিনি সূচনার বোলার হয়েও ভয়ঙ্কর-গতি নন। শ্লো মিডিয়াম থেকে মিডিয়াম পেস পর্যন্ত তাঁর গতি। তাঁর কৃতিত্ব বল দুই দিকে সুইঙ্গ করানোয়। মানকদ একবার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, মণ্টুর মত দুই দিকে সমানভাবে সুইঙ্গ করাতে পারে এমন বোলার ভারতে নেই। ঐ 'দুই দিকে সুইঙ্গ' কথাটি মনে রাখবেন। বেশী জোরে বল করা নিশ্চয় ছোট ব্যানার্জির কাছে অশোভন মনে হয়েছিল। তিনি শূন্যে বল ঘোরানোর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বোধ হয় নির্বাচকদের মনে এই প্রত্যয়সৃষ্টিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যে প্রত্যয় তাঁর জাতিগত,—'বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ।'

মণ্টু ব্যানার্জি আধুনিক বাংলার একজন সেরা বোলার—যেমন ঈষৎ পূর্বকালে কমল ভট্টাচার্য। কমল ভট্টাচার্য যখন খেলা শেষ করছেন তখন মাঠে প্রবেশ করছি আমরা। তাঁর বিভ্রান্তি-বিস্তারের উল্লাস-মুখর দিনগুলি দেখার সুযোগ আমার হয়নি। অগত্যা মিত্তিরদার দ্বারস্থ হতে হলো। তিনি বললেন, একটা কথা মনে রাখবে, কমল খাঁটি ও ভেজাল সায়েবে ভর্তি বাংলা দলে নিজের শক্তিতে জায়গা করে নিয়েছিলেন। ভারতীয় টেস্ট দলে তাঁর স্থান না পাওয়া নিয়ে আমাদের মনে একটা স্থায়ী আক্ষেপ ছিল। মিত্তিরদা আরো জানালেন, কমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে নির্বাচকদের অসুন্দর ব্যবহারের কথা। নিতান্ত অনিচ্ছায় কমল ভট্টাচার্যকে একবার 'টেস্ট নেটে' ডাকা হয়েছিল। অমর সিং ও নিসার নেটে বজ্রবর্ষণ করে প্রমাণ করে দিলেন, কমল ভট্টাচার্য বড় ব্যাটসম্যান নন। আমি বললুম, তাতে কি, তিনি তো বোলার। মিত্তিরদা বললেন, ব্যাপারটা আমরাও ঠিক বুঝিনি। সমস্তটা জানি না, যতদূর

শুনেছি, কমল ভট্টাচার্য ব্যাট ও বল দুই-ই করতে পারেন, এই সংবাদটাই নির্বাচকদের কারো কারো কাছে অস্বস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাট যে করতে পারেন না এটা প্রমাণ হলে বলও করতে পারেন না তাও প্রমাণ হয়ে যায় কোনো এক ভয়াবহ লজিক্যাল ফ্যালাসিতে। মিত্তিরদা তিক্ত হাসলেন।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের একজন বিশেষ পরিচিত খেলোয়াড়ের কাছে শুনলুম, তাঁর একটি গোপন অস্ত্র ছিল যার দ্বারা উইকেট পেতেন। আউট সুইঙ্গের মত বল মাটিতে পড়ে অফ ব্রেক করে যেত। সে বল খেলা প্রায় অসাধ্য। আমি সবিস্ময়ে তাকাতে ভদ্রলোক হেসে বললেন, অবাক হচ্ছেন, কে অবাক না হয়েছে? স্বয়ং কমল ভট্টাচার্য পর্যন্ত। তিনি নিজেও জানতেন না কিভাবে এ বল পড়ে। হাতের এবং আঙুলের কোনো একটা মোচড়ে জিনিসটা ঘটত। অথচ কারণ থাকত অজ্ঞাত। ভট্টাচার্য ইচ্ছে করলেই ঐ বল দিতে পারতেন না। ও জিনিস হয়ে যেত। অমর সিং কমল ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন,—খেলোয়াড় ভদ্রলোক আমাকে জানালেন,—দেখ কখনো জানবার চেষ্টা করো না কিভাবে ঐ বল দিচ্ছ। যেদিন জানবে সে দিনই হারাবে।

এরই নাম অজ্ঞানের দিব্যজ্ঞান।

বাংলা ক্রিকেটের উপযোগিতম সর্বাত্মক খেলোয়াড়রূপে কমল ভট্টাচার্য আরো অনেক কিছু করেছেন; তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি রণজি ট্রফিতে শত উইকেট পেয়েছেন; তিনি ব্যাট করেছেন ইনিংসের সুরুতে, মধ্যে, শেষে, যথা প্রয়োজন; এবং স্লিপে দাঁড়িয়ে এমন সব ক্যাচ ধরেছেন যা দিয়ে থ্রিলার লেখা যায় অক্লেশে। স্লিপে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করা আর পিস্তল উঁচিয়ে ডুয়েল লড়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কমল ভট্টাচার্য বহু যুদ্ধের সম্মানী যোদ্ধা।

আমার কাছে কিন্তু নীরদ চৌধুরী বাঙালী বোলারদের মধ্যে অতুলনীয়। নীরদ চৌধুরীর খেলা দীর্ঘদিন দেখেছি বলেই বোধ হয় আমার এই পক্ষপাত। নিশ্চয়ই। তবু প্রবীণতর কোনো কোনো ক্রিকেট-সমঝদার,

আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাতকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে আমার বিশ্বাসের বল বাড়িয়েছেন। বোলিং এমন একটা জটিল বস্তু যে সে বিষয়ে আমার মত গ্যালারির দর্শকের কিছু বলবার থাকতে পারে না। ব্যাটিং আমরা বুঝি, কারণ গ্যালারি থেকে ব্যাটিং দেখা যায়। যতক্ষণ না উইকেট ছিটকে যাচ্ছে ততক্ষণ বোলিং-এর কোনো উত্তেজনা আমাদের কাছে নেই। দূর থেকে বোলারের মাহাত্ম্য বুঝবার সোজা উপায় বারংবার ব্যাটসম্যানের পরাভব কিংবা ক্রমাগত মেডেন লাভ। ব্যাটস্‌ম্যান পরাভূত হতে পারেন বোলিং-গুণে বা আত্মদোষে। আর এতদিনে আমরা এটুকু বুঝেছি যে, সব 'মেডেনই' সমান চরিত্রের নন, অনেক সময় ভীরু ব্যাটসম্যানের অসামর্থ্যে তাঁদের ধর্মরক্ষা।

তাহলে বোলিং বোঝার উপায় কি?—লব্ধ উইকেটের সংখ্যা ও অ্যাভারেজ, ব্যাটসম্যানের স্বীকারোক্তি এবং দূরবীণ-চক্ষু সমালোচকদের প্রজ্ঞাবচন।

এন চৌধুরীকে কিন্তু খোলা চোখেই বড় বোলার মনে হয়েছে আমাদের। বাংলা দেশের আর কোনো বোলারকে চৌধুরীর মত আক্রমণাত্মক মনে হয়নি।

চমক সৃষ্টিকারী বোলার তিনি। কার না মনে আছে ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ হ্যাটট্রিক—চৌধুরীর পর পর তিন বলে মানকদ, মুস্তাক ও অমরনাথের পতন। সেই সময়ই চৌধুরীর দিন গেছে। ১৯৪৫-এ অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে তাঁর সেই ধারালো বোলিং। অথচ ইংলণ্ডগামী জাহাজে জায়গা হোল না ১৯৪৬ সালে। আমাদের দেশে ধীর চিন্তার সমাদর। ঝরে পড়ার আগে হঠাৎ ধরে ফেলি তাহলে ফুলটা ফুটেছিল।

চৌধুরী টেস্টে প্রথম স্থান পেলেন ১৯৪৮-৪৯ সালে মাদ্রাজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। বোধ হয় ইডেন গার্ডেনে স্থানীয় দলের পক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বোলিং-এর যোগ্যতায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে একদিনে নামিয়ে দেওয়ার পিছনে তাঁর দানই ছিল সবচেয়ে বেশী। মাদ্রাজে কিন্তু সাফল্য লাভ করলেন না। তাতে প্রমাণিত হলো যে, ক্রিকেটে সাফল্য নগদ পয়সার সওদা নয়।

চৌধুরীকে ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়নি, নিয়ে যাওয়া হয়নি ১৯৪৬-৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৪৮-৪৯ সালে মাত্র একটি টেস্টে খেলান হলো। অর্থাৎ যৌবন থাকতে 'সই শ্যাম তো এল না।' ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ সালে দুটি কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে কয়েকবার বেসরকারী টেস্ট খেললেন, তাঁর হাতে শ্রেষ্ঠ ব্যাটসমানদের বিপর্যয় দেখলাম, তবু ১৯৫১-৫২ সালে নিগেল হাওয়ার্ডের এম সি সি দলের বিরুদ্ধে তাঁকে ভুলে যাওয়া হোলো সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু ১৯৫২ সালে হঠাৎ ইংলণ্ডের সমুদ্রপথে ডেকে নেওয়া হোলো তাঁকে।

শুধু তাই নয়, চৌধুরী রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন একটি অখ্যাতিতে। বল ছোঁড়ার আগে চৌধুরী যে ঝাঁকুনিটুকু দেন, সেটি নাকি বাড়তি জিনিস। সুতরাং ওটা বোলিং নয়, থ্রোইং। ডাকও ডাকও ইংলণ্ডের ক্রিকেট-বিচারপতিদের। সেই মহান আম্পায়ার-সভাতেই স্থির হবে চৌধুরীর বোলিং ন্যায্য কি অন্যায্য ? চৌধুরী সম্বন্ধে ঘটা করে গবেষণা সুরু হয়ে গেল।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, নির্বাচকদের চোখে চৌধুরী কত বড় বোলার,—তাঁর ডেলিভারীর ন্যায্যতা বিষয়ে সন্দেহ সত্ত্বেও তাঁকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে,—নিশ্চয়ই চৌধুরীর উপরই ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে। আপনারা এরকম না ভেবে পারবেন না জানি, কারণ চৌধুরীর ইংলণ্ড যাওয়ার আগে ১৯৪৮ সালে লিণ্ডওয়ালের পা ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে যায় কি না, এই নিয়ে কি কম হৈ-চৈ হয়েছিল ? কিংবা ১৯৫৩-৫৪ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে টনি লকের থ্রো নিয়ে ? লিণ্ডওয়াল ও লক যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের ভরসাস্থল। নিশ্চয় চৌধুরীও ভারত-পক্ষে তাই।

হা হতোস্মি! চৌধুরীকে যে একটা টেস্টেও খেলান হলো না! মিত্তিরদা বলেছিলেন, একে বলে ভালবাসা! বিনা পয়সায় ইংলণ্ড যাওয়ার, সেখানে টেস্ট খেলা দেখার সুযোগ, ভালো হোটেলে অবস্থান এবং বাড়তি-পক্ষে ভদ্ররকম পকেট-ভাতা। ক্রিকেট-সরকার সদাশয় নয় বলে কে ?

চৌধুরীর বোলিং-এর উপর একটি শব্দ বড়ো অক্ষরে লেখা ছিল,—আক্রমণ। অবিরত আঘাত করে গেছেন। অমন একটা সুন্দর ভঙ্গি—

বেশ কয়েক পা দ্রুত ছুটে আসা, দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে ওঠা, তারপর অদ্ভুত মোলায়েমভাবে বাতাসের মধ্যে ভেঙ্গে পড়া, অথচ সমস্ত মিলিয়ে প্রখর শক্তির ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা—ভারতীয় বোলারদের বোলিং-এর মধ্যে এমন দৃশ্যসৌন্দর্যের রূপ দেখেছি কিনা সন্দেহ। সি এস নাইডু তো রীতিমত কুৎসিত, এবং হাজারে অসুন্দর। অমরনাথ অস্বাভাবিক ও মানকদ গোছালো। গুপ্ত বালকোচিত। অবশ্য মর্যাদায় সুষমায় অদ্বিতীয় হলেন গোলাম আমেদ। তথাপি উত্তেজনা, আবেগ ও মাধুর্যের সমন্বয় যদি কোনো ভঙ্গিতে থাকে সে চৌধুরীরই আছে। একমাত্র ফাদকারই চৌধুরীর কাছে আছেন। এই উঁচুদরের মধ্যগতি সুইঙ্গ বোলারটি বোলিং-এর সময় যে সুশ্রী নমনীয়তার সৃষ্টি করেন, তা বাস্তবিক নয়নানন্দকর। সুন্দর চেহারার সুন্দর বোলার হলেন ফাদকার। চৌধুরীর রীতিতে যেন আরো কিছু আছে—পতাকা উড়িয়ে উত্তাল হৃদয়ে ধেয়ে আসার মত সে একটা তরঙ্গিত শক্তিপূর্ণ প্রাণগতি।

বোলিং-ভঙ্গির মতই চৌধুরীর আসল বোলিং। বল হাতে করলেই উইকেট পাবেন, এই বিশ্বাস তিনি দর্শকদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। স্লো স্পিনাররা যেমন বিভ্রান্ত করেন, তার পরিবর্তে চৌধুরী ব্যাটসম্যানকে অবিরত বিদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। বোকা বানিয়ে আউট করে দিলুম না, একেবারে খোকা করে ছেড়ে দিলুম, এমনই তাঁর দুর্বলের উপর অত্যাচারের পদ্ধতি। যেদিন ব্যর্থ তিনি সেদিনও আস্থা সৃষ্টিতে ব্যর্থ নন। সেদিন আমরা নিশ্বাস ফেলে বলি, বরাত খারাপ, ভালো বল করেও উইকেট পেলেন না। যেদিন অনেকগুলো পেলেন সেদিনকার বক্তব্য—বাকি কটাও পেতেন যদি ক্যাচগুলো ধরা হোত।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেট প্র্যাকটিস দেখছিলুম ইডেন গার্ডেনে একজন ক্রিকেটারের সঙ্গে বসে। খেলা ও খেলোয়াড়ের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হতে লাগল ইতস্তত। রামাধীনের কয়েকটি বল দ্রুত পড়ে সাঁ করে ঢুকে গেল উইকেটে। বারবার উত্ত্যক্ত হলেন ব্যাটসম্যান। বাহবা দিলুম উচ্ছ্বাসভরে আমরা। হঠাৎ আমার কি মনে হোল জানি না, ঘুরে আমার

সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলুম, এন চৌধুরী সম্বন্ধে আপনার মত কি? আপনি তো তাঁর বিরুদ্ধে খেলেছেন।

খেলোয়াড়টি আমার দিকে পূর্ণচোখে স্থিরভাবে তাকালেন। তারপর শুধু বললেন চাপা গলায়—'টেরার্‌'।

তরুণ বাসনা-শিখা

(মুস্তাক আলী)

ক্রিকেট ভালবাসে তবু মুস্তাককে ভালবাসে না এমন একজন বাঙালীকে খুঁজে পেতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হবে। যদি তেমন কাউকে খুঁজে পান জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর বিরাগের কারণ কি? একটিমাত্র যে উত্তর বাঙালীসুলভ হতে পারে, সে হোল, মুস্তাকও যথেষ্ট আগোছালো উত্তেজনা নন। আর যদি শোনেন, তিনি মুস্তাক আলীর মত্ততা পছন্দ করেন না, তাহলে যদি পারেন অনুগ্রহ ক'রে তাঁর পকেটে বোম্বায়ের একটা টিকেট গুঁজে দিয়ে বলবেন, ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে নিখুঁত খেলা হয়, দয়া করে সেখানে গিয়ে উপভোগ করুন।

মুস্তাকের মধ্যে কি দেখেছি? নিজেকে। আমার কামনাকে, কামনার পূর্তিকে এবং ব্যর্থতাকে। খেলার জগতে খাঁটি বাঙালী হলেন মুস্তাক আলী। পৃথিবী বড় বিচিত্র, বিধাতার বিধানও দুজ্ঞেয়। খাঁটি বাঙালী ক্রিকেটার বাংলা দেশের মানুষ নন। ক্রিকেটের অকৃত্রিম বাঙালীকে বাঙালী পায়নি নিজ দেশে। মুস্তাক আমাদের ক্রিকেটের প্রবাসী জাতি-চরিত্র।

আমাকে যদি এখনি বলা হয়, তোমাকে টেস্ট ক্রিকেটে স্থান দেওয়া হোল, কার মত খেলবে? অন্য সকলে তো নিশ্চয়, আমার ক্রিকেট-দেবতা ব্রাডম্যানকে পর্যন্ত বাদ দেব। বেছে নেব মুস্তাক আলীকে। কারণ টেস্ট ক্রিকেটে একটি সেঞ্চুরী করাই আমার বাসনা, ডবল সেঞ্চুরী না হলেও চলবে। খেলতে নামবার সময় সচেতন থাকব, সকলে আমাকে দেখছে। সহজ ঔদ্ধত্যের আবেগে ভাসতে ভাসতে উইকেটে পৌঁছব। ভাল করে,

তার মানে ঘটা করে, স্ট্যান্সও নেব না। বোলার কে? ভ্রূক্ষেপও করব না। কলেজের ছোকরারা যেমন ঘাড় বেঁকিয়ে জগৎসংসারের দিকে তাকায়, তেমনি করে আশেপাশে একবার অবহেলাভরে চাইব। তারপর বোলারের হাত থেকে বল বেরোনামাত্র আমিও বেরিয়ে পড়ব, ক্রীজের বাইরে গিয়ে আমার হাতের ব্যাট চরকি-ঘুরে যাবে। সাঁ করে বল চলে যাবে বাউণ্ডারীতে। হাততালিতে কানে তালা ধরার জোগাড়। আরো চাই, আমার আরো হাততালি চাই। পরের বলকে ঠিক অমনিভাবেই বাউণ্ডারীতে পাঠাতে ব্যাট চালাব। পরেরটাও বাউণ্ডারী হবে—নিশ্চয়তা কি—বোল্ডও তো হতে পারি, অন্তত স্টাম্পড্? হয়ত নির্বাচকমণ্ডলী চাইবেন না আমাকে টেস্টে আর চান্স দেওয়া হোক, কিংবা আপনিও, বাঙালী হয়েও, বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমাকে বাদ দেওয়ার পক্ষেই রায় দেবেন দুঃখার্ত চিত্তে—তথাপি আমার গুরু শ্রীমুস্তাক আলী।

ক্রিকেটের সাহিত্যে অমরত্বের বাসনা যদি কারো থাকে, শরণাপন্ন হতে হবে নেভিল কার্ডাসের। শুধু ভাল খেললেই চলবে না, শ্রীযুক্ত কার্ডাসের কল্পনাশক্তিকে আকর্ষণ করা চাই। আর চাই খেলার মধ্যে জাতি-চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করার প্রতিভা। নেভিল কার্ডাস জ্বলে উঠবেন আনন্দে যখন তিনি খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখবেন তার দেশকে। মানুষের উপর থেকে তার জাতিস্বভাবকে দূর করে দিয়ে তাকে বিশ্বমানবের নির্ঘণ্ট বানানোয় কার্ডাস বিশ্বাস করেন নি। 'আমরা আমরা, তোমরা তোমরা'—কিপলিং-এর এই কথার সঙ্গে কার্ডাস যোগ করে দিয়েছেন, আমরাও মহান, তোমরাও মহান। তোমাদের সঙ্গে আমরা মিলব, কিন্তু 'আমি' 'তুমি' বজায় রেখে।

নেভিল কার্ডাসের কলমে আবিষ্কারের আনন্দবর্ণ—তিনি রৌদ্রতপ্ত দূর ভারতের রহস্যময় সৌন্দর্য দেখেছেন মুস্তাকের মধ্যে। রণজির উপর গার্ডিনারের লেখা বাদ দিলে বোধহয় ভারতীয় খেলোয়াড়ের উপর স্মরণীয়তম রচনা নেভিল কার্ডাসের, যাতে তিনি ১৯৩৬ সালে মার্চেন্ট-মুস্তাকের দ্বৈত টেস্টসেঞ্চুরীর রূপ বর্ণনা করেছিলেন। সেখানে মুস্তাক সম্বন্ধে বলা আছে—

'কল্পনায় ও প্রতিভায় পূর্ণ। শিথিল ও ললিত সৌন্দর্যে আবৃত ছিল ভিতরকার শক্তি, যেমন আবৃত রাখে আরণ্য শ্বাপদের দেহের চিকনতা তার অগ্নিচক্ষু ও তীক্ষ্ণ দন্তের ভয়াবহতাকে।'

মুস্তাক বাঙালী, বাংলা দেশে না জন্মেও। আমাদের কাছে মুস্তাক একবার কৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করেছিলেন তাঁর প্রতি বাঙালীর পক্ষপাতের কথা। বাঙালী তাকেই ভালবাসে যে যথেষ্ট হিসেবী নয়, সহসা ঝলসে উঠতে পারে, রাঙিয়ে দিতে পারে আকাশপ্রান্ত রক্তরাগে, তারপরে যদি সে হারিয়েই যায় ক্ষতি কি—কল্পনার রোমন্থন তো রইল বাঙালীর জন্য। আবেগময় বীরপূজা চলবে নতুন বীর না আসা পর্যন্ত।

একজন অবাঙালীকে বাঙালী বীর করেছে এ জিনিস সম্ভব হোত না যদি সেই মানুষটির মধ্যে সুপ্রচুর পরিমাণে এ জাতির পছন্দের পদার্থ না থাকত। জীবনের অন্য ক্ষেত্রের মতই ক্রিকেটেও স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে হলে লোটাকম্বলের বীজ পুঁতে মহাত্মা গান্ধী রোডে পাঁচতলা মহীরুহ ওঠাতে হয়। আমাদের দুরন্ত বালকত্ব চায় বটের ডাল পুঁতে ঘড়াঘড়া জল ঢেলে অবিলম্বে বনস্পতি। রামের সুমতির রামচন্দ্রই বাঙালীর ভালবাসার দুলাল।

তাই আমরা মুস্তাককে ভালবাসি। মুস্তাকও রাতারাতি কিছু করায় বিশ্বাসী। উইকেটে পৌঁছতে যেটুকু সময় লাগে, বাধ্য হয়ে সেটুকু সময় অকারণে ব্যয় করেন। উইকেটে পৌঁছানোর পর থেকে মুস্তাক অবিলম্বে বিদ্রোহী। সেই বিদ্রোহের ঔদ্ধত্য ব্যাটের ডগা থেকে যত সরবে প্রকাশ পায়, আমরা ততই মেতে উঠি। যদি আউট হয়ে যান? হায়, সেইটেই তো বাঙালী জীবনের নিত্য দুঃখ,—'মারী নিয়ে ঘর করি।' আমরা বড় দুঃখী জাত। আমাদের ভালো বিধাতার সহ্য হয় না। তবু আমাদের কবি বলেছেন,—'আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।' মুস্তাকের দ্বিতীয় ইনিংস কখন আরম্ভ হবে?

আমার মুস্তাক আমারই মুস্তাক। 'তবু তাঁর দায়িত্বহীন সৌন্দর্যবিলাস দেখে কি কেবল আমি মুগ্ধ? নহে নহে। যে দেখেছে সেই মজেছে। তবে দুঃখের কথা বেশী দেখতে পায়নি। কিন্তু একবার দেখাই চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে। মুস্তাক ইংরেজ লেখকদের মনে রণজির স্মৃতি এনেছিলেন

১৯৫৯ লর্ডস টেস্টে দুই অধিনায়ক পিটার মে ও পঙ্কজ রায়

'ভিনু মানকদের টেস্ট' নামে খ্যাত ১৯৫২ সালের লর্ডস টেস্টের চিত্র। ব্যাট করছেন— পঙ্কজ রায়। মাঠে দেখা যাচ্ছে (বাঁ দিক থেকে) বেডসার, হাটন, ইভান্স, কম্পটন। পিছন ফিরে ওয়াটকিন্স।
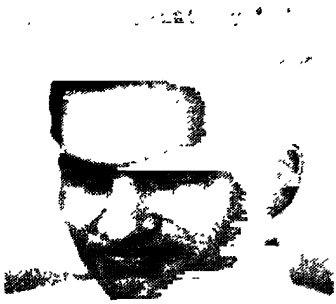
মুস্তাক আলী
'আধুনিক রনজি'

মন্টু ব্যানার্জি
শ্রেষ্ঠ বাঙালী বোলার

রিচি বেনোড
গুপ্তেকে বাদ দিলে বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেগব্রেক বোলার

১৯৪৬ সালেও। ও বছরটি মুস্তাকের বড় দুর্বৎসর। রান করতে প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। প্রথম টেস্টে বাদ দেওয়া হয়েছিল দল থেকে। দ্বিতীয় টেস্টে অন্তর্ভুক্ত করাতে বিদ্রূপ করেছিল বিলেতের সংবাদপত্র—'মুস্তাক কি করে স্থান পান বোঝা গেল না। তাঁর পক্ষে আছে তো মাত্র ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে করা দশ বছর আগেকার একটি সেঞ্চুরীর স্মৃতি!' এমন পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে মুস্তাকের কয়েকটি খেলা দেখেছিলেন ইংরেজ ক্রিকেট-লেখক। আমি তাঁর চোখে কয়েক পংক্তিতে মুস্তাককে দেখব :—

"(উরসৃটারের সঙ্গে ভারতের প্রথম ম্যাচ) মার্চেণ্ট ও মুস্তাক ভারত দলের খেলা সুরু করলেন। দুজনের মধ্যে আকর্ষণীয় পার্থক্য। চেহারায় এবং খেলায়। মার্চেণ্ট ঈষৎ স্থূল, সোজাভাবে হাঁটেন, মর্যাদাপূর্ণ ক্লাসিক্যাল রীতিতে ব্যাট ধরেন। অপরপক্ষে তির্যক ভঙ্গিমায় সুন্দর দীর্ঘতনু মুস্তাক আলী ব্যাটের উপর ঝুঁকে পড়েন এবং দ্রুত নমনীয় ভঙ্গিতে পদসঞ্চারণ করেন।

"......হাওয়ার্থ লেগের দিকে প্রলুব্ধ করার পরিকল্পনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। মুস্তাক অবিলম্বে তাঁর প্রত্যক্ষ শিকার হলেন। ফাঁকা লেগ সাইড মুস্তাকের পক্ষে বড় বেশী প্রলোভন। অফের দিকে অপস্রিয়মান একটি বলকে লক্ষ্য করে স্টাম্পের উপর সরে গিয়ে, সমস্ত শরীরকে অসম্ভব-রকম হেলিয়ে হঠাৎ মুস্তাক যেভাবে ব্যাট চালালেন তেমন বুনো মার উরসৃটার মাঠের ইতিহাসে কখনো ঘটেছে কি না সন্দেহ। মারটা একটু বেশী দ্রুত হয়ে গিয়েছিল—মুস্তাক বলটিকে মাত্র ছুঁতে পারলেন—বাকি কাজটা সেরে নিল উইকেটকীপার গ্রাভস বাড়িয়ে।"

"(দ্বিতীয় টেস্ট) মুস্তাক দ্রুত বলে খুবই খুসী। প্রথমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শীঘ্রই অসিচালনা সুরু হয়ে গেল, যার পরিণতি হয় রানে নয় ক্যাচে। যখন বেডসারের বলে লেটকাট করলেন, তা ছিল একেবারেই শেষ মুহূর্তের ব্যাপার, পিছনের পায়ের উপর বেঁকে গিয়ে দুহাত একসঙ্গে চাপড়ে দিলেন বলের উপর। ভোসের এক ওভারে তিনি একবার

দুই রানের, তারপরে চার রানের লেটকাট করলেন, তারপরে লেগে ঘোরালেন দু'রানের জন্য, তারো পরে যেটি ঘোরালেন সেটিতে রান হোল বটে একটি মাত্র, কিন্তু সেটি ছিল সৌন্দর্যে সেরা। এ সকলই এমন একটি সহজ কমনীয়তার সঙ্গে করা হতে লাগল যে, যারা অতীতকালের রণজিৎ সিংজীর কীর্তির কিংবদন্তী এত শুনেছে তারা মনে করতে লাগল বুঝি তিনিই আবার দেহ ধরেছেন।

"একুশ রানের মাথায় পোলার্ড এলেন। মুস্তাক একবার নিজেকে সংকুচিত করে এমন তীব্রভাবে ছড়িয়ে দিলেন যে, ভীষণতম কামানের গোলা ছুটে গেল কভারের মধ্য দিয়ে। যে সব মার তিনি মারছিলেন, তা নিরাপদে মারা যায় একমাত্র শয়নঘরে, আয়নার সামনে। কিন্তু যখন রাইট এলেন, আক্রমণের ভূমিকা গেল বদলে। লেগব্রেক সম্বন্ধে মুস্তাক নিতান্ত সন্দিগ্ধ, আয়না দেখে যেমন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে নিউগিনির আদিবাসীরা। নানা কাল্পনিক জুজু দেখতে সুরু করলেন। অপরপক্ষে মার্চেন্ট হুক করে দুটি বাউণ্ডারী করলেন এবং তাঁর নিজস্ব ১২ রান সংগৃহীত হয়ে গেল রাইটের দু'এক ওভারের মধ্যেই।"

"(তৃতীয় টেস্ট) চলাফেরায় লীলায়িত মুস্তাক। অমন মার-মার ব্যাটসম্যানের পক্ষে বিস্ময়কর তাঁর আত্মরক্ষার ভঙ্গি। তিনি সে সময় পেছিয়ে যান, মাথা একেবারে ঝুঁকিয়ে ফেলেন এবং সন্ত্রস্ত কচ্ছপের মত গুটিয়ে ফেলেন নিজেকে।

"......মুস্তাক গোভারের বল পাঠালেন কভারে তিন রানের জন্য। হাতীর শুঁড়ের মত তাঁর সম্প্রসারণশীল রূপ দেখা গেল।......

"মুস্তাক স্কোর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যে করেই হোক নিজেকে স্বভাবগত কদর্য ঝাঁটা-চালানো থেকে সংযত রাখছিলেন। তবে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আবার আত্মপ্রকাশ করল যখন তিনি ভাবালুভাবে উইকেটের উপর সরে গিয়ে স্মিথের একটি বল ঘুরিয়ে দিলেন অবজ্ঞাভরে।......

"সোমবারের প্রভাত উজ্জ্বলতর। ভারতের ইনিংস দেখতে বেশ বড় সংখ্যায় দর্শক সমবেত। মুস্তাক কাজের লোক। উইকেটের উভয় দিকে

মনোহারী কয়েকটি মার মেরে ২৫ মিনিটের কম সময়ে জুটির ১৫ রানের মধ্যে নিজের ১১ রান করে ফেললেন। তারপরেই হলেন রান আউট। সফরের এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইনিংস মুস্তাকের পক্ষে—চঞ্চল অথচ সুন্দর—মুস্তাকের পক্ষে অস্বাভাবিক সংযমের সৃষ্টি।"

১৯৩৬ সালে মুস্তাককে দেখেছিলেন নেভিল কার্ডাস। ১৯৪৬ সালে অনারেবল প্রিটি। তাঁদের দৃষ্টির সাহায্য নিয়েছি। মুস্তাক সম্বন্ধে আমার এতখানি আবেগ আছে নিজের কথা বলতে ভরসা পাচ্ছি না, আপনারা তাতে এখনি ভাবাতিশয্যের দোষ ধরবেন। পরের কথায় ঘরের ছেলের তাই গুণ গাই। ১৯৪৪ সালে মুস্তাককে দেখে বিলেতের-মুস্তাক ডেনিস কম্পটন বুঝেছিলেন—ভারতের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাটসম্যান। ১৯৪৫ সালে যখন অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দল ভারতে এল, তাদের সেকথা জানাতে কম্পটন ভোলেন নি। মুস্তাকের পরিচয় কিছুদিনের মধ্যে পেয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ানরা।—"ক্রীজে পৌঁছবার পরমুহূর্ত থেকে মুস্তাক বোলিং-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন in the most dynamic manner imaginable. তাঁর কয়েকটি মার খুবই বিপজ্জনক, এমনকি কুশ্রী, তবু সাধারণ ক্রীড়াপদ্ধতি চিতাবাঘের গতি ও লাবণ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।"

এই মনোভাবটি প্রকাশ করেই গোল বাধালেন অস্ট্রেলিয়ান দলের ক্যাপ্টেন হ্যাসেট। হ্যাসেট ভারতীয় সংবাদপত্রে জানালেন,—'মুস্তাক একজন কুশ্রী প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান।' মুস্তাকের আত্মসম্মানে ঘা লাগল, এত যে, প্রথমে যেন কোণের মধ্যে ঢুকে গেলেন অপমানে ক্ষোভে। তারপরে—মিলার লিখেছেন—

"দিল্লীতে সন্ধ্যের ককটেল পার্টিতে স্কচ হুইস্কি এবং মেলবোর্ণ বিটার বিয়ারটি কম খেলেই হোত। সন্ধ্যেটি কি সুন্দর ছিল! ঐ অত্যন্ত দামী সুরা এবং পাতিয়ালার যুবরাজের নিপুণ হাতে বাজানো পিয়ানোর ঝঙ্কার।"

পরের দিন—

"কোমলাঙ্গ, মাজা রঙের মুস্তাক আলী, যাঁকে ডেনিস কম্পটন ভারতের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যাটম্যান মনে করেন, আমাদের বোলিংকে যে প্রবল

হিংস্রতার সঙ্গে আক্রমণ করতে সুরু করলেন, তার তুল্য পূর্বে বা পরে কখনো ঘটেছে বলে মনে করতে পারছি না। মুস্তাকের মার এমন ভয়াবহ হচ্ছিল যে, আমাদের একজন ফিল্ডস্‌ম্যান ওভারের শেষে মুস্তাকের কাছে জানতে গেল তিনি আমাদের উপর কতখানি রেগেছেন। অদ্ভুত মনে হলেও সত্যি যে, এই ঘূর্ণীর মাঝখানে মুস্তাক ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন মধুরতম শান্তি ও সৌন্দর্যে ভরপুর।"

মুস্তাকের ক্রোধ বা ক্ষোভের কথা শুনে ভালোমানুষ হ্যাসেট ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইলেন আপোষে। কলকাতার বিদায় ডিনারসভায় বললেন, যদি তাঁকে আগামীকাল ক্রিকেটের পৃথিবী-একাদশ নির্বাচিত করতে বলা হয়, তাহলে তিনি মুস্তাককে সুনিশ্চিতের মধ্যে ধরবেন। কিন্তু হ্যাসেট কিছুতে মানবেন না, মুস্তাক কুশ্রী ব্যাটস্‌ম্যান নন।

মুস্তাক কিছু প্রশমিত হবার হাসি হাসলেন। তিন দিন পরে সম্পূর্ণ প্রশমিত হলেন। তিন দিন পরে মাদ্রাজ 'টেস্টে' হ্যাসেট কোনোক্রমে লাঞ্চ পর্যন্ত টিকে রইলেন একটি তৃতায় শ্রেণীর ইনিংস খেলে। মুস্তাক চুপি চুপি মিলারের পিছনে আসন টেনে নিয়ে বসলেন এবং একগাল হেসে ফিসফিসিয়ে বললেন, হ্যাসেট অবশ্য যথারীতি full of grace!

মিলারের সঙ্গে মুস্তাকের স্বভাবের মিল আছে। তাই মিলার কেবল খেলার নয়, মুস্তাকের স্বভাবের চরম প্রশংসা করে গিয়েছেন। বলেছেন, সেঞ্চুরীতে পৌঁছবার পরেই মুস্তাক স্থির করলেন, অপরকে জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভাল এবং সুন্দর ভঙ্গিতে প্রস্থান করলেন। ভিক্টর ট্রাম্পারের মত মুস্তাকের কাছে একবারের জন্য একশোই যথেষ্ট। মার্চেণ্ট, মোদীদের জন্য মুস্তাক ডবল সেঞ্চুরী রেখে দেন।

অস্ট্রেলিয়ানরা ভিক্টর ট্রাম্পারের নাম যথেচ্ছ টেনে আনতে সঙ্কোচ বোধ করে। খুব মুগ্ধ না হলে ট্রাম্পারের সঙ্গে তুলনায় বিরত থাকে।

এই মুস্তাক! একে নিয়ে করি কি—এই বিপজ্জনক সম্পত্তি নিয়ে? নীলা পাথরের মস্ত সৌভাগ্য ও সর্বনাশ দুই-ই দিতে পারে। সর্বনাশের সঙ্গে আমরা আত্মঘাতী প্রেম করতে পারি, কারণ আমরা বাঙালী দর্শক, কিন্তু ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ? তাঁরা বারবার বুঝিয়েছেন, মুস্তাক, একটু ধীরে চল।

মুস্তাক হয়ত অনিচ্ছুকভাবে স্বীকার করেছেন, কিন্তু যখনই মাঠে নেমেছেন অমনি জেগে উঠেছে ভিতরকার ঝিমানো সর্প।—না না না, সে হয় না, এতগুলো প্রত্যাশী চোখের সামনে বেনে মসলার দোকানদারী করতে পারেন না মুস্তাক আলী,—বাজী ধরেছেন মুঠো খুলে, ঘোড়া ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে—রোমান্স যদি না রইল জীবনের রইল কি ? যখন জিতেছেন তিনি—ঘটনা নিম্নোক্ত প্রকার ঃ—

১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে একটি খেলায় মুস্তাক বোলিং নিয়ে যা তা করতে সুরু করলেন। উইকেট থেকে বহু দূর এগিয়ে গিয়ে টম গর্ডাডের মত বিখ্যাত বোলারকে পেটাতে সুরু করলেন। গডার্ড ক্ষুব্ধ হয়ে আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টারকে বললেন, আমার সঙ্গে এ ব্যবহার কেউ করেনি।

লেসলি এমস এগিয়ে এসে বললেন, টম, ঢিট করে দাও না কেন ?

গডার্ড শুধু বললেন, কি করে ?

আর যখন হেরে গেছেন মুস্তাক ? একটি চমৎকার ঘটনা আছে।

১৯৫০-৫১ সালে কাণপুরে ভারতের সঙ্গে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ। এই খেলার সময় সর্বসাধারণকে আনন্দ দেবার জন্য একটি মনোরম ব্যবস্থা করা হয়েছিল—কোনো খেলোয়াড় আউট হয়ে চলে গেলে সেই বিরতিতে মধুর ব্যাণ্ডবাদ্য করা হবে। কমনওয়েলথ খেলোয়াড়রা আউট হয়ে ফিরেছেন একে একে, ব্যাণ্ড বেজেছে সুমধুর তানে দর্শকদের হৃদয়ের তানের সঙ্গে মিশে। এই ব্যবস্থা ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট পছন্দ করেন নি। কিন্তু অধিনায়কের উপর আছেন কর্মকর্তারা, তাঁরা রসকষহীন মার্চেণ্টের কথা শুনতে বাধ্য নন, তাঁরা দর্শকদের বঞ্চিত করতে চাননি কোনোমতে। দ্বিতীয় দিনের প্রায় শেষ, ভারতীয় দলের ব্যাটিং সুরু হয়েছে,—একজন ভারতীয় খেলোয়াড় আউট হয়ে ফিরে গেলেন। মুস্তাক আলী নামলেন। ক্রিকেটের নবকুমারকে অভ্যর্থনা জানাতে সে কি বিপুল করতালি ! সমস্ত মাঠ মেতে উঠল দিনশেষে মুস্তাকের উদয়ে। রামাধীন বল করতে সুরু করলেন—প্রথম বল—মুস্তাক সুন্দরভাবে আটকালেন। দ্বিতীয় বল—যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন মুস্তাক—রামাধীনকে

আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না—বোলারের মাথার উপর দিয়ে উঁচু করে বলটি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু হায়, যথেষ্ট উঁচু হোল না বল এবং খর্বকায় রামধীন একটি অদ্ভুত লাফ দিয়ে বলটি ধরে নিলেন। কট আউট। সকলের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল—কণ্ঠে কণ্ঠে সাঁড়াশীর চাপ—শব্দমাত্র নেই—শুধু নিশ্বাসের শব্দ—কালির বোতল গড়িয়ে পড়েছে—এমন সময় সুমধুর রবে বেজে উঠল ভারতীয় ব্যাণ্ডের সুবিখ্যাত আনন্দগীত ; তালে তালে লুটোপুটি করতে লাগল সুর রঙ্গভরে। দর্শকেরা এমন নিস্তব্ধ যে, শোনা গেল সুরের মৃদুতম ধ্বনি পর্যন্ত।

সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল খেলার মধ্যে ব্যাণ্ডবাদ্য।

মুস্তাক সম্বন্ধে আর কি লিখব। কেবল অনুরোধ তিনি যদি আবার ফিরে আসেন, সঙ্গে যেন বিজয় মার্চেন্টকে আনতে ভুলে না যান। মুস্তাক যখন ৬৫ রান করে আউট হয়ে যাবেন, তখনো মার্চেন্ট অপরাজিত থাকবেন ৫০ রান করে। প্রথম জুটিতে ১১৫ রান, কি চমৎকার ! তারপর মার্চেন্ট এগিয়ে যাবেন নিজস্ব ১৩৫ রান পর্যন্ত। মার্চেন্টের সেই ক্লাসিক ইনিংসের নিয়মিত ছন্দের মধ্যে একটি পূর্বশ্রুত গানের সুর গুঞ্জরণ করতে থাকবে। পঁয়ষট্টির ভৈরবী।

মুস্তাক মার্চেন্টকে যেন নিশ্চয় করে আনেন। নইলে হয়ত মুস্তাকের ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ হয়ে আত্মদংশন করে বলব, মুস্তাককে বাদ দিয়ে দাও দল থেকে। আমাদের পক্ষে তা মৃত্যুতুল্য হবে। অথচ আমাদের একটি গৃহস্থ মন আছে। একটি সচ্ছল সংসারের কামনা। মার্চেন্ট যখন সম্পদবান গৃহকর্তা, তখন তরুণ বাসনাশিখাটি কি সুন্দর !

কি সুন্দর মুস্তাক !

সমুদ্রসন্তান

(লালা অমরনাথ)

সমস্ত ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্যে (রণজি বাদ) নিছক প্রতিভাগুণে অমরনাথ অদ্বিতীয়। এই প্রতিবাদসাপেক্ষ কথাটি উপস্থাপিত করতে

আমি কুণ্ঠিত নই। আমাকে আক্রমণ করে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, আমার ক্রিকেট-অভিজ্ঞতা কতটুকু? আমি প্রতিপ্রশ্ন করব—আপনাদের? আপনারা সকলেই রণজির সর্বোত্তম প্রতিভা-সম্বন্ধে ঐকমত। সে তো রণজির খেলা না দেখেই, নাকি?

অমরনাথ সম্বন্ধে আমি বড় বেশী দাবী করছি। 'ভারতের ডবলিউ জি গ্রেস' সি কে নাইডুর কি হোল? কিংবা 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অলরাউণ্ডার' ভিনু মানকদ? 'তাঁর নিজকালে বিশ্ব-একাদশের অন্যতম' অমর সিং, বা আমার অতি প্রিয় 'আধুনিক রণজি' মুস্তাক আলী? দলীপ বা পাতৌদিকে বাদ দিয়ে রাখছি খেলায় প্রবাসী বলে, আর বাদ দিচ্ছি বিজয় মার্চেণ্টকে যিনি স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে এত বেশী পরিমাণে অনুশীলন যোগ করে দিয়েছিলেন যে, আপেক্ষিকভাবে কোনটির পরিমাণ বেশী তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিজয় হাজারেও বাদ যাবেন তুলনাত্মক বিচার থেকে। কারণ সহজেই বোধগম্য।

তাহলে অমরনাথের সঙ্গে বিচারে আসছেন অলরাউণ্ডার সি কে নাইডু ও ভিনু মানকদ, ব্যাটসম্যান মুস্তাক আলী এবং বোলার অমর সিং।

অমর সিংকে এখনি বাদ দেব। অমর সিং যত বড় বোলারই হোন না কেন,—অনেকের মতে তিনি সর্বকালের ভারতীয় বোলারশ্রেষ্ঠ,—হ্যামণ্ডের মতে তাঁর দেখা নতুন বলের শ্রেষ্ঠতম বোলার,—তাঁর পক্ষে 'বিশুদ্ধ' প্রতিভার দাবী বেশী ওঠেনি। আমি প্রতিভার সেই রূপের কথা বলছি যা নির্দিষ্ট স্বভাবে তো বটেই, অনির্দিষ্ট স্বভাবেই বেশী স্তম্ভিত করে ফেলে মানুষকে।

সি কে নাইডু, ভিনু মানকদ এবং অমরনাথ, ভারতের তিন শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার। এর মধ্যে ভিনু মানকদ রেকর্ডবুকে সবচেয়ে উজ্জ্বল। তিনি টেস্ট ক্রিকেটে একশো উইকেট এবং হাজার রানের দ্রুততম দ্বৈত কীর্তি করেছেন। এখন তাঁর ঝুলিতে দু' হাজারের উপর রান এবং প্রায় দুশো উইকেট। সি কে নাইডু বা অমরনাথ অনেক পেছিয়ে আছেন এ সব ব্যাপারে। আমরা ভিনুর প্রশংসা করে বলব, শেষ পর্যন্ত রেকর্ড-বুকই জয়ী। কিন্তু তাবলে প্রতিভায় ভিনু ঐ দুজনের থেকে এগিয়ে আছেন

মানতে পারি না। ভিন্নুর আছে ভাগ্য। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে টেস্ট খেলবার সুযোগ পেয়েছেন। এবং কিছু মনে করবেন না, রেকর্ডের সহায়ক সদ্যোত্তিন্ন পাকিস্তান বা ক্রিকেটের চিরশিশু নিউজিল্যাণ্ডকে পেয়েছেন বিপক্ষে। তা ছাড়া ভারতীয় বোলিং-এর অতি দুর্দিনে ভিন্নুর অবস্থিতি। বহু সময় তাঁকে অপরিসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠায় একলা বোলিং-এর প্রায় সমস্ত ঝুঁকি কাঁধে নিতে হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে তাঁর কাঁধ শক্ত, কিন্তু কিছু সুবিধাও হয়েছে—উইকেট পেয়েছেন যথেষ্ট, যেহেতু শেষ পর্যন্ত ব্যাটসম্যানকে আউট হতে হয়। যখন দলে অনেকগুলি ভালো বোলার থাকে, তখন উইকেট ভাগাভাগি হয়ে যায়। তাছাড়া আমি সাধারণভাবে বোলাররূপে ভিন্নুর 'স্বাভাবিক' প্রতিভা বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হতে দেখিনি বড় ক্রিকেট সমঝদারকে।

ভালো উইকেটের উত্তম ন্যাটা স্লো বোলার ভিন্নু মানকদ অপেক্ষা ব্যাটস-ম্যান ভিন্নু অনেক বেশী সাহসী ও কল্পনাপ্রিয়। কিন্তু আশা করি অমর-নাথের স্বাভাবিকত্বের পাশে তাকে কেউ দাঁড় করাবেন না।

মহান সি কে নাইডু সর্বাঙ্গীণতায় ভারতীয় ক্রিকেটে অনতিক্রান্ত। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, ক্যাপ্টেনসি, কোথায় সি কে মহীয়ান নন? তাঁর শক্তি অনেক সময়ই প্রাকৃতিক, তাঁর ব্যাটিং ক্রিকেটের ধর্ম-সমাজে 'ব্রাত্য', সকল বেড়ার বাইরে। তবু, তাঁকে সম্মান জানিয়েই বলব, শক্তির উদ্ধত প্রকাশে অতুলনীয় সি কে-ও এক জায়গায় অমরনাথের কাছে হেরে গেছেন—শক্তির প্রকাশ-লাবণ্যে। সি কে আমাদের যখন স্তম্ভিত করে রাখেন তখন অমরনাথের ব্যাটে বিপ্লবের বীণা বাজে। ঝড়ের রাতের সেই সঙ্গীত অমরনাথের বিধিদত্ত।

বোলাররূপে সি কে আত্মগঠিত। সেখানে স্বাভাবিকত্বের কথা উঠে না।

একমাত্র মুস্তাক, আমার মুস্তাকই অমরনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার মুস্তাক কি না পারেন? যতক্ষণ সীমার মধ্যে ততক্ষণ মুস্তাক কুশ্রী ব্যাটস্-ম্যান। সীমার বাইরেই তাঁর লীলার সূচনা। প্রতিভা ছাড়া সে জিনিস সম্ভব হয় না। উইকেট থেকে চার ফুট প্রমাণ জায়গায় নাম পপিং ক্রীজ। গোপালের মত সুবোধ ব্যাটসম্যানেরা সেই জায়গায় কপি বুকের

খোঁটা-বাঁধা অবস্থায় খেলা দেখিয়ে থাকেন। মুস্তাক বালকের নিষিদ্ধ কৌতুহল, তরুণের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিভার সৃষ্টি-প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিটকে ছিটকে এগিয়ে যান সেখান থেকে,—লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন চতুর্দিকে। মুস্তাক আলাকে বাঁধতে পারেন একমাত্র আম্পায়ার, তাও একটি ইনিংসের জন্য, মুস্তাকের ভুলের (প্রায়ই সুলভ) সুযোগে। নমনীয় সুষমায় মুস্তাক অমরনাথেরও অগ্রসর।

কিন্তু সব জড়িয়ে অমরনাথ,—ব্যাটিং-এ, বোলিং-এ। প্রাকৃতিকতার ক্রীড়ারণ্যে সচল বনস্পতি। মুস্তাকের খেলায় একটা ডেলিকেসি আছে। বুঝতে পারি, বহু সময় মুস্তাক নিজের অধিকারের বাইরে যাচ্ছেন। প্রয়োজনীয় দুর্ভেদ্যতা নেই বলে মুস্তাকের সাহসিকতায় উল্লসিত হতে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। অমরনাথ সম্বন্ধে সে বোধই জাগে না। অমরনাথ যদি প্রথম তিরিশ রানের অস্বস্তি কাটালেন. তারপর পৃথিবীর যা কিছু তাঁর প্রচণ্ড ক্ষুধার খাদ্য। তখন অমরনাথের দ্বিতীয় জন্ম হয়ে গিয়েছে, তখন 'তরুণ গরুড় সম কি মহান ক্ষুধার আবেশ'। তখন সদ্যোজাত পবননন্দনের মত নবোদিত সূর্যকে গ্রাস করতে ছুটলেও কেউ বিস্মিত হয় না। কোনো কিছুর মর্যাদা নেই তখন, নেই কোনো কিছুর মূল্য। রথ গড়িয়ে চলেছে, চূর্ণ হয়ে যাবে পথের যা কিছু। ঝড় উঠেছে কালবৈশাখীর, হাওয়ার মুখে উড়ছে 'ভাঙা কুঁড়ের চাল'; সংহারের সৃষ্টিরঙ্গে মেতে ওঠেন অমরনাথ, চক্রের খণ্ডন ছাড়া সে উন্মাদকে থামাবার কোনো উপায় থাকে না।

অমরনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠরূপে চিরশ্রেষ্ঠ ব্রাডম্যানের সমতুল—স্বীকার করেছে অস্ট্রেলিয়ার ব্রাডম্যান-কাতর অধিবাসী।

অমরনাথের অধঃপতনের সূচনা এইখান থেকে। প্রতিভার পরাজয় আছে। ব্রাডম্যানের ক্ষেত্রে তা বারবার চরমতমকে ঘটাবার সাফল্যময় গতানুগতিকতা; অমরনাথের বেলায় চরমতমকে বিনা প্রস্তুতিতে ধরবার চেষ্টায় ব্যর্থতা। অমরনাথ ভুলে গিয়েছিলেন, আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যাটিং-প্রতিভা দিনের পর দিন যে অলৌকিক ব্যাটিং দেখিয়ে গেছেন, তার পিছনে ছিল যে পরিশ্রম, তাকেও সমভাবেই অলৌকিক বলা চলে। ব্রাডম্যান রক্ষণশীল নন। কখন? যখন তিনি রক্ষণশীলতার সর্বপ্রকার

সুযোগ গ্রহণ করে আরো প্রাপ্তির ক্ষুধায় নূতন একশ্রেণীর নিয়মহীন রক্ষণশীলতার সৃষ্টি করে থাকেন। ব্রাডম্যানের নিয়ম-ভাঙা নিয়ম-মানার মতই বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত।

অমরনাথ এইখানে হেরে গেছেন। চেষ্টা করলে তিনিও ব্রাডম্যান হতে পারতেন একথা বলতে যতখানি ছিন্নকর্ণ কটুভাষী হওয়ার দরকার, ততখানি আমি নই। কিন্তু ব্রাডম্যান থাকতেও পৃথিবীর অন্য ব্যাটসম্যান আছেন, দূর কালের রণজি বা পরবর্তী ফ্রাঙ্ক উলীকে বাদ দিচ্ছি, নিকটকালের কম্পটন তো রয়েছেন। কম্পটনকে স্বাভাবিক সামর্থ্যে অমরনাথের চেয়ে বড় বলবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু যে কোনো ক্রিকেট বইয়ের তারকা-গণনায় কম্পটন অবশ্যম্ভাবীর মধ্যে পড়েছেন, দীর্ঘ তালিকায় অমরনাথের নামোল্লেখ করতেও ভুলে গেছেন লেখকরা।

কিন্তু তার জন্য দোষ দেব অমরনাথকেই। অমরনাথের অনেক ত্রুটি, যার দুটির জন্য অবশ্য অমরনাথ দায়ী নন। একটি হোল, তিনি ভারতবর্ষের মানুষ এবং ভারতবর্ষ সাধারণভাবে ক্রিকেট-ম্যাপের অন্ত্যেবাসী। অন্য ব্যাপারের মতই ক্রিকেটেও পৃথিবী উঠছে পড়ছে এখনো শ্বেতকায়দের কেন্দ্র করে। কৃষ্ণবর্ণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রতিবাদ জানিয়েছে, কিন্তু অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে পিঙ্গল ভারতবর্ষের প্রতিবাদলিপি। দ্বিতীয় ত্রুটিও অমরনাথের হাতের বাইরে, হিটলারের কীর্তি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—যা অমরনাথের যৌবনের দানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বারুদের ধোঁয়ায়। তৃতীয় ত্রুটি—অমরনাথ কিছু দায়িত্ব যার স্বীকার করতে বাধ্য কিন্তু মূল দায়িত্ব অন্যের—অমরনাথের প্রত্যাবর্তন ১৯৩৬ সালে। সাফল্যের মুখে মাননীয় ভিজি এবং বৃটন জোন্স অমরনাথকে অবাঞ্ছিত বলে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্যভেদে উদ্যত কর্ণের বিরুদ্ধে পাঞ্চালীর ভঙ্গি ছিল তাঁদের, পাঞ্চালীর চরিত্র বাদ দিয়ে।

অমরনাথের ক্রীড়াজীবনের উপর এই সব ছায়াপাত হয়ত ইচ্ছে করলেও তিনি এড়াতে পারতেন না। কিন্তু যাকে এড়াতে পারতেন একটু চেষ্টায়? যিনি ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্টের আগে পর পর সেঞ্চুরী করে গেলেন, সকলকে হতচকিত করে অস্ট্রেলিয়ায় যাঁর একক কীর্তির

পতাকা উড়তে লাগল, তিনি টেস্টে কি করলেন? অমরনাথের ক্রিকেট-জীবনদেবতার অকাল মৃত্যুতে নামানো পতাকা দেখে ব্রাডম্যান ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গ না করে পারেন নি—

'অমরনাথ নিজের স্বাভাবিক সামর্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে বড় বেশী বিশ্বাস করেন। এত বেশী যে, ব্রেক-এর উল্টো দিকে মারার মত বহুপ্রকার অনাবশ্যক ঝুঁকি নেবার স্বাধীনতা উপভোগ করেন। ফলে অজস্রবার তাঁর পতন হয়েছে মিছামিছি।"

ব্রাডম্যানের ঈগলচক্ষু অমরনাথকে আবিষ্কার করেছে অবিলম্বে। ব্রাডম্যান সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁর আছে ক্রিকেটের ষষ্ঠেন্দ্রিয়। বুদ্ধিপ্রয়োগ তো করেনই, তারো আগে সংস্কারের দ্বারা বুঝতে পারেন কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। ব্রাডম্যান অমরনাথের প্রশংসা করে বলেছেন,—একজন চমকপ্রদ রানকারী, ব্যাটসম্যানরূপে পৃথিবীর যে কোনো শ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্য। মেলবোর্ণ মাঠে অমরনাথের ইনিংস সেই মাঠের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আবার অমরনাথের প্রতিভা-বিলাসিতার সমালোচনাও করেছেন। সবচেয়ে সম্ভ্রম প্রকাশ করেছেন অধিনায়ক অমরনাথের সম্বন্ধে। অমরনাথ শ্রেষ্ঠ দেশদূত।

"আমার ক্রিকেট-জীবনের সবচেয়ে আনন্দোত্তেজিত ক্ষণ" বলে বিশ্ব-ক্রিকেটের অবিসংবাদিত অধিনায়ক যাকে নির্দেশ করেছেন, সেই ক্ষণটি এসেছিল ভারতের সঙ্গে খেলার সময়েই। ঐ পরম চাঞ্চল্যের মধ্যে আরো একটু উত্তাপরস সঞ্চারিত দেবার দায়িত্ব ছিল অমরনাথের। একমাত্র অমরনাথই সে জিনিস পারেন।

ব্রাডম্যানের নিরেনব্বুইটি প্রথম শ্রেণীর সেঞ্চুরী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া একাদশের সঙ্গে সিডনি ক্রিকেটমাঠে ভারতের খেলা। ব্রাডম্যান খেলছেন। তাঁর বড় প্রিয় সিডনি মাঠে শততম সেঞ্চুরী করতে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

ভারত প্রথমে ব্যাটিং করার পরে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামল সেদিন লাঞ্চের অনেক আগে। অত্যন্ত ধীরে মাত্র ১১ রান করলেন লাঞ্চ পর্যন্ত ব্রাডম্যান। খবরের কাগজে বেরিয়েছে ব্রাডম্যান শততম সেঞ্চুরী করতে পারেন, মাঠ ভেঙে পড়েছে উৎসুক দর্শকে।

চা-পান পর্যন্ত ব্রাডম্যান ও মিলার নিয়মধীর খেলা খেললেন। ভারতীয় দল প্রবল উৎসাহে খেলছে, তীক্ষ্ণ নিপুণ আক্রমণ।

ব্যক্তিগত রান নব্বুইয়ে পৌঁছল। এইবার হ্যাঁ, ব্রাডম্যান পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ক্রিকেটের নামকরা নড়বড়ে নব্বুই, যার পিছনে এক্ষেত্রে আছে নিরেনব্বুইটি সেঞ্চুরী।

এক এক করে রান বাড়তে লাগল। ব্রাডম্যান স্কোয়ার লেগে বল ঘুরিয়ে এক রান নেবার পর আর এক রান নিতে যাচ্ছেন,—সর্বনাশ! দর্শকেরা দমবন্ধ করে আসনের উপর দাঁড়িয়ে উঠল। আর একটু হলে রান আউট! উত্তেজনাসঙ্কুল টেস্ট ম্যাচেও এমন তড়িৎস্পৃষ্ট আবহাওয়া দেখা যায় না।

অবশেষে নিরেনব্বুই। নিরেনব্বুইটি সেঞ্চুরী, তার উপরে নিরেনব্বুই রান। নিরেনব্বুই-এর ধাক্কা পুরোপুরি দেবার জন্য বেড়ার ধার থেকে অমর-নাথ কিষেণচাঁদকে ডেকে আনলেন, যাকে বল করতে আগে দেখা যায়নি।

প্রতিভাবান অমরনাথ! ব্রাডম্যান সানন্দে বলেছেন,—অদ্ভুত চালাকি! যে কেউ প্রতারিত হতে পারে। পরম সম্মানের সঙ্গে ব্রাডম্যান কিষেণচাঁদকে খেলতে লাগলেন নিরেনব্বুইটি সেঞ্চুরীর পরে নিরেনব্বুই রানের মাথায়।

বলাবাহুল্য, ব্রাডম্যানের শততম সেঞ্চুরী হয়েছিল এবং তারপরে ব্রাডম্যান ৪৫ মিনিটে ৭১ রান করে দর্শকদের দর্শনীকে দ্বিগুণ মূল্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু অমরনাথকে ব্রাডম্যান চিনেছিলেন এবং সেই অমরনাথকে তিনিই আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন।

আর দিয়েছেন একটি 'ক্ষতিকর' অমরনাথের পরিচয়।

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের ভ্রমণ ব্রাডম্যানের অভিজ্ঞতাময় জীবনের ইতিহাসে একটি 'মধুরতম স্মৃতি।' অস্ট্রেলিয়ান ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল 'অপূর্ব সৌহার্দ্য' এবং ব্রাডম্যান স্বেচ্ছায় ভারতীয় দলের মানোন্নয়নের প্রীতি-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন উপদেশে অনুরোধে অপরিণত ভারতীয় দলের পরিণতি-সাধনে। কেবল একটি ব্যাপারে তাঁর, অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডেরও, অনুরোধ রক্ষিত হয়নি।

ব্রাডম্যান চেয়েছিলেন, উইকেট ঢেকে রাখা হোক,—অমরনাথ বলেছিলেন, —না। বিষাদ হাস্যের সঙ্গে ব্রাডম্যান বলেছেন, একথা সত্য, আমরা ইংরেজদের মত ভিজে মাঠে খেলতে পারি না। কিন্তু ভারতীয়দের চেয়ে তো পারি। ভারতের চেয়ে অনেক বেশী ভিজে মাঠ আমরা পাই অস্ট্রেলিয়ায়। তাছাড়া গেটের টাকার কথাও ভাবতে হয়। অস্বাভাবিক দ্রুত খেলা শেষ হয়ে গেলে আর্থিক দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

অমরনাথ তবুও বলেছিলেন,—না।

কারণ? অমরনাথ ব্রাডম্যানের মতই জানতেন, শুকনো মাঠে হালে পানি নেই ভারতীয়দের, সুতরাং পানির জন্য ভিজে মাঠই বিধেয়। যদি একবার সুবিধামত অস্ট্রেলিয়ানদের ভিজে মাঠে পাওয়া যায়, যদি প্রকৃতি-দেবী একটু পক্ষপাত দেখান, যদি—!

হ্যাঁ—যদি! যদি তেমন ঘটে তাহলে অমরনাথের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ান দলকে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে হারিয়ে দেবে। ব্রাডম্যানকে সংহার করে ভারতের প্রথম টেস্ট বিজয়োৎসব পালিত হবে অমরনাথের নেতৃত্বে।

সুতরাং হারতে হবে ভারতকে শোচনীয়ভাবে পর পর বৃষ্টিভেজা মাঠে ইনিংসে। গেটের শূন্য কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে শূন্য মনে 'পিটার' গুপ্তকে। কারণ অমরনাথের খেয়ালী কল্পনায় একটি বিরাট সম্ভাবনার 'যদি' আছে।

কিন্তু সত্যই হোত 'যদি'! হে ঈশ্বর, তুমি এত নিষ্করুণ কেন? তোমার নির্মমতার বিরুদ্ধে অমরনাথের সঙ্গে আমরাও অভিযোগ জানাচ্ছি।

এই হলেন অমরনাথ, 'বিরাট' একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে ভারতীয় ক্রিকেটে যাঁর উদয়, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যেতেই যাঁর আনন্দ। এমন আত্মক্ষয়ী প্রতিভা কোথায় দেখেছি! ব্যাটসম্যানরূপে হিসাবের খাতা ছিঁড়ে ফেলে মূলধন ভাঙতে তাঁর উল্লাস, বোলিং-এর সময় বিচিত্র ছন্দে 'ভ্রান্তপদে' বিভ্রান্ত করতে তাঁর সুখ, অধিনায়করূপে বিপুল কল্পনাশক্তির সঙ্গে বাস্তববোধকে অস্বীকার করায় তাঁর স্ফূর্তি, এমন মানুষ চিরকালের প্রব্লেম। ভারতীয় ক্রিকেটের সমস্যাসন্তান হলেন অমরনাথ।

অমরনাথকে অন্যত্র ক্রিকেটের মধুসূদন বলেছি। বায়রণ বললেও পারতুম। অদ্ভুত আকর্ষণীয় আর অসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল সমুদ্রসন্তান বায়রণ। সমুদ্রতরঙ্গ তাড়িত করে অমরনাথ উঠে আসছেন এ যেন স্পষ্ট দেখছি। ঝড়ের হাসি অমরনাথের জীবনে দেখতে বেশী দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন হবে না,—চোখ চাইলেই দেখব উত্থান-পতনের বিচিত্র তরঙ্গমালা। যিনি ১৯৩৩-৩৪ সালে জার্ডিনের এম সি সি দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট-আবির্ভাবে সেঞ্চুরী করেছিলেন, সমুদ্রপারে ইংলণ্ডে ১৯৩৬ সালে প্রথম টেস্টের পূর্বেই দলের সর্বাধিক ৬১৩ রান এবং ৩২টি উইকেট নিয়েছিলেন—মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ৬।২৯ উইকেট এবং তার পরেই এসেক্সের বিরুদ্ধে দুটি ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরী শুদ্ধ,—তিনি আবার তাঁর সমুদ্রকে ফিরে পেলেন,—প্রথম টেস্টের পূর্বে গৃহপথে সমুদ্রযাত্রা করার সময়ে। দেশে ফেরার পর দেখা গেল অমরনাথের দোষ অল্পই ছিল।* সুতরাং ১৯৩৭-৩৮এ লর্ড টেনিসনের বেসরকারী দলের বিপক্ষে পর পর তিনটি খেলায় সেঞ্চুরী করার সৌভাগ্য পেলেন। তারপর ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাট ঘুরিয়ে ১৯৩৮ সালে পেণ্টাঙ্গুলারে রেস্টের বিরুদ্ধে করলেন ২৪১ এবং সিন্ধু প্রদেশের বিপক্ষে নিলেন ২ রানে ৪ উইকেট, যাতে সিন্ধু দ্বিতীয় ইনিংসে নেমে গিয়েছিল ২৬ রানে, যদিও সিন্ধু ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী এবং প্রথম ইনিংসে করেছিল প্রচুর রান। তারপর ১৯৪৫ সালে লিণ্ডসে হ্যাসেটের অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে করলেন মোট ৪৪৭ রান, —দিল্লীতে ১৬৩ এবং মাদ্রাজে ১১৩ রান সমেত ; প্রথম ভ্রমণের দশ বছর পরে ইংলণ্ডে গেলেন ১৯৪৬ সালে, ভয়াবহ ভিজে আবহাওয়ায় শুকনো পঞ্জাবের অধিবাসী অমরনাথের ব্যাটে রান এল না, কিন্তু বলে এল ধার, কয়েকটি চমকপ্রদ বোলিং দেখালেন ; অস্ট্রেলিয়া গেলেন ১৯৪৭-৪৮ সালে, সুরু করলেন শূন্য দিয়ে, তারপর প্রথম টেস্টের পূর্ব পর্যন্ত করে চললেন—সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৪৪ ও নট আউট ৯৪, ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ২৮৮ নট আউট, কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৭২ নট আউট ; সুরু হোল টেস্ট,

* অসদাচরণের জন্য অমরনাথকে সফরের আগেই ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। এ নিয়ে ভারতবর্ষে ক্রিকেটের তুমুলতম আন্দোলন হয়।

—পাঁচটি টেস্টের দশ ইনিংসে করলেন শোচনীয় মোট ১৪০, অ্যাভারেজ ১৪ ; টেস্টের বাইরে হাজারের উপর রান অ্যাভারেজ ১০০'২ ; বোলিং-এর দ্বারা ক্ষতিপূরণের চেষ্টায় পেলেন—মেলবোর্নে নিখুঁত উইকেটে প্রথম ইনিংসে ৪।৭৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩।৫২ ; টেস্ট ম্যাচে বোলিং অ্যাভারেজে প্রথম এবং প্রথম শ্রেণীর খেলাতে ব্যাটিং অ্যাভারেজে প্রথম। দেশে ফিরলেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম অবতরণে ২২৩ নট আউট পাতিয়ালায় (ওয়ালকটের মতে সেই সিরিজে ভারতীয় পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং), কিন্তু তারপরেই যথেষ্ট খারাপ খেলে টেস্টে অ্যাভারেজ দাঁড় করালেন ব্যাটিং-এ মাত্র ৩৬'৭৫, বিস্মিত করলেন সকলকে শেষ টেস্টে আহত সেনের বদলে উইকেট রক্ষা করতে নেমে পাঁচটি ক্যাচ ধরে, কিন্তু চমক সৃষ্টি করলেন সবচেয়ে—পর পর পাঁচটি টেস্টে টসে হেরে গিয়ে।

এইখানেই শেষ নয়, ভারতের শ্রেষ্ঠ দুজন অধিনায়কের একজন হয়ে (সি কে নাইডু অপরজন) এবং ক্রিকেট-সামর্থ্য সম্পূর্ণ না খুইয়েও ১৯৫২ সালে ইংলণ্ডযাত্রীদের সহগমনের অধিকার পেলেন না। তৎপরবর্তী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ সমন্ধেও একই কথা। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশের 'অঙ্গরাষ্ট্র' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁকে স্মরণ করা হোল এবং সেই সিরিজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতের ২—১ জয়লাভের গৌরব সবটা একলাই আত্মসাৎ করলেন। অন্তত পাকিস্তানের অধিনায়ক কারদার সেই রকম বলতেই চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন যে, অমরনাথের অধিনায়কত্বের কাছেই পাকিস্তানের পরাজয়। এর আগে, আমি বলতে ভুলে গিয়েছি অমরনাথের জীবনের আর একটি ঘূর্ণীর কথা—১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সফরের পর অধিনায়ক অমরনাথ নিজ স্বভাব অনুযায়ী কিছু মনের কথা খোলাখুলি জানিয়েছিলেন। তাতে ক্রোধোন্মত্ত বোর্ড দ্বিতীয় বারের জন্য ফতোয়া জারী করল অমরনাথের বিরুদ্ধে—তিনি কোনো প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান করতে পারবেন না। অমরনাথ আদালতের শরণাপন্ন হলেন ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে। অমনি বোর্ড কুঁকড়ে গিয়ে বলল, সব ঝুটো, আমার মর্যাদা ঝুটো, অমরনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিও তদনুযায়ী ঝুটো। এইখানেও যদি শেষ হতো ! যে অমরনাথকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন

ভিজিয়ানাগ্রামের মাননীয় রাজকুমার ১৯৩৬ সালে, যে অমরনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ১৯৪৯ সালে, সেই অমরনাথ ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম কর্তা হয়ে বসলেন যখন মাননীয় ভিজিয়ানাগ্রাম ভারতীয় ক্রিকেটের পথ-পরিচালক। অমরনাথ নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি ভিজির 'রাজত্বকালে'। অতঃপর ?

ভারতীয় ক্রিকেটের অস্থির অঘটন অমরনাথ সম্পর্কে কোনো শেষ কথা নেই। ভারতীয় ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধেও তাই। যিনি ড্রেসিং-রুমে ব্যাট ছুঁড়ে ফেলার জন্য শাস্তি পেয়েছেন, তিনিই প্যাভিলিয়ানের বেতের সিংহাসনে বসে শাস্তি দেবার মালিক আজ। কি বিচিত্র এই দেশ! ভারতবর্ষের মনের ঐতিহাসিক গ্রহিষ্ণুতার এমন দৃষ্টান্ত বেশী মিলিবে না। বিদ্রোহীকে গলায় মালা পরিয়ে উঁচু আসনে বসালে সে সভ্যসুজনরূপে রাজ্যশাসন করে। ক্রিকেটের রাজতন্ত্রের বড়ো কাছাকাছি অমরনাথ আছেন, নতুন বিদ্রোহ না আসা পর্যন্ত থাকবেন।

আমি ভাবছি অমরনাথের জীবনের কথা। ধরা যাক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর অধিনায়কত্ব। পর পর পাঁচটি টেস্টে টসে হার। ভাগ্যের মার। তিনটে টেস্ট ড্র হবার পরে চতুর্থ টেস্টে শোচনীয় পরাজয়। পঞ্চম এবং শেষ টেস্ট বাকি। পঞ্চম দিনের শেষে ৬ রান করতে পারলে ভারত জেতে, হাতে দুটো উইকেট। ভারত জিততে পারল না সময়াভাবে।

অমরনাথ পারলেন না। শেষ পর্যন্ত কোথাও তিনি পারেন নি। শেষ রক্ষা করা তাঁর হয়নি। অমরনাথের ভাগ্যদেবতার বিরুদ্ধে অমরনাথের সঙ্গে আমাদেরও একটা অভিমান রইল,—পারলেন না কেন? এত প্রতিভা, এত সৃষ্টি, তবু সঙ্গীতহীন অপসরণ। আমরা চলে যাব কীর্তি-মন্দিরের হর্ম্যতল ছেড়ে দূর সমুদ্রে ; ফেনিল সাগরের তরঙ্গদোলায় দুলছে একটি দুরন্ত বালক, ওঠা-পড়াতে যার আনন্দ, ঘন গর্জনের সঙ্গে সফেন তরঙ্গের টুঁটি ধরে যে চীৎকার করে বলছে,—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন।' সমুদ্র আর মরুভূমির মাঝখানে বিস্তৃত অমরনাথের জীবন।

বিষণ্ণ আভিজাত্যে

(বিজয় মার্চেন্ট)

বিষণ্ণ লোকটি আরো বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। প্রোজেক্টর যন্ত্র থেকে আলো গিয়ে পড়ল পর্দার উপরে। ফুটে উঠল একজন বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটারের ছবি। খেলার নানা ভঙ্গির চলচ্চিত্র। একই জায়গার খেলা কয়েকবার দেখান হয়েছে। প্রতিবারই লোকটির বিষাদ বেড়ে গিয়েছে। ছিঃ, এই কি একটা ক্রিকেটের মার! আরো লজ্জা, সেটা বাউণ্ডারীতে গিয়েছে। আউট হলেই ভাল ছিল। লজ্জা লজ্জা! প্রোজেক্টর যন্ত্র চলতে থাকে।—এবার আউটের দৃশ্য। না, এতে লজ্জার কিছু নেই। ব্যাটসম্যানকে এক সময় আউট হতেই হয়, আর ও রকম বলে আউট হতে পারে পৃথিবীর যে কোনো খেলোয়াড়। কিন্তু সেই ভুল মারটি। রামঃ! প্রোজেক্টর বন্ধ হোল, ঘরে আলো জ্বলে উঠল। এক পাশে মস্ত একটা আয়না টাঙানো। তার সামনে ব্যাট হাতে নিয়ে বিষণ্ণ লোকটি গিয়ে দাঁড়ালেন। স্ট্যান্স নিলেন সতর্কভাবে। তারপর কাল্পনিক বলে ব্যাট চালাতে লাগলেন; প্রথমে ধীর পর্যবেক্ষণের ভঙ্গিতে, ক্রমে দ্রুত ও সাবলীলভাবে। শেষবার অদ্ভুত মোলায়েম ছন্দে হাতের ব্যাট ঘুরল। একটা দুরূহ অপূর্ব মার। কাল্পনিক বিপুল হাততালি শুনতে পেলেন। বিষণ্ণ মুখে হাসির মত একটা ভঙ্গি দেখা দিল। আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বিজয় মার্চেন্টের এই চিত্র কাল্পনিক কিন্তু অবাস্তব নয়। এ কল্পনা বস্তুভিত্তিক। শ্রীযুক্ত মার্চেন্টের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা এ চিত্রের বাস্তবিকতা স্বীকার করবেন। এমন কি ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরও দরকার নেই। মার্চেন্টের বিষণ্ণতা, নিপুণতা ও সিনে ক্যামেরা ভারতের ক্রিকেট-মাঠে একযুগ ধরে সাধারণ সামগ্রী।

মার্চেণ্ট জীবনে প্রশংসা অজস্র পেয়েছেন। সে সাধুবাদ তিনি অর্জন করেছেন। এই সব প্রশংসা তিনি স্বভাবসিদ্ধ সিনিক্যাল ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন। নিন্দা পর্যন্ত। আত্মসমালোচনায় তাঁর দ্বিধা নেই—সেখানেও সেই নির্লিপ্ত নির্বিকার ভঙ্গি। আবেগের স্থান তাঁর জীবনে সঙ্কীর্ণ। আমি শ্রীযুক্ত মার্চেণ্টের পরিচিত জনৈক ক্রিকেট-সমালোচককে মার্চেণ্টের স্বভাব-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলুম। তিনি বললেন, একটু থেমে,—দেখুন, আজ কুড়ি বছরের উপর মার্চেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ—খুবই আলাপ—কিন্তু আমরা বন্ধু নই।

বিজয় মার্চেণ্ট সহজে বন্ধু হন না, তিনি এলিয়ে পড়েন না অল্পে, তিনি জানেন তাঁর নিজের এবং অপরের কর্তব্যের পরিধি কতটুকু এবং গম্ভীর আত্মস্থ ভঙ্গিতে নিজের দায়িত্ব পালন করে যান, অপেক্ষা করে থাকেন অপরে তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন যথাযথ। যদি না করেন, শীতল ভঙ্গি ও ভাষায় সেকথা জানাতে দ্বিধা করেন না।

তাই মার্চেণ্ট বড় খেলোয়াড় হয়েছেন, বড় অধিনায়ক হতে পারেননি। যে প্রখর আক্রমণাত্মক ব্যক্তিত্ব ভালমন্দ সবকিছুকে আত্মসাৎ করে জীবনাবেগ সৃষ্টি করতে পারে, মার্চেণ্ট সে জীবনোত্তাপে বঞ্চিত। ভারতীয় ক্রিকেটের অতবড় খেলোয়াড় হয়েও তিনি কোনো ধারা সৃষ্টি করতে পারেননি। তিনি 'টাইপ' 'স্কুল' নন; যদি এমনকি 'স্কুল' হন, 'ইনস্টিটিউশন' নন কোনো মতে। প্রথম শ্রেণীর রীতিমাফিক খেলোয়াড়ের একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা থেকে তাঁর ক্রীড়াজীবন শেষ হয়েছে।

মনে হতে পারে, মার্চেণ্ট কত বড় খেলোয়াড়, তার পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে আমি মার্চেণ্টের অযথা সমালোচনা করছি। সেকথা মোটেই সত্য নয়। আমি মার্চেণ্টের ব্যক্তিরূপকে দেখতে চাইছি, কারণ তাঁর ক্রীড়ারূপ তাঁর ব্যক্তিরূপের ভিন্ন প্রকাশ।

মার্চেণ্ট কত বড় খেলোয়াড়? এক কথায় তার উত্তর—ভারতে উৎপন্ন সমস্ত ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাটসম্যান হলেন বিজয় মার্চেণ্ট—সর্বকালে। সকল প্রকার উইকেটে সমনৈপুণ্যবিকাশে মার্চেণ্ট ভারতে অদ্বিতীয়।

আমি অত্যুক্তি করছি না। ব্যাটসম্যান হিসাবে মার্চেণ্টের সমতুল কে ভারতে,—সি কে নাইডু, দেওধর, উজির আলি, পালিয়া? কিংবা মুস্তাক, হাজারে, মানকদ? যাঁদের নাম করেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান। এঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এঁরা অতুলন। কিন্তু সর্বাত্মক ব্যাটসম্যান বলতে যা বোঝায়, এঁদের কোনো একজনকে কি সেই মহিমা অর্পণ করা যাবে? এঁদের যেমন প্রথম শ্রেণীর নৈপুণ্য, তেমনি অবস্থা-বিশেষে প্রথম শ্রেণীর ব্যর্থতা। বিজয় মার্চেণ্ট কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম ক্রীড়ামান রক্ষা করে গেছেন। একমাত্র বিজয় হাজারে এক্ষেত্রে মার্চেণ্টের পার্শ্ববর্তী। কিন্তু হাজারের উপরে আছে মার্চেণ্টের রাজকীয় মহনীয়তা, খেলায় মর্যাদা ও মাধুর্যের অসাধারণ সমন্বয়। উপযোগী হাজারের সঙ্গে অভিজাত মার্চেণ্টের প্রচুর প্রভেদ—যে প্রভেদটুকু স্বীকার করে বলে ক্রিকেট এখনো 'খেলার রাজা'।

মার্চেণ্টের খেলা দেখেছেন এমন বহু বিদেশী খেলোয়াড়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাদের অভিমতের স্বপক্ষতা করবে। তাঁরা একবাক্যে মার্চেণ্টকে ভারতের তো নিশ্চয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম খেলোয়াড়দের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে মার্চেণ্টের খেলা দেখে মিডলসেক্স-যমজের অন্যতম বিল এডরিচ বলেছেন,—"১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডের একেবারে ভিজে ক্রিকেট-মরশুমে তাঁর ২৩৮৫ রান (গড় ৭৪.৫৩) আর একবার প্রমাণ করল যে, তিনি পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তিনি একজন টিপিক্যাল ভারতীয় ব্যাটসম্যান—তৎপর, পরিচ্ছন্ন ও কিছু বিষণ্ণ, খেলেন বই মিলিয়ে নিখুঁতভাবে।" ১৯৪৫ সালে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে মার্চেণ্টের এক খেলা দেখে অন্য একজন বিখ্যাত বিদেশী খেলোয়াড়ের মন্তব্য,—"মার্চেণ্ট, যিনি ২০১ করে নট আউট রইলেন, যে খেলা দেখালেন, তাকে অনবদ্য ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অধিকাংশ ভারতীয় ব্যাটসম্যানের মতই তিনি কব্জির অসাধারণ শিল্পী এবং একই সঙ্গে আমার মতে তাঁর ফুট-ওয়ার্ক একমাত্র ডন ব্রাডম্যান ও ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের দ্বারাই অতিক্রান্ত হয়েছে। সে বাস্তবিক একটা অপূর্ব ব্যাপার।" এখানেই লেখকেরা থামেন নি, মার্চেণ্টকে ব্রাডম্যান, হ্যামণ্ড ও হেডলীর মত

বাছাই দলের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালে যখন মার্চেণ্ট অস্ট্রেলিয়া যেতে পারলেন না, তখন ব্রাডম্যান আক্ষেপ করে বলেছেন, হায়, মার্চেণ্টই আসতে পারলেন না!

মার্চেণ্ট সম্বন্ধে এই পর্যন্ত লেখার পরে এবার সহজে কলমের ডগায় এসে যাওয়া উচিত—তাঁর বড় বড় স্কোরগুলোর হিসেব—সেগুলো এতই আছে। পেণ্টাঙ্গুলারে হিন্দু দলের সেরা ব্যাটস্‌ম্যান, বোম্বাই রাজ্যের ক্রিকেট-পাল, ভারতের ভরসা এবং প্রথম উইকেটের সর্বদেশীয় শ্রেষ্ঠদের অন্যতমরূপে দেশেবিদেশে কীর্তিত বিজয় মার্চেণ্টের বড় স্কোরের হিসেব সংগ্রহ করা কিছু কঠিন নয়। জিনিসটা বলবার মত বটে। তবু সে কাজে আমার উৎসাহের অভাব। কেবল শোনা কথা নয়, আমি নিজেও ইডেন গার্ডেনে মার্চেণ্টের অন্যতম সেরা ইনিংস দেখেছি—১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে ১৫৫ রান। তবু মার্চেণ্টের খেলা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে পারছি না। মার্চেণ্টের খেলা নিয়ে বিহ্বল হওয়া যায় না। আমার ত্রুটি আমি স্বীকার করছি।

মার্চেণ্ট এখানেই বড় হয়ে উঠছেন। এইখানেই তিনি অবহেলাভরে মাড়িয়ে যাচ্ছেন ক্রিকেট-বিষয়ে আমাদের অযৌক্তিক ভাবালুতাকে। ভারতীয় দলের দুর্দশা দেখে মার্চেণ্ট ইদানীং ক্ষোভের সঙ্গে বারবার বলছেন—বিজয়ের দৃপ্ত ভাষাই হোক ভারতীয় দলের দান। মার্চেণ্ট সহ্য করতে পারছেন না নিয়মিত পানভোজন, হাত-ধরাধরি-কেক-কাটা ও অজস্র ক্যামেরার সামনে রাজা-রাণীর সঙ্গে করমর্দনের মহোৎসবকে। আর কতদিন ভারতীয় ক্রিকেট বিলেতি আতিথেয়তার পিঠচাপড়ানি সহ্য করবে? সে পিঠচাপড়ানিতেও আজ টান পড়েছে, প্রসাদগুণ হারিয়ে ইংরেজ সমালোচকেরা ভারতীয় ক্রিকেট-কাণ্ড বিষয়ে সত্যভাষণ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের কাব্যানুরুক্তির উৎসরূপে যদি বিজয় মার্চেণ্টের খেলাকে না পেয়ে থাকি—তবে জয় হোক মার্চেণ্টের। কিন্তু মার্চেণ্টের খেলা দেখে যদি কবিকণ্ঠ কলধ্বনি করে না ওঠে, তবে একথা কি সত্য নয় যে, নিশ্চয় কোনো ত্রুটি আছে আমাদের কাব্যবোধে? মার্চেণ্ট ক্লাসিক খেলোয়াড়,

ডেনিস কম্পটনের ভাষায় 'ক্লাসিয়েস্ট অব অল'। হবস, হাটনের মতই প্রথম উইকেটের বিশ্বখেলোয়াড়-পংক্তিতে তাঁর স্থান। ১৯৪৬ সালে তাঁকে হাটনের উপরেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। অপ্রমত্ত অপ্রগল্‌ভ সৃষ্টিসুষমা তাঁর খেলায় দেখেছি, দেখেছি সুনিশ্চিত নির্মাণ, সুগম্ভীর প্রত্যয়। এই মহৎ প্রত্যয়ে বিজয় মার্চেণ্ট ভারতে অদ্বিতীয়। এ মানুষ দলে থাকলে দলে থাকে চরিত্র। মার্চেণ্ট সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন, মার্চেণ্ট আটকে রাখেন বিপদের বন্যা, খুলে দেন সম্পদের ভাণ্ডার দুর্ভিক্ষের দিনে। ভারতের বেলায় মার্চেণ্টের ভূমিকা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় ব্রাডমানের ভূমিকার মতই। অথচ কি পার্থক্য—ব্রাডম্যান চরমার্থে ডায়ন্যামিক, মার্চেণ্ট চরমার্থে ক্লাসিক।

ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রয়োজন একজন বিজয় মার্চেণ্ট।

আমার জনৈক বন্ধু পূর্বে প্রকাশিত আমার লেখার কঠোর সমালোচনা করে বললেন, সাজিয়ে গুছিয়ে অযোগ্যের স্তুতি করা আমার বদ অভ্যাস। মুস্তাক, অমরনাথ—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় যাঁদের পর্যবসান—তাঁদের নিয়ে মাতামাতি না করে হাজারে, মার্চেণ্টকে নিয়ে লিখলে কাজ হোত। আমি স্বীকার করি মুস্তাক-অমরনাথের প্রশংসায় (নিন্দে কি কিছু করিনি?) আমার ভাবোদ্বেল স্বভাব কাজ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জানাতে বাধ্য, চঞ্চল সুন্দরের সম্বন্ধে আছে মানবহৃদয়ের সাধারণ দুর্বলতা—এমনকি শ্রীযুক্ত বিজয় মার্চেণ্টও তার ব্যতিক্রম নন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

মার্চেণ্ট ইদানীং ক্রিকেট সম্বন্ধে লিখছেন। ভারতবর্ষের ক্রিকেট-মাঠ প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রশংসা করেছেন ইডেন গার্ডেনের। ইডেন গার্ডেন মাঠ বিরাট নয়, সেখানে দর্শকদের আসন স্থানান্তরযোগ্য, ছোট প্যাভিলিয়ান, তাতে অপ্রচুর ব্যবস্থা, তবু ইডেন গার্ডেন ভারতবর্ষে অসামান্য, লর্ডসের মতই তাতে ক্রিকেটের গন্ধ, লর্ডসের চেয়েও সুন্দর তার পারিপার্শ্বিক। ভারতের শ্রেষ্ঠ মাঠ ইডেন গার্ডেন। মার্চেণ্টের এই লেখা আমাদের বিস্মিত করেছিল। আমরা জানতুম ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামের দুর্গাধিপতি শ্রীযুক্ত বিজয় মার্চেণ্ট ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ মাঠ বলবেন। স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম যে কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীতে

শ্রেষ্ঠ, একথা জানিয়ে গেছেন বিদেশীরাই। তার লকার রুম, অসংখ্য বাথ, সুইমিং পুল, স্কোয়াশ কোর্ট, খেলোয়াড়দের বসবার ব্যবস্থা এবং সব মিলিয়ে অসাধারণ বিলাস ঐশ্বর্যময় প্যাভিলিয়ান—এই ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম মার্চেন্টের স্বরাজ্য। এই মাঠটি মার্চেন্টের অপর রূপ। প্রভূত ব্যবস্থা ও অফুরন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ এই মাঠ প্রকাশ করেছে তার একাত্ম অধিনায়কের চরিত্রকে। তবু মার্চেন্ট ইডেন গার্ডেনের ভক্ত! এখানেই আছে দূরবর্তী সুন্দরের প্রতি মানুষের প্রলোভনের প্রমাণ। মাঠের মধ্যে ইডেন গার্ডেন, মারের মধ্যে লেটকাট—মার্চেন্ট স্বীকার করেছেন তিনি বেশী ভালবাসেন। ক্লাসিক রচনায় এ হোল রোমান্টিক আবেগ।

'সর্বাপেক্ষা ক্লাসিক' মার্চেন্ট যদি স্বয়ং দুর্বলতায় ধরা দেন আমাদের রোখে কে? আমার ব্যক্তিগত একটি অক্ষমণীয় পক্ষপাতের কথা বলে মার্চেন্ট-প্রসঙ্গ শেষ করব। ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে মার্চেন্ট একটি শ্রেষ্ঠ ইনিংস খেলেছিলেন। ১২৮ রানের তাঁর সেই ইনিংস সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—"এই ইনিংস আঙ্গিক ও মেজাজগত সামর্থ্যের মিশ্রণে অসাধারণ, সর্বপ্রকার মারের দ্বারা সুসমৃদ্ধ। হবস ও হেনড্রেনের মত (আর বেশী কেউ নন) সর্বশ্রেণীর বোলারের বিরোধিতা করবার অধিকারী তিনি। প্রাচ্যের শিথিল সৌন্দর্যের অভাব থাকলেও তাঁর মারগুলিতে অদ্ভুত সুকুমারতা আছে এবং তিনি তাঁর ড্রাইভের মধ্যে যে জোরটুকু সংযোগ করে দেন, তা তাঁর সহযোগীরা অনুকরণ করলে ভাল করবেন। এই সফরে তাঁর রেকর্ড রীতিমত উল্লেখযোগ্য এবং একথা বলতেই হবে তাঁর মহিমার ভিত্তি কোনোমতে সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল নয়।"

যে ইনিংসটি এই কথাগুলি আদায় করেছে, সেই ইনিংসের সমাপ্তি হয়েছিল অতি বিচিত্রভাবে। তার বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক: "মার্চেন্ট এখন চলমান। লাফ দিয়ে উইকেট ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভ করলেন। অনবদ্য কতকগুলি মার মেরে দর্শকদের চমৎকার ফিল্ডিং দেখার সুযোগ করে দিলেন। তাঁর নিজস্ব রান দ্রুত বাড়তে লাগল। ভারতের বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। এমন সময় যেভাবে মার্চেন্টের বিদায় ঘটল—ক্রিকেটের ইতিহাসে তা বোধহয় বিচিত্রতম ব্যাপার। সহযোগী মানকদ

কম্পটনের পাশ দিয়ে সর্ট লেগে একটা বল ঠেলে দিলেন এবং মার্চেন্ট, খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, ধীরে-সুস্থে ক্রীজের দিকে ফিরতে লাগলেন। কম্পটন তিন চারটি দ্রুত পদক্ষেপ করে তাঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে-যাওয়া বলটির কাছে পৌঁছলেন এবং পা বাড়িয়ে বলে সোজা এক কিক লাগালেন মার্চেন্টের উইকেটের দিকে।

"এমন নাটকীয় ঘটনা হয় না। সাধারণ দর্শকে রান আউট হওয়ার গোটা ছবিটা চোখের সামনে দেখতে পায়। অন্ততঃ ক্রীজের দিকে ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট বাড়িয়ে দিয়েছে তখন সে রান-আউট হতে পারে কি পারে না, সে বিষয়ে দর্শকদের মনে একটা ধারণা থাকে। এক্ষেত্রে মার্চেন্টের বিপদ ঘটতে পারে বলে কারুরই মনে হয়নি ঘুণাক্ষরে। দু পা গেলেই মার্চেন্ট যেখানে ক্রীজে পৌঁছে যান, সেখানে কম্পটনের পক্ষে বল কুড়িয়ে উইকেটে ছুঁড়তে নিশ্চয় কয়েক মুহূর্ত লাগবে। কিন্তু ফুটবলারের পা ছুটে গেল সংস্কারবশে এবং তা নিখুঁত ভঙ্গিতে ক্রিকেটের সবচেয়ে আশ্বর্যজনক আউটটিকে সম্ভব করল। ভাগ্য ও প্রেরণার অলৌকিক মিশ্রণ এ জিনিস। হায়, তবু অতি উৎসাহী জনৈক ব্যক্তি বেদনাদায়ক নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে লিখতে পেরেছিল—এটা ক্রিকেট নয়!"

মার্চেন্ট অদ্ভুত ইনিংস খেলেছিলেন। আপনারা আমাকে যতই গাল দিন, তবু আমি বলব, মার্চেন্টের সেই খেলা থেকে তাঁর আউট হওয়াকেই ভালবেসেছি দূর থেকে। অমন একটা আউট নিয়ে কবিতা লেখা যায়। সম্ভ্রান্ত ঘটনার চেয়ে চমকপ্রদ অঘটনের প্রতি আমার এ এক অমার্জনীয় পক্ষপাত।

হাজারো সঞ্চয়

(বিজয় হাজারে)

ভারতের দুই বিজয়—মার্চেন্ট ও হাজারে একসঙ্গে মনে আসেন। চোখের সামনে দেখতে পাই একটা ছবি ঃ ইংলণ্ডের কোনো বিখ্যাত ক্রিকেট শিক্ষাগারের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছেন 'ভারতের ইংরেজ' (নেভিল

কার্ডাসের স্মরণীয় উক্তি অনুযায়ী) বিজয় মার্চেন্ট, গলায় ঝুলছে সেরা ছাত্রের পদক, আর তাঁর পিছনে আছেন সেই বিদ্যালয়েরই আরো একজন ছাত্র, কৃতী ছাত্রই, বিজয় হাজারে, যাঁর প্রথম জীবন কিন্তু কেটেছে পাঠশালার কড়া শাসনে। খেলার জগতে মার্চেণ্ট ষোল আনার উপর আঠারো আনা অভিজাত, হাজারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি।

আমি নিশ্চয় রেকর্ড-বুকের হিসেব নিয়ে হাজারেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি বলছি না, কারণ রেকর্ডে মার্চেন্টের পশ্চাদ্বর্তী নন তিনি। আমি বলছি খেলার রূপরীতির বিচার করে। খেলার স্টাইলে মার্চেন্টের আভিজাত্য সহজাত, হাজারের মধ্যে কৃচ্ছ্রসঞ্চয়। হাজারের খেলায় আত্মনিগ্রহের ছাপ যথেষ্ট। তাঁর সঞ্চয়ে আছে মিতব্যয়ীর সাবধানতা।

হাজারেকে একদিন ক্রিকেটাররূপে সবচেয়ে অপছন্দ করেছি। ভালবাসিনি মোটে। অথচ ভারতীয় ক্রিকেটের কী না সেবা করেছেন এই মানুষটি। তাঁর দৃঢ়তার মূল্য ধিকৃত হয়েছে আমাদের অপরিণামদর্শী লোভের কাছে। প্রয়োজনের বেদীতে বারবার হাজারে বলি দিয়েছেন সৌন্দর্যকে—এতে তাঁর থেকে দুঃখিত কে ?

হাজারের বিরুদ্ধে মানসিক বিরূপতার একটা কারণ, হাজারে মা'. প্রতিদ্বন্দ্বী। কথাটা সুন্দর নয়, বলতে লজ্জা, তবু সত্য বলাই ভাল,—পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেটে হিন্দু দলের চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় মার্চেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভাল লাগা সম্ভব ছিল না সে বয়সে।

পেণ্টাঙ্গুলার উঠে গেছে। আমি বিশ্বাস করি ভালই হয়েছে।

হাজারে নীরস নিঃসন্দেহে। ঝক্কি নিয়ে যাঁকে চলতে হয়, পপুলার হওয়ার ফ্যাসান তাঁর পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব নয়। হাজারে ব্যাটিং-এ নীরস এবং নীরব। মুস্তাক আলীর মুখরতা, সি এস নাইডুর কোলাহল, সি কে-র অট্টহাস্য, অমরনাথের রণধ্বনি কিংবা মার্চেন্টের বিদগ্ধ বচন আনা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। মানকদের স্বচ্ছন্দ আলাপ কিংবা অধিকারীর সংযত বাক্‌পটুত্বও পাইনি তাঁর কাছ থেকে। হাজারের সুবিখ্যাত কভার ড্রাইভের ড্রাইভটুকু মন থেকে ধুয়ে মুছে যায় এত সময়ের ব্যবধানে তারা হাজির হয়। তবু চওড়া ব্যাটে ও চওড়া বুকে সকল আঘাত সহ্য করবার

মত একজন মানুষ ছিল ভারতীয় ক্রিকেটে। অপরিণতির স্বাধীনতাটুকু খেলার মাধুর্য। অকালপরিণতির বিজ্ঞ অভিভাবকত্ব হাজারের জীবনের ট্রাজেডি।

তবু হাজারে কি হতে পারতেন—থাক সে কথা। একদিন হাজারের খেলা দেখে মিলার ও হুইটিংটন লিখেছিলেন,—'আর্চি জ্যাকসনের মতই লাবণ্যময়।' আর্চি জ্যাকসন অকালে দেহত্যাগ করেছেন। তরুণ ব্রাডম্যান একদিন তরুণ জ্যাকসনের কফিন কবরে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট-রসিকদের অভিমত ছিল, বাহকের চেয়ে বাহিতের ক্রীড়াচ্ছন্দের সুষমা কম তো নয়ই, হয়ত বেশীই ছিল। সেই আর্চির স্মৃতি অস্ট্রেলিয়ানদের মনে হাজারে জাগিয়েছিলেন। এই সেদিনও নিতান্ত পরিণত বয়সে সি এ বি সিলভার জুবিলী দলের খেলায় হাজারে দেখিয়ে দিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে কেমন মারের ছররা ও হররা ছড়িয়ে দিতে পারেন চতুর্দিকে। অবশ্য পাঠক এইখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে পারেন, যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হয়ে লড়াই করেছেন, এমন অংশও তো মহাভারতে আছে। সুতরাং থাক সে কথা।

ক্রিকেট-রসিক মহলে রেকর্ডবুকের বড় বদনাম। সে গ্রন্থে লেখা থাকে না অনেক কিছু, তার মধ্যে একটা হোল—খেলার রঙ। কালো কালি সব রঙ শুষে নিকষ রেখায় গুটি কয় ব্যবসায়িক কথা লিখে রাখে—কে কত রান করল, কে কটা উইকেট পেল, এমনি সব। তাই যদি এখনি বলি, হাজারের মহিমা বুঝতে রেকর্ড-বইয়ের পাতা ওল্টানো দরকার. সন্দেহ করতে পারেন পাঠক, হাজারেকে অপমান করার ও এক কূটকৌশল। তা কেন হবে? একই গজকাঠিতে সব লোককে একভাবে মাপব কেন? না, রেকর্ডবুক হাজারের জীবনগ্রন্থ একথা মহৎভাবে সত্য—অনেক পরিশ্রম ও প্রতিভায় তিলে তিলে গ্রন্থটিকে তিনি রচনা করেছেন। সে গ্রন্থ ভারতের ক্রিকেট-গ্রন্থাগারের মহামূল্য সংযোজন। চপলচিত্তের তাকে ভাল না লাগতে পারে, তাতে বিরূপ কিছু প্রমাণ হয় না। স্কলারসিপের বদলে অনেকে রম্য রচনার নিত্যপ্রেমিক। সেই রসশিশুদের বিজয় হাজারেকে নিশ্চয় নমস্কার করে বিদায় দেবেন।

১৯৫৭-৫৮ সালের একটি ক্রিকেটপঞ্জী থেকে হাজারের রেকর্ড উদ্ধৃত করছি,—

"বিজয় এস হাজারে, ১১-৩-১৫ সালে পুনায় জন্ম। চৌকশ খেলোয়াড়, ডান হাতের ব্যাটসম্যান। অনর্গল রান-কারী ভারতের তুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনি একজন ; ব্যাটসম্যানরূপে অবিশ্বাস্য মনঃসংযোগ এবং অদ্ভুত আত্মরক্ষাশক্তির অধিকারী, অথচ বহু প্রকার মারে পারদর্শী—ড্রাইভ তার মধ্যে মুখ্য। ডান হাতের বোলার...... ।"

অতঃপর হাজারে কোথা থেকে সুরু করেছেন, কোন্ কোন্ দলে খেলেছেন, তার বিবরণের পরে ক্রিকেটপঞ্জী জানাচ্ছে ঃ—

তাঁর অনেক রেকর্ড আছে। কয়েকটি হোল--

(১) তিনি টেস্ট ম্যাচে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন, এমন একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় (১৯৪৭-৪৮ সালে এডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৬ ও ১৪৫ রান) ;

(২) তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের সর্বোচ্চ জুটি-রানের বিশ্বরেকর্ডের অন্যতম অংশী খেলোয়াড় (১৯৪৬-৪৭ সালে বরোদা বনাম হোলকারের খেলায় বরোদার পক্ষে গুল মহম্মদের সহযোগিতায় ৫৭৭ রান) ;

(৩) তিনি বিদেশ সফরে ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেছেন (১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে ২৪৪ নট আউট) ;

(৪) তিনি একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি তুবার ত্রিশতাধিক রান করেছেন ;

(৫) তিনি যে কোনো ভারতীয় অপেক্ষা টেস্টে অধিক রান করেছেন (২১৯২—গড় ৪৭.৬৫) ;

(৬) তিনি রনজি ট্রফিতে যে কোনো খেলোয়াড় অপেক্ষা অধিক রান করছেন (৫৫৩৫) এবং উইকেট নিয়েছেন (২৫৬) ;

(৭) তিনি যে কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় অপেক্ষা টেস্টে সর্বোচ্চ সংখ্যায় তিন সংখ্যার ইনিংস খেলেছেন ;

(৮) তিনি যে কোনো ভারতায় খেলোয়াড় অপেক্ষা রনজি ট্রফিতে সর্বোচ্চ সংখ্যায় তিন সংখ্যার ইনিংস খেলেছেন ;

(৯) তিনি যে সকল দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছেন, প্রতি দেশের বিরুদ্ধেই সেঞ্চুরী করেছেন ;—

এতেও যদি আপনারা সন্তুষ্ট না হন—

"প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৪,৮৬০ রান (গড় ৫৬·২১) করেছেন ; তার মধ্যে রনজি ট্রফিতে ৫৫৩৫ (গড় ৭১·৮৮), টেস্ট ক্রিকেটে ২১৯২ (গড় ৪৭·৬৫), বেসরকারী টেস্টে ১৬৭৪ (গড় ৫৪·০০), বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলারে ১২১২ (গড় ১০১), সফরকারী দলের বিরুদ্ধে সরকারী বা বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ ভিন্ন অন্য খেলায় ৭৯৬ (গড় ৩৯·৮০), ১৯৪৬ ইংলণ্ড সফরে টেস্ট ভিন্ন অন্য খেলায় ১২২১ (গড় ৫৫·৫০) ১৯৪৭-৪৮ অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট ম্যাচ ভিন্ন অন্য খেলায় ৬২৭ (গড় ৪৮·২৩—সমস্ত খেলায় হাজার রান পূর্ণকারী), ১৯৫২ ইংলণ্ড সফরে টেস্ট ভিন্ন অন্য খেলায় ৭৪৪ (গড় ২৫·৬৫ ; সমস্ত খেলায় হাজার রান সংগ্রহকারী), ১৯৫২-৫৩ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে টেস্ট ভিন্ন অন্য খেলায় ২৩৩ (গড় ৫৮-২৫) রান করেছেন। দুটি ত্রিশতাধিক রান ছাড়া তাঁর সংগ্রহে আছে তিনটি ডবল সেঞ্চুরী ও ৩৬টি সেঞ্চুরী।"

দম বন্ধ হয়ে আসছে—বাপরে !

পঞ্জীকার এতেও থামেননি, আরো তথ্য বর্ণনা করে গেছেন, কিন্তু সবগুলো জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু কিছু রেকর্ড পরে ভেঙেছে, কারণ ক্রিকেট-রেকর্ড নশ্বর, কিন্তু আমরা স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি—এ সব জিনিস তিনি একলা করেছেন – সেই নিরহঙ্কার নিভৃতস্বভাব লাজুক মানুষটি ? প্রধান ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে সহনশীল গোপনস্বভাব মানুষ তিনি। ক্রিকেট-পৃথিবীতে মহৈশ্বর্যে নম্র এবং সম্পদে ভীত এক শান্ত মহিমার নাম বিজয় হাজারে।

হাজারে কত বড় খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যান তা লিখেছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে হাজারে অস্ট্রেলিয়ায় মিলার-লিণ্ডওয়ালের গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে উভয় ইনিংসে শতাধিক রান করেছিলেন, যা এ পর্যন্ত একমাত্র পেরেছেন ডেনিস কম্পটন, একালের ক্রিকেট-জিনিয়াস। হাজারের খেলা দেখে ব্রাডম্যান মন্তব্য করেছেন :

"যখন আমরা প্রথম টেস্টের জন্য সমবেত হলাম, আমার স্বদেশীয় জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাটসম্যানরূপে হাজারে ও অমরনাথের আপেক্ষিক সামর্থ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল। অধিনায়ক (অমরনাথ) দু'একটি স্টেট ম্যাচে অপূর্ব খেলেছিলেন, কিন্তু আমি হাজারের নির্ভরশীলতা এবং নির্ভুল মারের শক্তিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। এ ব্যাপারে আমার গোঁড়া হবার কোনো ইচ্ছা নেই, আমি কেবল হাজারের নৈপুণ্য এবং মহান খেলোয়াড়ের সমশ্রেণীভুক্ত হবার ন্যায্য যোগ্যতা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

"অমরনাথকে আমরা চমকপ্রদ রানকারীরূপে জানি এবং যাঁরা সফরের গোড়ার দিকে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে অমরনাথের ইনিংস দেখেছেন তাঁরা খেলাটিকে মেলবোর্ন ক্রিকেট-মাঠের সর্বসময়ের সর্বোত্তম খেলার অন্যতম বলে মনে করে থাকেন।

"টেস্ট ম্যাচে কিন্তু অমরনাথ হাজারের দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন। হয়ত অধিনায়কের দায়িত্ব অমরনাথের পক্ষে গুরুভার হয়েছিল। তা হোক বা না হোক, সত্য কথা বলাই ভাল, অমরনাথ নিজের দৃষ্টিশক্তি এবং স্বাভাবিক সামর্থ্যের উপর এতবেশী নির্ভর করেছিলেন যে, ব্রেক-এর বিরুদ্ধে পেটানো বা এই জাতীয় আরো অসংখ্য ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি। এই জিনিস অজস্রবার তাঁর পতন ঘটিয়েছে।

"সে বিলাসিতার প্রশ্রয় হাজারে দেননি। হাজারের প্রধান দুর্বলতা হোল, আক্রমণাত্মক মনোভাবের অভাব, যার জন্য তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপক্ষের বোলিংকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারেননি। অথচ তা না করলে খেলাজেতা ব্যাটসম্যান হওয়া যায় না।"

রেকর্ড-বুকের শ্বাসরোধী বস্তুসমাবেশ এবং ব্রাডম্যানের উন্মুক্ত প্রশংসার পরে হাজারের মহিমা বিষয়ে আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন আছে মনে হয় না। সাধারণ বাঙালী দর্শকরূপে আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত হাজারের কাছে। দিনের পর দিন হাজারের দীর্ঘ ইনিংস দেখেছি কলকাতায়, আর কিভাবে না সেই সুদৃঢ় খেলার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছি। সেই

বিদ্রূপগুলি ফিরে এসে বিঁধছে আমাদের—শূন্য রানের বিলেতী প্রদর্শনী-ক্ষেত্র থেকে। হাজারে ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক শূন্যকে পূর্ণ করেছেন, অনেক ভগ্নকে করেছেন উত্তোলন। কিন্তু দুঃখ এই হাজারের সেবার মূল্য যথাযোগ্যভাবে স্বীকৃত হল না জনমানসে। হাজারে হীরো নন। বোধ হয় হীরো তাঁরাই হন, যাঁরা অসম্ভবের পিছনে তাড়া করে সেটা যে অসম্ভব তা প্রমাণ করে দেন। কিন্তু সুনিশ্চিত সাধনায় সম্ভবপরের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেন তাঁরা বরমাল্য পান না 'চাটুলুব্ধ জনতাদেবীর'। সংবাদপত্রে দেখেছি বিজয় মার্চেন্ট তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বীর' ভারতীয় দলে স্থান পাবার পক্ষে লেখনী চালনা করেছেন। তাতে মার্চেন্টের উদারতা ও মুক্তদৃষ্টি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি করুণ! তাহলে হাজারের স্থানলাভের জন্য ওকালতির প্রয়োজন হয়! ওকালতি করেন তিনি রেকর্ড ভাঙাভাঙির লড়ায়ে যিনি ছিলেন একদা-'শত্রু'! মার্চেন্ট ভাগ্যবান, উপযুক্ত সময়ে অবসর নিতে পেরেছেন, হাজারের দুর্ভাগ্য—ক্ষমতার শিখর থেকে তিনি স্বেচ্ছাবিদায় নেননি। সেই তো সুন্দর অবসান, যখন অবসানের জন্য লোকে কাঁদে। হঠাৎ সরে গিয়ে হাজারে কেন নিজের যোগ্যতা যাচাই করে নিলেন না? অন্তত বোর্ড-সভাপতির একখানা মিনতিপত্র পেতেন। হাজারে কেন ক্রিকেটকে অযথা আঁকড়ে আছেন? সে কি তিনি বিশ্বাস করেন ক্রিকেট খেলে দেশের সেবা করবেন, কিংবা তাঁর আরো রেকর্ডের দরকার আছে, কিংবা—টাকার দরকার? মার্চেন্ট জানিয়েছেন একটি ঘটনা। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন, প্রতিনিধিমূলক খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের পত্নীদের সুযোগ দেওয়া হোক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় খেলা দেখবার—কর্তৃপক্ষের খরচে। একটি করুণ কণ্ঠ মার্চেন্টের আবেদনের পিছনে ছিল। কোনো এক সময় মার্চেন্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রীমতী হাজারেকে—তিনি স্বামীর খেলা দেখতে যাচ্ছেন কি না? শ্রীমতী হাজারে বলেছিলেন—মিঃ মার্চেন্ট, বড় খরচ।

মার্চেন্টের সঙ্গে হাজারের তফাৎ এইখানে—মার্চেন্ট ধনী, কিন্তু হাজারে তা নন। সময়মত মার্চেন্ট অহঙ্কার বজায় রেখে সরে যেতে পারেন, হাজারে

তা পারেন না। ক্রিকেটের বিশ্বস্ততম সেবক হয়েও হাজারে তাই উচ্ছল প্রশংসা পেলেন না। তাঁর সামর্থ্য নিয়ে আমরা চর্বিত বিচার করি। অথচ হাজারে কি করেননি—দিনের পর দিন দেখেছি বিষাক্ততম বোলিং-এর বিরুদ্ধে তাঁর অবিচলিত নিপুণতা। আহত সর্পের মত বলগুলো ফণা বাড়িয়ে ছোবল দিতে চাইছে উইকেটে, আর অদ্ভুত সহজ কৌশলে পা এবং হাত বাড়িয়ে ফণার মুখে হাজারে পেতে দিচ্ছেন ব্যাটের ব্লেডটিকে। বিষের 'লাল' দাগ ফুটে উঠছে ব্যাটের কাষ্ঠদেহে, কিন্তু উইকেট অক্ষত। হাজারের খেলা দেখে কতবার মনে হয়েছে কি আশ্চর্য যোদ্ধা, তরবারি ফেলে দিয়ে যেন শুধু ঢাল নিয়ে বিপক্ষের তরবারির আঘাত প্রতিহত করার কৌতুককর খেলায় মত্ত। তরবারির ফলক ঝিলিক দিয়ে এগিয়ে আসে দেহস্পর্শের জন্য, তার আগে পেয়ে যায় ঢালের নির্বিকার প্রতিরোধকে। তারপর এক সময় দেখি কখন যেন যোদ্ধা কুড়িয়ে নিয়েছেন তাঁর তলোয়ার, তার আঘাতে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে বিপক্ষের অস্ত্র। হাজারের ড্রাইভগুলো চোখ ধাঁধিয়ে ছুটে যাচ্ছে বাউণ্ডারীর সীমানায়। তারপর আবার তিনি শান্ত হয়ে গেলেন, আঘাত ভুলে গেলেন,—চলল বিপক্ষের আক্রমণের নবোদ্যম এবং এ পক্ষের সুশান্ত আত্মরক্ষা।

সত্যই এমন চরিত্র জনপ্রিয় হয় না। লোকলোচনে আসনসংগ্রহের গূঢ়কৌশল হাজারের অনায়ত্ত। হাজারে যেন বড় অন্যমনস্ক। খেলার মধ্যে সতর্ক মনে খেলা ছাড়াও যেসব নানা তরঙ্গ আঘাত করে যায় এবং আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তা চঞ্চল হয়ে ওঠে—হাজারে সে মনের অধিকারী নন। এতে কিন্তু খেলার এবং জীবনের অনেক সৌন্দর্য প্রত্যাখ্যাত হয়। একটি 'দুর্ঘটনার' উল্লেখ করতে পারি এ প্রসঙ্গে, যার সচেতন দায়িত্ব হাজারের নয়, কিন্তু দোষভাগ তাঁকে নিতেই হবে। ১৯৫১ সালে ইংলণ্ড-ভারত টেস্ট ম্যাচ—ইভান্স মার মার করে খেলছেন। মারের এমন বহর যে, লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরী হয়ে এলো। সামান্য কয়েক রান বাকি। সমস্ত দর্শক, খেলোয়াড়, বিশেষভাবে ইংরেজ খেলোয়াড়রা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে লাঞ্চের আগে ইভান্সের সেঞ্চুরী দেখার জন্য। এ গৌরব ইতিপূর্বে অন্য কোনো ইংরেজ খেলোয়াড় অর্জন করতে পারেননি। যাঁরা

পেরেছেন, সে তিনজনই অস্ট্রেলিয়ান—ট্রাম্পার, ম্যাকার্টনি ও ব্রাডম্যান। আজ ইংলণ্ডের ক্ষোভ দূর হবে—সকলে প্রবল উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করে থাকে। মাঠের সবাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন, কেবল একজন ছাড়া—তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বিষয়ে তাঁর খেয়াল নেই। ইভান্সের ৯৮ রানের মাথায় লাঞ্চের ঠিক আগে তিনি ধীরে সুস্থে বোলারের সঙ্গে ফিল্ডিং সাজানো বিষয়ে পরামর্শ করতে শুরু করলেন। প্রতিটি দর্শক ও খেলোয়াড়ের আবেগ, উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভের উপর দিয়ে মূল্যবান মুহূর্তগুলি কেটে গেল। ইভান্স ৯৮ রান করে লাঞ্চের আগে নট আউট রইলেন।

ভেবে দেখুন এমন ক্ষেত্রে অমরনাথ কি করতেন! অমরনাথের চালাকি ও মহত্ত্বের ভঙ্গিমায় কিভাবে না খেলার মাঠ ঝলমল করে উঠত! ইভান্সকে সেঞ্চুরীতে বঞ্চিত করবার সর্বপ্রকার চক্রান্ত অনেক আগে থেকে চলত, কিন্তু যদি তা সত্ত্বেও ইভান্স ৯৮ রানে পৌঁছে যেতেন তাহলে নিজে হাতে বল নিয়ে লেগে একটি ফুলটস—নিশ্চয়ই। তারপর এগিয়ে গিয়ে করমর্দন, চাইকি খেলোয়াড়দের জুটিয়ে থ্রি চিয়ার্স। এবং আরো কত কি, যা একমাত্র অমরনাথীয় উদ্ভাবন। তেমন এক ক্ষেত্রে হাজারের অন্যমনস্কতা ইভান্সকে তাঁর জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত করল এবং নিজেকে ঠেলে দিল অনুদারতার অভিযোগের সামনে।

অথচ ভদ্রস্বভাবের কেউ সত্যই মনে করেন না, হাজারে ইচ্ছে করে ইভান্সকে রেকর্ড করতে দেননি। হাজারে এমনই সুশীল ও সভ্য যে, তাঁর পরিচিত কেউ তাঁর পক্ষে ও আচরণ ইচ্ছাকৃত বিশ্বাস করেন না। তবু দায়িত্ব হাজারেরই।

এইখানেই দেখতে পাচ্ছি হাজারের জীবনের ব্যর্থতা। তাঁর মত পরিশ্রমী গুণী মানুষ ক্রিকেটের সাম্রাজ্যধিকারী হতে পারেন, কিন্তু তিনি হয়ে রইলেন মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের সাহায্যকারী উপেক্ষিত অর্থশালী বণিক। তিনি আমাদের ক্রিকেটের কতখানি—আমার সামান্য একটি কথা মনে পড়ছে। হাজারে ব্যাট করতে নামছেন ইডেন গার্ডেনে। আমার এক বন্ধু আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে অলস বিরক্তিতে বললেন—এবার ঘুমিয়ে

নেওয়া যাক। একটি বৃদ্ধ বসেছিলেন সামনে। পিছন ফিরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, মশাই, হাজারে আউট হয়ে গেলে ঘুম ভেঙে দেখবেন ঘরে আগুন লেগে গেছে। হাজারে তখনি আউট হয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখলুম, আমার বন্ধু শিউরে ওঠছেন।

উদ্‌ভ্রান্তমূর্তি শিল্পী

(রুসী মোদী)

দীর্ঘ শীর্ণ কেশবিরল মোদী। পার্শীসুলভ লম্বা নাক, টকটকে রঙ। আমি যখন দেখেছি, তখন কেমন একটা অসুস্থ গ্রন্থিশিথিল চেহারা। এই মোদীই ভারতের পক্ষে রান-নির্ঝরের অন্যতম প্রধান উৎস বিশ্বাস হতেই চায়নি।

মোদী ব্যাট করতে নেমে সারাক্ষণ অস্বস্থ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে কাটালেন। নিজের উপর আস্থাহীনতা ফুটে উঠল ভাবে-ভঙ্গিতে। কেমন একটা এলোমেলো অসহায়তা। দশবার টুপি প্যাণ্ট ঠিক করা, বারংবার টুক্‌টুক্‌ করে পিচে ব্যাট-ঠোকা, স্ট্যান্স নেবার পরেও আবার ব্যাট দিয়ে নার্ভাসভাবে মাটি চাপড়ানো, একবার তলায়, একবার উপরে, একবার সামনে মুখ ওঠানো—নামানো—নাড়ানো,—এই মোদী,—ভারতের অন্যতম শক্তিস্তম্ভ! এ ছাড়া মোদীর জঘন্য ফিল্ডিং তো আছেই,—'ভালো মানুষের পুত্রতুল্য' লুকিয়ে ভীরু হাতে আমগাছে ইঁট ছোঁড়ার মত বল ছোঁড়া। এবং ক্যাচ ফসকানো। এই মোদী!

আমি বলছি ১৯৪৮-৪৯ সালের কথা। ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে মোদীকে দেখে ইংরেজ লেখকেরও একই কথা,—

"………মোদী সব সময় হাবুডুবু খেতে লাগলেন, অথচ বেঁচেও রইলেন অলৌকিকভাবে।

"………এ পর্যন্ত মোদী দু'ঘণ্টার উপর খেলে ২৫ রান করেছেন। ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন সর্বক্ষণ। মিস্‌টাইমিং করবেনই—মুহূর্তের ভগ্নাংশপূর্বে

ব্যাট চালাবেনই তিনি। মোদীর মজ্জাগত তা। বার ছয়েক ইতিমধ্যে আউট হতে পারতেন, কিন্তু আনাড়ী ড্রাইভারের মতই মরতে মরতে বেঁচে রইলেন। এইবার স্থির করলেন আক্রমণ করতে হবে। মনে হোল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ব্যক্তি[illegible]জ অধিকার করেছে।"

*

"·········মোদী স্পিন বলে আরো বেশী স্বস্তিহীন। কেবল তাঁর টিকে থাকার ক্ষমতা এবং ধারাবাহিক ভাগ্য তাঁকে রান করতে সাহায্য করেছে, যদিও উইকেটে অবস্থান যথেষ্টই দুঃখজনক ছিল।"

*

"মোদী এসেই প্রায় আউট, যা তাঁর স্বভাব।·········

"·········মোদীকে ছেড়ে দেওয়া যায়। স্পিন বলের সামনে যেন ঘুমের ঝোঁকে নড়েন-চড়েন। উদ্যমহীন সিদ্ধান্তহীন প্রয়াস।·········

"······এই মরশুমে ইংলণ্ডের মাঠে মোদীর মত নিত্য-পরাজিত ক্রিকেটার আর কেউ নেই। আউটের আগে মোদী অন্ততঃ দশবার আউট হয়েছেন। তবু লেগে আছেন।"

কিন্তু যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মোদীকে দেখি, সেই অনবদ্য অতুলনীয় রূপকে। তখন রাত্রে ছিল নিষ্প্রদীপ, দিনে রানের ফুলঝুরি। মার্চেণ্ট-মোদী-মানকদ-মুস্তাক-হাজারে। ডবল সেঞ্চুরীগুলো মার্চেণ্ট-মোদী-হাজারেরা লোভীর মত লুঠ করেছেন। সৌন্দর্যের দস্যুদের সেই সব কাণ্ড দেখে দর্শকদের মাতামাতির শেষ ছিল না। হতাশ কৌতুকে কিথ মিলার তেমন একটি মোদী-দ্বিশতাধিকের বর্ণনা করেছেন। ১৯৪৫ সালের ব্যাপার।—

"মাদ্রাজ 'টেস্টে' রুসী মোদী ডবল সেঞ্চুরী করলেন। ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০,—এইসব সময়ে ভাবোন্মাদ দর্শক সমস্ত দিক থেকে ছুটে এসে মাঠের মধ্যে মালা দিল মোদীকে। ঘড়ি, লেবু, পদক এবং অনুরোধ: মোদী যেন অমরনাথের মতন উইকেট ছুঁড়ে ফেলে না দেন। খেলা শেষে বুঝতে পারলুম না আমরা ক্রিকেটার না মালাকর।"

এরও বছর দেড়েক আগেকার একটি খেলার বর্ণনা করেছেন সুবিখ্যাত ডেনিস কম্পটন। কম্পটন ইউরোপীয়ান দলে খেলছেন। ইউরোপীয়েরা করল ৩০০। ভারতীয়রা ৪০ রানের মধ্যে ছুটো উইকেট হারালো।—

"তারপর রুসী মোদী, যাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলুম, উইকেটে এলেন এবং আমরা পেলুম অনবদ্য ব্যাটিং-এর প্রদর্শনী। দশ রানের মধ্যে ছু'বার চান্স দিয়ে মোদী পরে যে ২১৫ করলেন, তার মধ্যে ভুলের চিহ্নমাত্র ছিল না।

"মোদী আমার মতে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হতে যাচ্ছেন। শকুনের মত তাঁর একজোড়া চোখ। তাঁর বিরুদ্ধে বোলিং-এর সময় লক্ষ্য করলুম, সকল শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের মতই তিনি অনড়ভাবে বলের প্রতীক্ষা করেন না। চমৎকার পদক্ষেপ, অভ্রান্ত লক্ষ্য। সর্বোপরি তিনি প্রত্যেক মারের পিছনে শরীরের পূর্ণভার নিয়োজিত করেন। ফলে ডজনে ডজনে বাউণ্ডারী পান।

"যে কোনো ক্রিকেটার উইকেটের সর্ব দিকে মোদীর আত্মবিশ্বাসপূর্ণ মার দেখে অনেক কিছু শিখতে পারেন।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে পারি, এ মোদী কোন্ মোদী? আমার দেখা ১৯৪৮-৪৯ সালের মোদী ইনি নন, অনারেবল প্রিটির দেখা ১৯৪৬ সালের মোদীও হতে পারেন না। মোদীর এত পরিবর্তন? নিশ্চয়। কম্পটনকে অবিশ্বাস করতে বললে আপনারা আমার ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত হবেন। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করলে আপনারা এ লেখা আর পড়বেন না। তবে?

মোদীর পরিবর্তনের কারণ নিয়ে গবেষণার ভার ক্রিকেট-ঐতিহাসিকের উপর থাক। আমি সাধারণ দর্শক। আমি যে-মোদীকে দেখেছি, তাঁর কথাই বলি। দেখতে পাচ্ছি রান নিতে সুরু করেছেন বোলার, মোদীর ব্যাটধরাই এখনো শেষ হয়নি। তারপর বোলারের হাত থেকে বল বেরিয়ে এসে ব্যাটে পড়ার মধ্যে মোদী কী একটা করে দিলেন, ছুটোপাটি তাড়া-হুড়ো করে নয়,—যেন নিজের উপর বিরক্ত হয়ে, নাতিব্যস্ত ভঙ্গিতেই,—

অদ্ভুত! বলগুলো নানাদিকে ছুটতে লাগল বিদ্যুৎবেগে। আমি অনেক ভাবে দেখেও ঠিক করতে পারলুম না মোদীর ঐ শিথিল নড়াচড়ার মধ্যে কোথায় শক্তির বেগ লুকিয়ে ছিল, যার ফলে বলগুলোর অমন উর্ধ্বশ্বাস পলায়ন? এইখানেই [illegible]ন আর্টিস্ট মোদী। মোদীর চলাফেরায় সুষমা নেই, ব্যাটে-বলে সংযোগের পূর্ব পর্যন্ত একটা নিতান্ত জবড়জঙ্গ ব্যবহারে মোদী আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে যাবেন, তারপরেই সহসা বলব্যাটের সংযোগ-বিন্দু থেকে বেরিয়ে আসবে শিল্পী,—আমরা পেয়ে যাব অস্বস্তির মধ্যে আনন্দিত এক স্রষ্টাকে। চোখের পলকে সেই কী-একটা ঘটিয়ে দিয়ে মোদী আবার চিরাচরিত ব্যাট-ঠোকা, টুপি-ওঠানো, মাথা-নাড়ানোয় নিযুক্ত থাকবেন। আমরা অবাক হয়ে ভাবব, কিছু আগেকার সেই অসামান্য সৌন্দর্যবিকাশটি এই লোকটির দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল তো? সেটা যেন একটা অ্যাকসিডেন্ট, সুন্দরতম আনাড়িপনা। কিন্তু ঐ জিনিসই বারবার ঘটিয়ে, আমাদের মধ্যে সুর এনে দিয়ে মোদী এক সময় হঠাৎ চলে যাবেন প্যাভিলিয়নে, আমরা একটি অপ্রত্যাশিত সুখসুরের মধ্যে নিমজ্জিত থাকব, যে অভাবিত সুরের অনুভূতি আমরা পেয়ে যাই কোনো একটি মলিন-বসন উদ্‌ভ্রান্ত-মূর্তি পথচারীর বীণা বা গীটারের ঝঙ্কার থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্য-অধিনায়ক

(পলি উমরিগর)

যখন বলেছিলুম 'হিস্টরিক্যাল প্রেজেন্ট' বা ঐতিহাসিক বর্তমানের অন্যতম উদাহরণ পলি উমরিগর, তখন অনেকে আমার কথা বুঝতে পারেননি। কথাটি বলেছিলুম কৌতুকভরে কিন্তু মিথ্যে করে নয়। উমরিগরের কথা ভাবছিলুম। তাঁর খেলার স্মৃতি ভেসে আসছিল মনে। কিছুতে তাঁকে 'সাধারণ বর্তমানের' মধ্যে ফেলতে পারিনি। বর্তমানে খেললেও উমরিগর আসলে ইতিহাসের স্বর্ণযুগের অধিবাসী। যে-কালে হাজারের পাথর-গাঁথা ইনিংস কিংবা মঞ্জরেকারের চওড়া ব্যাটের বিবেচক আক্রমণ ভারতীয় ব্যাটিং-এর একমাত্র সম্পদ, সেই সময় কোথা থেকে ফিরে

এল মুস্তাকের যৌবন, সি কে-এর সাহস, অমরনাথের দৌরাত্ম্য? এ জিনিস গতকালও ভারতে ছিল বাস্তব, এর নাম দেওয়া হয়েছিল প্রাচ্যের সূর্যাগ্নি, কিন্তু কত শীঘ্র তা ইতিহাসে পরিণত হোল,—ভারতীয় ব্যাটিংশক্তির সহসা অধঃপতনে দূর ইতিহাস! এরই মাঝে এ[illegible] উমরিগর গত দিনের রক্তিম উচ্ছ্বাসের ভাষায় যদি কথা বলেন, মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় সে বস্তুকে ঐতিহাসিক বর্তমান বলে।

উমরিগর প্রথম বয়সের প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্যাটিং-এ। কলকাতার মাঠে কয়েকবার তাঁকে মনে আছে। ট্রাইব-রামাধীন-আইভারসনাদির বিরুদ্ধে। কাঁপতে কাঁপতে আউট হয়ে গেলেন বঙ্গবীর ও ভারতবীরেরা। তখন নামলেন উমরিগর দলরক্ষার প্রয়োজনে, আত্মরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে। খুব অনিচ্ছুকভাবে দু'একটি বল থামালেন, খুবই অবজ্ঞাভরে। বুঝতে পারা গেল কতখানি সংযমের সাধনা করতে হচ্ছে। তারপর বাঁধ ভাঙল। বে-আইনি আক্রমণের তরঙ্গ। উইকেটের উপর হেলে পড়ে ব্যাটের অলাতচক্র সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, আর আগুনের গোলাগুলো চোখ ধাঁধিয়ে ছুটে যাচ্ছে সীমানার পারে।

সীমার মাঝে অসীম—ক্রিকেটে।

সেদিনের কথা স্মরণে আসা মাত্র মেঘনাদবধ কাব্য ভর করল মাথায়,—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
শ্রীপঙ্কজ, চলি যবে গেলা ড্রেস-ঘরে
অকালে, হায়রে বৃথা সুইঙ্গে খুঁচিয়ে,
তখন হে দেবি, কহ, অমৃত-ভাষিণি,
কোন্ বীরবরে আহা প্যাড-ব্যাট লয়ে
পাঠাইলা রণে পুনঃ অতি বিচক্ষণ
অমর অমরনাথ?

এতদূর শুনে জনৈক অল্পবয়সী বন্ধু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরটা কি? আমি উৎসাহভরে বললুম, উত্তর স্বতঃসিদ্ধ,—

বুঝিনু বুঝিনু ঠিক, অ্যাটাক-বিলাসী
সে বীর উমরিগর।

'ছুছুন্দরীবধ কাব্যে'র লেখকের কাণ্ডজ্ঞান না থাকলেও রসজ্ঞান ছিল বলে অনেকের ধারণা। আমার আশঙ্কা, পাঠকেরা আমার রসজ্ঞানে সন্দেহ করবেন। সেটি আমার সইবে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নেই বললে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হব। 'অ্যাটাক-বিলাসী সে বীর উমরিগরের' মধ্যে একচুল অতিরঞ্জন নেই।

উমরিগর কয়েক বছর ভারতের পক্ষে প্রধান রান-সংগ্রহকারী। দুঃখের বিষয় তাঁর লুণ্ঠন অধিকাংশক্ষেত্রে বেসরকারী শক্তিশালী কমনওয়েলথ দলগুলির কাছ থেকে। সরকারী টেস্ট দলের বিপক্ষে হলে তাকে লুণ্ঠন না বলে বলতুম শৌর্যার্জিত সম্পদ। উমরিগরের উঠতি জীবন ব্যয় হয়েছে সেরা দলের বিরুদ্ধে খোলা মাঠের 'নেট প্র্যাকটিসে'। বেশী শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে বললে বলব, নকল সংগ্রামে।

উমরিগরের মধ্যে যেটি সকলের চোখে পড়বে,—তাঁর মনোরম অপরিণতি। উমরিগর এখন ক্রিকেট-জীবনের সেই বয়সে পৌঁছে গেছেন যখন বাহুল্যের উত্তেজনা কমে গিয়ে মন্থর দায়িত্ববুদ্ধিতে ব্যাট ভারী হয়ে ওঠা উচিত। এ সেই বয়স যখন কোনো সাহসের মার মারবার আগে ব্যাটসম্যান একবার পিছনে তাকাবে এবং পিছনে তাকাবার পরে আর মারবে না। নতুন চাকরির পয়সা উড়িয়ে দেবার বয়স গেছে, গোটাকতক মোটা অ্যাভারেজের ইন্সিওর করে নাও। টেস্ট ক্রিকেটারের 'লাইফ' সব সময়ই 'রিস্কি'। সে দায়িত্ববোধ কিন্তু দেখলুম না উমরিগরের খেলায়। এইখানেই পরিণতির ক্লান্তি থেকে উমরিগরের অব্যাহতি। উমরিগর এখনো তাঁর কল্পনাশক্তির বিকাশে সৃষ্টিশীল শিল্পী।

উমরিগর কি সে সময়ও যথেষ্ট সংযত, যখন সংযম রান-কৃশ দলের পক্ষে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন?—না। উমরিগর কি বিপরীতপক্ষে প্রতিটি শ্লথ বলকে অবশ্যম্ভাবী তাড়নে বাউণ্ডারীতে পাঠাতে পারেন, আঙ্গিকসম্পূর্ণ একজন খেলোয়াড় যা অবশ্যই করে থাকেন?—না। বহু 'সস্তা' বলকে পেটাতে গিয়ে হঠাৎ, অকারণে, ব্যাটের মাঝখানে ঠেকা দিয়ে ছোট ছেলের মত কষ্টকৃত আত্মসংবরণের যন্ত্রণায় ছটফট করে পায়চারি করেন ক্রীজে। উমরিগর কি মারবার জন্য মারবার বলের অপেক্ষা করেন?—কদাপি না।

যেগুলো মারতে অসুবিধা সেগুলো মেরেই খুসী উমরিগরের খেয়ালী প্রতিভা। আকস্মিক অধৈর্য এবং অকারণ স্থৈর্য তাঁর ক্রিকেটে অনির্দেশ্যের ছায়াপাত করে ক্রিকেটের মহান্ অনিশ্চয়তাকে আকর্ষণ করে এনেছে নিজের প্রতিভার উপরে। অবিশ্বাসের বিশ্বাসে উমরিগরের অবস্থান।

এইখানেই অসুবিধা। আনন্দমুখর এই মেজাজী ও খেয়ালী খেলোয়াড়টি একই কালে ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ ও বিপদ। 'ভারতীয়' রামাধীনের খ্যাতিনাশ করে অস্ট্রেলিয়ান বেনোডের খ্যাতিবৃদ্ধি উমরিগর কেন করেন, তা আমাদের কাছে তুর্বোধ্য। স্পিনারের শত্রু উমরিগরকে কি ট্রাইব-আইভারসন কোনোদিন ভুলবেন? কিন্তু উমরিগর যে বড় বেশী নিজেকে ভুলে যান। সিলভার জুবিলী দলের সঙ্গে খেলায় ইডেন গার্ডেনে যখন অন্যেরা শিথিল পদে প্যাভিলিয়ানের গ্লানি-রোমন্থনের জন্য ফিরতি যাত্রা সুরু করল একে একে, তখন উমরিগর কত সহজে অসম্মান করলেন নিজের দলের ব্যাটসম্যান ও বিপক্ষের বোলারদের। ব্যাটিং এত সহজ মনে হতে লাগল উমরিগর আসার পর থেকে, বোলিং এমন মধ্যম শ্রেণীর দেখাল,—যা কিন্তু সত্যই ছিল না। যারা ফিরে গেল আউট হয়ে, তাদের যোগ্যতা বিষয়ে কি প্রশ্ন করতুম, যদি উমরিগর অতঃপর না আসতেন? পরিবর্তে কি বোলারকে অযোগ্যমাল্যে ভূষিত করতুম না?

কিন্তু এতবেশী ব্যর্থতা কেন ঘটাবেন তিনি যখন ইচ্ছে করলেই সফল হতে পারেন? হাঁ, সে বিশ্বাস তিনি তাঁর শক্তির সহজ প্রত্যয়ের দ্বারা আমাদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। বিশেষত যখন উমরিগর তিন নম্বর খেলোয়াড়। মনে রাখা দরকার, দলের প্রধানের স্থান ঐখানে। তিন নম্বর জায়গায় খেলতে গিয়ে, একদিকে প্রাথমিক ব্যর্থতার ত্রুটি সংশোধন করতে হয় প্রয়োজনমত, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য স্থাপন করতে হয় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশস্ত প্রাসাদ। তিন নম্বর তারকে এমন দৃঢ় ও নমনীয় হতে হবে যে, তা যেন খাদে ও চড়ায় বাজতে পারে ইচ্ছামত। এমন গুরুত্বে অবস্থান করে উমরিগর বড় বেশী মেজাজের উপর নির্ভর করেছেন। খেলা যদি এখনো আর্ট হয়, তবু তা যে কমার্শিয়াল আর্ট, তিনি বুঝতে চাননি। ভাল লাগলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়েছেন নানা সুরে, তাতে খুসী

হতে পারে (হয়ত) রণজি, কিংবা উলী, কিংবা স্পুনারের সমঝদার প্রতিভা, নিশ্চয় তৃপ্ত হবে কম্পটন কিংবা মুস্তাক কিংবা ওরেলের স্বখোচ্ছল উপভোগ। কিন্তু কতবার যে তিনি মেজাজ খুঁজে পাননি। যন্ত্র ফেলে রেখে অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন, খেলাটা যে খেলাই, দাসত্ব নয়, প্রমাণিত হয়েছে তাঁর আচরণে। কিন্তু খেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে। সে বড় স্বার্থপর স্বামিনী; আনন্দের দাসত্বে বেঁধে রাখাই তার বাসনা, নিষ্ঠাবান ক্রীড়াভৃত্যদের প্রতি তার অনুগ্রহের সিংহাসন।

তাবলে একথা যেন কেউ মনে না করেন, আমি উমরিগরকে দাঁড় করাচ্ছি অমরনাথ কি মুস্তাক আলীর পাশে। প্রতিভার অঘটন-ঘটন-পটুত্ব নিশ্চয় অনুপস্থিত উমরিগরের মধ্যে। বিপদকে টেনে এনেও শেষ মুহূর্তের সংশোধনে যে অভাবিত শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন মুস্তাক আলী, প্রচলিতের লঙ্ঘনে ও অপরিচিতের আমন্ত্রণে যে 'চমৎকার' রচনার অধিকার আছে অমরনাথের, অবশ্যই উমরিগর সে প্রতিভাসম্পদে বঞ্চিত। কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছেন তিনি যৌবনের স্বস্থ প্রাণাবেগে। শরীর তাঁর নমনীয় সুঠাম, কব্জিতে আছে জোর, ঝুঁকি নেবার আছে সাহস, এবং আছে উল্লসিত হবার শক্তি। মুস্তাক বা অমরনাথ 'প্রাকৃতিক'। ও বস্তুকে প্রতিদিন পাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু তারুণ্য প্রতি জীবনেই থাকে। এই কথাটি উমরিগর ভুলে যাননি, আমাদেরও ভুলতে দেননি।

উমরিগরের কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের অধিনায়করূপে তাঁর চেহারা। ভারতের অধিনায়ক হয়েও তাঁর সেই 'প্রথম' মূর্তি তিনি আমার মন থেকে মুছতে পারেননি। খাঁটি ক্রিকেটারের অবয়ব, সাহসের সৌন্দর্য এবং যৌবনের মহাদানে সমৃদ্ধ উমরিগর আমাদের ক্রিকেটে প্রাণের প্রতীক।

খ্যাটো কনস্টানটাইন

(জি. এস. রামচাঁদ)

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক বলেছেন, মার্চেন্ট ভারতের ইংরেজ। বাঙালী লেখক বলতে চান,—রামচাঁদ ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান। ইদানীং যাঁদের মধ্যে অপরিমিত প্রাণ দেখা গিয়েছে এদেশী ক্রিকেটে, রামচাঁদ তাঁদের অগ্রণী।

অমন একটি চেহারা! গাঢ় কাল রঙ, চওড়া মজবুত গড়ন, লম্বাটে চৌকো মুখ, কপালের উপর ওল্টানো খাড়া শক্ত চুল। তার উপর উৎসাহ। অলরাউণ্ডার রামচাঁদ প্রতিভার তুলাল না হয়েও সেবাতৎপর সমর্থ সন্তান।

রামচাঁদকে ডাক দিলেই পাওয়া যায়। উদ্দীপনার আগুন আর কর্তব্য-পালনের আগ্রহ নিয়ে তিনি সদাই প্রস্তুত। সূচনার বোলিং, ব্যাটের মুখে ফিল্ডিং, এবং বীরের মত ব্যাটিং—ভারতের আধুনিক ক্রিকেটে রামচাঁদকে স্বীকার না করে উপায় কি? রামচাঁদ কোনো ক্রিকেট-ইতিহাসে কোনো-দিন স্থান পাবেন না, মাঝারিয়ানা তাঁকে বেঁধে রাখতে চাইবে, কিন্তু তিনি খোলা বুকের সাহস আর বিস্তৃত হাসি নিয়ে সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে প্রত্যাখ্যান করবেন বারবার।

আমি রামচাঁদকে বারংবার দেখেছি নিষ্ঠাবান সৈনিকরূপে। এই সৈনিক রামচাঁদই, এমন বহুবার হয়েছে, একক শৌর্যে পিছনে ফেলেছেন রথী মহারথীদের। মাথা-ধরা মাজা-ভাঙা ভারতীয় ব্যাটিংশক্তিতে রামচাঁদ শক্তকোমর মল্লবীর, এবং তাঁর দানের হিসাব যে কেউ সংগ্রহ ক'রে নিতে পারবেন ক্রিকেট-পঞ্জী থেকে।

রামচাঁদের একটা নিজস্ব ব্যাটিং-পদ্ধতি আছে। কপিবুকের বাণী-লেখা শিষ্ট ব্যাটের ব্লেডকে বল যেখানে ছিদ্র করেছে বারবার, সেখানে রামচাঁদ এনেছেন পল্লী-ক্রিকেটের আদিমতা। সেই আদিমতা সফেসটিকেসন ঘুচিয়ে স্বাস্থ্য দিয়েছে ক্রিকেটকে। ডাক্তারের বড়ি আর টিনের দুধ খাওয়া 'শিশু'

ক্রিকেট রোদেপোড়া তেলমাখানো কড়া জানের অধিকার পেয়েছে। 'গ্রাম্য' রামচাঁদ সম্বরে প্রসাধনের প্রতিবাদ।

সেই প্রতিবাদ দেখেছি রামচাঁদের ব্যাটের ডগায় কিছুদিন আগেও কলকাতার মাঠে। এস. জে. ও. সি দলের বিরুদ্ধে কিভাবে না বলের পাগলা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল মাঠের চতুর্দিকে রামচাঁদের ব্যাটের মুখ থেকে। ঝাঁঝালো ধাঁধানো ব্যাটিং-এর বন্য বন্যা। সে ব্যাটিং-কে বিবেচক বলে নীতিহীন, না-ক্রিকেট। হাঁ-ক্রিকেটকে নমস্কার ঠুকে, পাশে ঠেলে দিয়ে, রামচাঁদ মেতে উঠেছিলেন 'আনন্দময় অগাধ অগৌরবের' নেশায়। সেদিন সেই গ্রাম্য কোলাহল থেকে নবজীবন পেয়েছিল সভ্যতাক্রান্ত নরনারীরা।

অননুকরণীয় লিয়ারী কনস্টানটাইনের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ— জি এস. রামচাঁদ।

সহাস্য, সুভদ্র, সুন্দর

(দাত্তু ফাদকার)

জর্জ ডাকওয়ার্থ কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে এসেছিলেন ম্যানেজাররূপে। ফাদকারের খেলার তখন ভরা পূর্ণিমা। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং, চলা-ফেরা-ঘোরা,—উছল যৌবনের সুখের তরঙ্গ। মুগ্ধ হয়ে ডাকওয়ার্থ বললেন, কিন্তু বন্ধু, তোমাকে একটিকে ছাড়তে হবে। তোমার যা চেহারা, তাতে বড় ব্যাটসম্যান ও ফাস্ট বোলার একসঙ্গে থাকতে পারবে না।

'যা চেহারা'। কথাটা ঠিক। ফাস্ট বোলার হতে চাইছ অমন ফুটফুটে চেহারা নিয়ে? তা, চেহারা ভগবানের দেওয়া, তাতে মানুষের হাত নেই, কিন্তু মেজাজ? রক্তজলকরা বল ছুঁড়বে, অথচ আম্পায়ারকে ডাকবে অমন মিষ্টি গলায়? অস্ট্রেলিয়ান চেঁচানি তো শুনে এসেছ, তবু গলার মধু নষ্ট করতে পারলে না?

ফাদকার সুসভ্য, সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী মার্জিত। ফাস্ট বোলারের নৃশংসতা তাঁর ছিল না কোনোদিন।

ফলে মিডিয়াম ফাস্টের উপরে উঠতে পারলেন না, এবং দেহের শক্তি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন বলের গতি কমে এল, তখন কোনো হিংস্র উদ্যম নিয়ে সেই গতির ক্ষতি পারলেন না পূরণ করতে।

অথচ ফাদকার সত্যকার ভালো বোলার এবং ব্যাটসম্যান। কোনো একটা সময়ে তিনি নিশ্চয় পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যালান্সড্ ক্রিকেটার ছিলেন। তখন তিনি মিলার-লিণ্ডওয়ালের বলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করতে পারেন, এবং মিডিয়াম ফাস্ট ইনসুইঙ্গারে ফিরিয়ে দিতে পারেন পৃথিবীর যে-কোনো ব্যাটসম্যানকে। অভাবনীয় ক্যাচ ধরে ফেলা তাঁর পক্ষে তখন কঠিন নয়, এবং উপস্থিতির সুষমায় মাঠের তের জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অদ্বিতীয় তিনি।

সেই সময়টি দীর্ঘ হয় নি। ঘুরে ফিরে মনে আসছে ডাকওয়ার্থের সাবধান-বাণী,—দু'দিকে পা বাড়িও না।

ডাকওয়ার্থের কথাটি কি ঠিক? দু'দিকে নিজেকে ক্ষয় করার জন্যই কি ফাদকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। ফাদকার জাত খেলোয়াড়—মাঝারি জাত। মিডিয়াম ফাস্ট বোলাররূপে ফাদকার যথা-সম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছেন। সত্যকার ফাস্ট বোলার হবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সে মেজাজ ছিল না, ছিল না শারীরিক সামর্থ্য। শারীরিক সামর্থ্য চর্চায় বাড়ানো যায়, কিন্তু তার সীমা আছে, চর্চায় আর যাই হোক শরীরের কাঠামো বদলানো যায় না। তেমনি বদলানো যায় না মনের কাঠামো। চমৎকার চেহারার এই ছোকরাটি দৈত্য হতে পারেন না, চমৎকার মনের এই ভদ্রলোকটি পারেন না বিপক্ষের 'শত্রু' হতে।

বিপক্ষকে 'ব্যক্তিগত শত্রু' মনে না করলে সত্যকার ফাস্ট বোলার হওয়া যায় না।

ফাদকারের ভবিতব্য, তিনি নিখুঁত, সংযত, সুসভ্য ক্রিকেটার হবেন। তার জন্য প্রথম শ্রেণীর ফাস্ট বোলার বা ব্যাটসম্যান হবেন না।

আর ভারতবর্ষের ভবিতব্য হোল, সে ফাস্ট বোলার পাবে না। একদিন আমাদের নিসার ছিল—এই রূপকথার জাল বুনে যেতে হবে তাকে, এবং উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকতে হবে সুঁটে ব্যানার্জির দিকে,—ব্যানার্জির

'বুড়ো' হাতে এখনো কতখানি শক্তি অবশিষ্ট আছে? ভারতের বড় জোর গতি মাঝারি-জোর গতিতে।

অপরদিকে ক্রিকেটের একটা রীতি আছে, বোলিং আরম্ভ হবে জোর বোলার দিয়ে। রীতিটা এমনিতে গড়ে ওঠেনি। ক্রিকেট বড় লোকের খেলা, নতুন বল নিয়ে প্রতিদিন খেলা সুরু হয়। সেই নতুন বল চর্মে আবৃত, বর্ণে রক্তিম, আর পালিশে চিকন। সে বলে আঙুল পিছলে যায়, বুড়ো আঙুলের অন্তর-টিপুনিতে তাকে আঁকানো বাঁকানো যায় না। যদি না যায় ব্যাটসম্যানকে আউট করা যায় কি করে? তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বলের পালিশ-চটা বার্ধক্য পর্যন্ত? অপেক্ষা করলেই বা সুরাহা কোথায়? ইতিমধ্যে ব্যাটসম্যানের ধাতস্থ চোখে ক্রিকেট-বল ফুটবলে পরিণত। উইকেটের গোলপোস্ট তুলনায় খুবই সঙ্কীর্ণ। তাহলে উপায়! উপায় ফাস্ট বোলিং। ওপেনিং ব্যাটসম্যান নামা মাত্র তাকে উড়িয়ে দাও। তার চোখ ঠিক হবার আগে ছিটকে দাও তার উইকেট। কিংবা তার কাঁপা হাতের ব্যাট থেকে ঠোকা-খাওয়া বল এধার ওধার লাফিয়ে উঠে পড়ুক ফিল্ডারের থাবায়। তাছাড়া বলের রঙ থাকতে যদি বল জোরে ছুঁড়তে পার, এবং ছোঁড়বার সময় যদি গোটা হাতটাকে কাঁধ থেকে ঘুরিয়ে দিতে পারো খানিক, তাহলে দেখবে, আঙুলের অন্তর-টিপুনির দরকার নেই, তোমার শরীর ও হাতের দোলাতেই বল আকাশপথে আঁকাবাঁকা হয়ে বিদ্যুৎবেগে মাটিতে নেমে পড়ছে,—ডানদিকে বাঁকলে হোল ইনসুইঙ্গ, বাঁদিকে বাঁকলে—আউটসুইঙ্গ।

অতএব ফাস্ট বোলার চাই। না থাকলে হারবার জন্য তৈরী থেকো। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইংলণ্ড নিয়মিত হারতে তৈরী ছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। তখন যুদ্ধে অক্ষত অস্ট্রেলিয়ার লিণ্ডওয়াল-মিলারের বলে গতির গর্জন, তখন যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইংলণ্ডের বোলারেরা শাস্তির ভিখারী। সেই কটা বছর ইংলণ্ডের গেছে অ-গতির দুর্গতি।

ইংলণ্ড যে সে সময়ও মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল, বিপক্ষের গোটা দলকে কখনো কখনো আউট করতে পেরেছিল,—তা একজনের প্রতিভায়,

তাঁর নাম আলেক বেডসার। আলেক বেডসার মধ্যগতি বোলার। যুদ্ধক্ষত ইংলণ্ডের তিনি সূচনার আশ্বাস, সামর্থ্যের বিশ্বাস।

ব্রাডম্যান ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য একটিমাত্র অস্ত্র—বেডসার। ভারতের বেডসার হলেন দাত্তু ফাদকার।

'ভারতের বেডসার' কথাটির মধ্যে ন্যূনতার ইঙ্গিত আছে। ফাদকার নিশ্চয় বেডসার নন। আমার বক্তব্য, ভারতের পক্ষ-সূচনায় বেডসারের মত কিছু ভূমিকা ছিল ফাদকারের। ফাস্ট বোলার নেই দেশে, নির্ভর করতে হচ্ছে মিডিয়াম ফাস্টের উপর, সেই মিডিয়াম ফাস্টরা অনেক সময় ভারতীয় দলে এসেছে নিছক বলের বর্ণ-নাশের প্রয়োজনে। ফাদকার তা ছিলেন না। 'কিছু বেশী জোরে বল ছুঁড়তে পারে,'—তাঁর বিষয়ে এটা কোনো বক্তব্য নয়,—তাঁর বলের কিছু জোরকে আরো জোরদার করে তুলেছিল প্রতিভার তেজ। ফাদকারের মধ্যগতি বল মারাত্মক ছিল বলের দ্রুতির জন্য নয়, বলের দ্যুতির জন্য। ভারতের শুকনো মাঠের ফাদকার ইংলণ্ডের ভিজে মাঠ পেলে বেডসারের কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতে পারতেন না এমন কথা বলা যায় না। তবে ইংলণ্ড যেমন কিছু-দিনের জন্য একান্তভাবে নির্ভর করেছিল বেডসারের উপর, ভারতের তা করতে হয়নি, এদেশের পক্ষে একটি মহৎ আশ্বাস ছিল বলে। ফাদকারের হাতের তলায় পাতা ছিল একটি চওড়া হাত—ভিনু মানকদের।

আমি ফাদকারকে তাঁর সেই যৌবনের যুগে আর একবার ফিরে পেতে চাই। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছেন। গিয়েছিলেন বোলাররূপে, দাঁড়ালেন ব্যাটসম্যান। মিলার-লিণ্ডওয়াল-টোসাকের বিরুদ্ধে পায়ের তলায় যখন মাটি নেই ভারতের, তখন শেষ প্রতিরোধ এল যৌবনের, দত্তাত্রেয় ফাদকার জানালেন, ক্রিকেটে কোনো শেষ কথা নেই। বোলার ফাদকার টেস্ট সেঞ্চুরী করে ব্রাডম্যান প্রমুখ তাবৎ অস্ট্রেলিয়ানের প্রশংসা কুড়িয়ে দেশে ফিরেছেন,—দেশে খেলা সুরু হতে দেখা গেল 'ব্যাটসম্যান' ফাদকার বোলার হিসেবে কম যান না। বরং বলা চলে ব্যাট করবার ক্ষমতা থাকলেও তিনি ব্যাটসম্যান নন, তিনি রান দেন দলকে, রাঙিয়ে দেন না মনকে। কিন্তু বোলার? সত্যিই বোলার। পৃথিবীর প্রথম সারিতে—

অন্তত একটি সময়ে। মনে পড়ছে সেই সময়টি—সেই সময়ের একটি দিনকে। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক লিভিংস্টোন নেমেছেন ব্যাট করতে। উইকেটকীপার ও ওপেনিং ব্যাটসম্যান তিনি। রীতিমত ভাল ব্যাটসম্যান, বলে জোরে পেটানোয় বিশ্বাস করেন। গোছালো টাইট গড়ন, রান করেন গোছালো নিয়মিত রীতিতে। প্রবীণ লিভিংস্টোনের বিরুদ্ধে সতেজ দত্তাত্রেয় দৌড় সুরু করলেন। দর্শকেরা দেখছে। এখনো কোনো বিশেষ প্রত্যাশা গড়ে ওঠেনি মনে। বল ছোঁড়বার আগে চমৎকার ছন্দে লাফিয়ে উঠলেন ফাদকার, চমৎকার! হাত ঘুরল। বল পড়ল। লিভিংস্টোনের পা ও হাতের ব্যাট নিয়মিত গতিতে বেরিয়ে এল, আস্থায় প্রশস্ত ব্যাটটিকে লিভিংস্টোন স্বচ্ছন্দে সামনে পেতে দিলেন।

অফ স্টাম্প ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

এমন একটা বল সহজে দেখা যায় না। হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়ে সে কথা বলে গেলেন অধিনায়ক লিভিংস্টোন সকলের সামনে।

মধুর হাসিতে মাথা ঝুঁকিয়ে সে অভিনন্দনকে স্বীকার করলেন ফাদকার।

সেই সলজ্জ সুমিষ্ট হাসিটি মনে আছে আমার। মনে আছে আমার সেই বলটি, যা লিভিংস্টোনের নিশ্ছিদ্র আত্মরক্ষার মধ্যেও প্রবেশের ছিদ্র পেয়েছিল। বলটি ছিল প্রতিভার সৃষ্টি, হাসিটি চরিত্রের। প্রতিভা ও চরিত্রকে একসঙ্গে মেশাতে পেরেছেন ফাদকার। ক্রিকেট যে একটা আচরণ, তা তাঁকে দেখে বারবার অনুভব করছি। যদি কোনো দিন আমাকে খাঁটি ক্রিকেটারের সমাবেশে ভারতের প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হয়, আমি এই সহাস্য, সুভদ্র, সুন্দর ক্রিকেটারটিকে নিশ্চয় মনোনীত করব।

ভারতের জাতীয় খেলোয়াড়

(ভিনু মানকদ)

ক্রিকেটের ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য লেখকদের সঙ্গে আমার ধারণার পার্থক্য আছে। তাঁরা যখনি খেলায় কোনো নীতিহীন উন্মাদনা লক্ষ্য করেন, অমনি সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠেন, দেখ দেখ, এই হোল প্রাচ্যভূমের

প্রাণোদ্দীপনা। শীত দেশের লোকদের ধারণা ভারতবর্ষ যেহেতু আবহাওয়ায় উত্তপ্ত, সে কারণে মেজাজেও তপ্ত। এ কথার বিপরীতটাই সত্য। গরমের সঙ্গে যাদের লড়াই করতে হয় অবিরত, তারা স্বেদসিঞ্চিত শীতলত্ব পেয়ে যায় অনতিবিলম্বে।

রহস্যময় প্রাচ্য, তার ছায়াচ্ছন্ন যাদু ইত্যাদি বিলেতী কুসংস্কারকে এখনি বর্জন করব। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব আমাদের কর্তব্যবিমুখ খেলোয়াড়ের কদাচিৎ এক উন্মত্ত সেঞ্চুরীর পিঠে মুরুব্বিয়ানার হাত-চাপড়ানিকে। ইংরেজ লেখকদের লেখনীতে রোমান্স-রস সঞ্চার করবার জন্য আমরা খেলায় দেউলিয়া নবাবিয়ানা আর দেখাতে প্রস্তুত নই। আমাদের আদর্শ খেলোয়াড়, প্রতীক খেলোয়াড়, আমি জোরের সঙ্গে বলব, ভিনু মানকদ। ভিনু মানকদ খাঁটি ভারতীয় ক্রিকেটার।

ভিনুর দিকে একবার তাকান আর ভারতের জাতীয় স্বভাব স্মরণ করুন। এদেশের জীবনের ধীর লয়, অব্যস্ত গতি, প্রসন্ন সহিষ্ণুতা, শান্ত প্রতিরোধ, অহিংস অসহযোগিতা। ভারতবর্ষের প্রান্তর, কৃষক, গোরুর গাড়ী, ধানকোটা, তাঁতবোনা। আর মনে করুন ভিনু মানকদকে। এদের মধ্যে কোথায় কি একটা ঐক্য নেই?

ভিনুর বোলিং-ভঙ্গির মধ্যে ঐ কথাটা আছে—ব্যস্ত কেন, বেশতো! মিলার সেবার, সেই ১৯৪৫ সালে, ভিনুকে মারলেন পরপর ওভার বাউণ্ডারী। মারলো তো মারলো, কি হয়েছে। নির্বিকার হাসি নিয়ে ভিনু বল দিয়ে চললেন। কিথ মারতে চায় মারুক, কিন্তু আউটও তো হয়ে যেতে পারে।—অ্যাঁ?—হাঁ। আউট। ভিনু মারতে দিয়েছেন, ভিনুই আবার আউট করে দিলেন। ঠিক এক জিনিস হোল ১৯৪৮ সালে ওয়ালকটের বেলায়। পরপর ওভার বাউণ্ডারী, আবার আউট। এই হোল ভারতের চিরকালের ভঙ্গি। যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এসেছে, তাকে আরো কিছুক্ষণ লাফাতে দাও, তারপর ক্লান্ত হলে টেনে নিও।

অধিনায়ক অমরনাথ ভিনুর হাতে বল তুলে দিলেন—ছবিটা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। উইকেটের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন ও বোলারের সলাপরামর্শ, সেনাসন্নিবেশ। সরে গেলেন ক্যাপ্টেন। বোলার ভিনু

কয়েক পা পেছিয়ে গেলেন পিছন ফিরে। ঘুরলেন। দেখতে পেলুম বুকখোলা জামা, মাথার চেরা সিঁথি, চকচকে কালো চুল, স্বভাবসিদ্ধ সাদা হাসি, কোঁচকানো চোখ। চওড়া শরীর দুলে উঠে কয়েক পা এগিয়ে এল, উইকেটের পাশে শরীর ঝুঁকল, বাঁ হাতে কোণাকুণি উপরে উঠে গেল এবং একটি বল ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠতে সুরু করল—

"সমস্তটাই অনন্তের অংশ।"—ভেরিটির বোলিং সম্বন্ধে সুবিখ্যাত লেখকের সুন্দর বর্ণনাটি মনে পড়েছে,—"তাঁর শিথিল, অস্থিহীন নিক্ষেপভঙ্গি, বলের বঙ্কিম বিস্তার আমাদের ইন্দ্রিয়কে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ভেরিটি চিরন্তনের সন্ধানে ধৈর্যশীল শিক্ষানবিশী। তিনি যেন নিরাকারের শূন্যের দিকে বল নিক্ষেপ করে যাচ্ছেন। তাঁর শিল্পসাধনা বাউণ্ডারী, উইকেট, ইত্যাদি নোংরা জিনিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এর নাম বোলিং-এর জন্য বোলিং, অনন্তের পটে প্রেক্ষণীয়। This is bowling for bowling's sake, seen under the conditions of eternity."

এর নাম ভিনু মানকদের বোলিং। অনুত্তেজিত উৎকণ্ঠাশূন্য স্বভাবে জালবিস্তার। ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠে নেবার মধ্যে যে হিংসাবৃত্তি আছে, ভিনুর নিরামিষাশী স্বভাবের সঙ্গে তা মেলে না। হুটোপাটির দরকার কি? যদি যথেষ্ট ধৈর্য এবং কিছু বুদ্ধির বিস্তার থাকে. তাহলে শিকার ধরা দেবেই, কারণ সে ভুল করবেই। ব্যাটসম্যানের ভুলের জন্য ভিনু প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত আছেন এবং মধ্যবর্তী কালে প্রস্তুত আছেন নেতিবাচক বোলিং-এর বিরুদ্ধে আপনার নিন্দা শুনতে।

অন্যদিকে দেখা যাক অমরনাথকে। বিপরীত তুলনায় অমরনাথ ভিনুর স্বভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। ১৯৪৬ সালে ভিনু-অমরনাথের বল দেখে ইংলণ্ড স্বীকার করেছিল তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোলার-জুটি বলে। সেবার ইংলণ্ডে ভিনু অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছিলেন। একশোর উপর উইকেট এবং হাজারের উপর রান—১৯২৬ সালে কনস্টানটাইনের পর বহিরাগত দলের পক্ষে ভিনুই ঐ কীর্তি করলেন। মরশুমের শেষে দলের মধ্যে উইকেটসংখ্যায় ভিনু প্রথম তো নিশ্চয়ই, অধিকন্তু দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর দ্বিগুণেরও বেশী তাঁর প্রাপ্তি। টেস্টেও অমরনাথের চেয়ে বেশী

উইকেট পেয়েছেন। তবু অমরনাথই ছিলেন বোলাররূপে হিংসায় বিদ্বেষে ভয়াবহ। অমরনাথের সে চেহারার রূপ :—

'টেস্টে অমরনাথ এমন একটি ক্রূর বিষাক্ত রূপ গ্রহণ করেন, যাতে ব্যাটসম্যান উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত হয়ে পড়ে। তুচ্ছতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন তাকে। ব্যাটসম্যানের স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। অমরনাথ তাকে প্রথমে বিমর্ষ বন্ধ্যাত্বে পরে জ্ঞানশূন্য ক্রোধে ঠেলে দেন। স্বচ্ছন্দ চটপটে চার পায়ের এক দৌড়, বল ছোঁড়বার আগে একপায়ে একবার নেচে নেওয়া, তারপর হাতের ও কব্জির সর্পিল বক্রতা। বল ছোঁড়ার পরেই চিতাবাঘের মত গুঁড়ি মেরে ছুটে যান, চোখতুটো ব্যাটসম্যানের অঙ্গে আঠার মত জুড়ে থাকে এবং দর্পের কুটিল হাসিতে ঝিকিয়ে ওঠে দাঁতগুলো।'

অমরনাথের এই আক্রমণাত্মক রূপ,—'পলায়নপর কয়েদীর পিছনে কারাকুক্কুরের তুল্য নিঃশব্দ ঘৃণাপূর্ণ পশ্চাদ্ধাবন',—ভিনু মানকদের হিসেবী, মেজাজী, আতিথ্যপূর্ণ বোলিং-এর কত বিপরীত। অমরনাথের খেলায় প্রতীচ্য দুঃসাহসিকতা, ভিনুর খেলায় ভারতীয় মহানুভবতা।

ভারতবর্ষ ভিনুকে বিশেষ ক্রীড়াস্বভাব দিয়েছে, ভিনু ভারতকে অর্পণ করেছেন ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। ভিনুর মত প্রতিদান আর কোনো খেলোয়াড়ের নয়। ১৯৩৬ সালে স্কুলের ছেলে ভিনু লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন। তার আগে ভিনুর বাবা বলেছিলেন, তুমি ডাক্তার হবে। ভিনু বলেছিলেন, না। ভিনুর বাবা ছিলেন ডাক্তার। তবু ভিনু স্বাস্থ্যকর নবনগরে বৈদ্য-ঐতিহ্য দেখতে পাননি, দেখেছিলেন ক্রিকেটের ঐতিহ্য—রণজি, দলীপ, অমর সিং-এর দেশ। ভিনু সে দেশেরই ছেলে। ক্রিকেটের সেই রামরাজ্যে রাজাও ছিলেন গুণগ্রাহী। নবনগরের জামসাহেব চেষ্টা করে বালক ভিনুকে ১৯৩৬ সালে টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে খেলিয়েছিলেন। যে খেলা ভিনু দেখিয়েছিলেন,—লর্ড টেনিসন বললেন,—ভিনুর অবতরণ ঘটল পৃথিবীর ক্রিকেটে। অনুরূপ কথা বলেছিলেন ভিনু সম্বন্ধে বার্ট ওয়েন্সলি আর্থার গিলিগানকে কিছু আগে,— দেখে নিও, কয়েক বছরের মধ্যে ভিনু মানকদ নামে একজন ছোকরাকে

পৃথিবীর ক্রিকেট পাবে, চিরগৌরবের মধ্যে। ছেলেটি বল দিত বাঁ হাতে জোরে জোরে। ওয়েন্সলি বললেন, আমি তাকে আস্তে বল করতে শিখিয়ে এসেছি।

ভিনুকে ধীরে বল করতে শিখিয়েছিলেন ওয়েন্সলি, ইনিংসের প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন দলীপ সিং এবং দলে স্থান পাবার ব্যবস্থা করেছিলেন জামসাহেব। ভিনুর তিন গুরু ও সুহৃদ।

তারপরে ভিনু কি করেননি? রণজি ট্রফিতে তিনি নিজ দলের সুযোগ্য সেবক, বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলারে হিন্দু দলের প্রধান ধর্মযোদ্ধা, প্রদর্শনী খেলার সদাসঙ্গ আকর্ষণ এবং সরকারী ও বেসরকারী টেস্টে ভারত-পক্ষে আদি-অন্তিম ভরসা।

১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে ভিনু নিজেকে মেলে ধরলেন বলে ব্যাটে। হাজারের উপর রান এবং একশোর উপর উইকেট নিয়ে উক্ত সম্মানের একমাত্র ভারতীয় অধিকারী হলেন। ইংলণ্ড বলল ভিনুর বিষয়ে—একজন মহান অলরাউণ্ডার এবং বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ন্যাটা ধীর বোলার।

ব্রাডম্যান সবিস্ময়ে ভাবলেন, এত প্রশংসা! যেন বড় বেশী মনে হচ্ছে! দেখা যাক্ অস্ট্রেলিয়ায় ভিনু কি করে?

বিশ্ব-ক্রিকেটে ভিনু ১৯৪৬ সালেই প্রথম সারিতে আসন নিয়েছেন। পরের বছর ভারত-সন্তানেরা যখন অস্ট্রেলিয়ার জাহাজ ধরল, তখন গ্রীষ্ম-দেশের দুর্বলতর সহযোগীদের সম্বন্ধে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় আগ্রহের অভাব ছিল না, বিশেষত 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ন্যাটা বোলারকে' দেখবার জন্য। মার্চেণ্ট আসছেন না, অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরবর্তী প্রধান আকর্ষণ ভিনু মানকদ। অস্ট্রেলিয়ার আকাশে কোনো আচ্ছন্নতা নেই, মাটিতে নেই ছলনা। সে মাঠে বল ঘোরাতে মাথা ঘুরে যায়। ভারতীয় ভিনুর বল ঘুরবে, না মাথা ঘুরবে—অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৪৭ সালের বড় জিজ্ঞাসা।

অস্ট্রেলিয়ায় মানকদ দলের সমস্ত বোঝা ঘাড়ে তুলে নিলেন। কারণ তিনি অলরাউণ্ডার। তার কম নন। তাই তাঁকে বল করে যেতে হবে অস্ট্রেলিয়ার কড়া জমিতে 'ব্রাডম্যান ও তাঁর আমুদে ছোকরাদের'

অ্যাডভেঞ্চারের বিরুদ্ধে, ফিল্ডিং করতে হবে নিজের বলে অদ্ভুত কৌশলে, ব্যাট করতে হবে মিলার-লিণ্ডওয়ালের বাম্পারের বিরুদ্ধে ; সবকিছু করতে হবে ভিনুকেই, যখন জামা ঘামে ভিজে সপসপ করছে, বল ঘষে ঘষে আঙ্গুলে রক্ত পড়ছে, সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে, হ্যাঁ তখনও।

তারপর ভিনু খেলে গেছেন। পৃথিবীর ক্রিকেটকে দিয়েছেন দ্রুততম দ্বৈত, মাত্র ২৩টি টেস্টে 'ডবল' (অর্থাৎ একশোর উপর উইকেট এবং হাজারের উপর রান), এবং পঙ্কজ রায়ের সহযোগিতায় প্রথম উইকেটের ব্যাটিং-এ বিশ্ব-রেকর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই টেস্টে দুটি ডবল সেঞ্চুরী করেছেন, সবচেয়ে বেশী টেস্ট উইকেট নিয়েছেন, সবচেয়ে বেশী টেস্টে ক্যাচ ধরেছেন, এক কথায় নিজ নামে পরিচিত করেছেন ভারতকে বিশ্ব-ক্রিকেটে।

টেস্টে দ্রুততম দ্বৈতকীর্তি করার পরে আমাদের দেশে এবং অন্য দেশেও একটি প্রিয় আলোচনা, —দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবার শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার কে ? কয়েকটি নাম পরপর এসে যায়,—মিলার, মানকদ, ওরেল, বেইলী। অধিকাংশ সমালোচক মিলারকে প্রথমে রেখে তারপরে রাখেন মানকদ, ওরেল, বেইলীকে পরপর। কে বড়, কে ছোট, এই আলোচনা সখের সমালোচকদের পক্ষে তারিয়ে চাখার বস্তু। বর্তমানে সে ফাঁদে ধরা দিতে চাই না। একটি কথা বিবেচ্য, অলরাউণ্ডার বলতে কি বোঝায় ?

ক্রিকেটের আলোচনা যাঁরা সামান্য কিছুও পড়েছেন তাঁরা জানেন, আলোচকেরা প্রথমে সতর্ক ক'রে দেন একটি বিষয়ে,—দেখো, ব্যাটসমান বল করতে পারলে, কিংবা বোলার ব্যাট করতে পারলে তাকে অলরাউণ্ডার বলো না যেন। দুটো বস্তুই কেবল করতে পারা চাই তাই নয়, করতে হবেও একসঙ্গে, এবং খাঁটি অলরাউণ্ডার দলে স্থান পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হবেন তাঁর কোনো একটি যোগ্যতার দ্বারাই,—বোলার হিসেবেও তিনি আসতে পারেন, ব্যাটসম্যান হিসেবেও পারেন।

এমন সুকঠিন যোগ্যতার দায় যদি অলরাউণ্ডারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে স্পেশালাইজেসনের পৃথিবীতে স্বভাবতঃই অলরাউণ্ডার বিরল হয়ে আসবে। আসবে কেন, এসেছে, এবং বেইলীর মত খাঁটি অল-

রাউণ্ডারের বিবেচনায় একমাত্র ভিনু মানকদ উক্ত কঠিন সংজ্ঞাটিকে সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন।

তবু জন আর্লট বললেন, ব্যাট ধরে ভিনু একটি রানও যদি কোনোদিন না করতেন, তাহলেও পৃথিবী-একাদশে তাঁর স্থান থাকবে ন্যাটা স্লো বোলার রূপে। লেসলি এমস্ ভিনুর বোলিং-এর প্রশংসা করে বলেছেন,—ভিনু উইকেট না পেলেও ব্যাটসম্যানকে দাবিয়ে রাখেন; ১৯৫১-৫২ সালে একমাত্র ওরেলই কানপুরে মাত্র একবারের জন্য ভিনুর উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন, যে ওরেল আগের মরশুমে ইংলণ্ডের বোলারদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিলেন একেবারে। এমসের মতে, ভিনুর মহিমার এই চরম প্রমাণ। ব্রাডম্যান 'অলরাউণ্ডার রূপে ভিনুর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ' করেও বোলার ভিনুর সম্বন্ধে বলেছেন,—"একথা সত্য, ইংলণ্ডের বৃষ্টিভেজা উইকেটে ভিনুর সাফল্য সমধিক। কিন্তু নিখুঁত উইকেটেও লেংথ ও ডায়রেকশনের উপর চমৎকার অধিকার, পেস ও ফ্লাইটের সুন্দর পরিবর্তন, রাউণ্ড দি উইকেট ও ওভার দি উইকেট,—উভয়ভাবে বল করাতে তাঁর সমমাত্রায় দক্ষতা সকল সময় সম্ভ্রম আকর্ষণ করে।" আমাদের বেরী সর্বাধিকারীও চোখ বুঝলেই ভিনুর বোলার চেহারাটি দেখতে পান, দেখতে পান—বলটিকে হাতে নিয়ে তার প্রতি ভিনুর ধ্যানস্থির নেত্রপাত, বল দেবার সচ্ছন্দ সংক্ষিপ্ত দৌড়ের পূর্বে বক্রতা ও উচ্চতা বিষয়ে বলের উদ্দেশ্যে শেষ মুহূর্তের অব্যক্ত নির্দেশজ্ঞাপন, ছুঁচেটোয় কোমল মর্দন, এবং তার পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিপক্ষকে সম্মোহিত করে তাদের বেঁধে ফেলার ও মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে আত্মনিয়োগ।

আবার আর্লটকে স্মরণ করি ভিনুর বোলিং-এর রূপ বর্ণনায়;—

"১৯৪৬ সালে ভিনু উত্তম ন্যাটা ধীর বোলার ছিলেন। প্রচুর ফ্লাইট দিতেন, এক এক সময় তা একঘেয়ে মনে হোত, উইকেট পেতেন অপেক্ষাকৃত দ্রুত বলে।......

"১৯৫২ সালের ভিনু মানকদ অনেক বড় বোলার। তখন ফ্লাইটে এসেছে অদ্ভুত অধিকার এবং প্রচলিত হড়কে-বেরিয়ে-যাওয়া বলের সঙ্গে

ঢুকে-আসা ধারালো বল মেশাতে পারতেন সুন্দরভাবে। ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করেন অসাধারণ কৌশলে—একটা বল দ্রুত ঢুকে গেল, পরেরটি থমকে রইল, তার পরেরটি উঁচুতে উঠতে উঠতে হঠাৎ নেমে পড়ল অসময়ে, এবং ব্যাটসম্যান সেটিকে ড্রাইভ করবার জন্য এগিয়ে এসেও নাগাল পেল না। সে বাস্তবিক এক অপূর্ব দর্শন, সে এক অপূর্ব বোলিং।"

তবু ভিনু মানকদকে 'গ্রেট' বোলার রূপে গ্রহণ করেননি অধিকাংশ সমালোচক। বিশেষত খেলোয়াড়-লেখকেরা। হাটন তো বোলাররূপে ভিনুর নাম করতে প্রায় ভুলে গেছেন এবং ব্রাডম্যান ১৯৪৭-৪৮ ভারতীয় দলের আক্রমণশক্তি বিষয়ে সংশয়প্রকাশ করে বলেছেন, ভারতীয় দল আক্রমণে দুর্বল, দলে কোনো ফাস্ট বোলার নেই, এমনকি প্রথম শ্রেণীর স্লো বোলার পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, ভিনু মানকদের নাম মনে রেখেও একথা ব্রাডম্যান বলেছিলেন। প্রশংসা করা সত্ত্বেও ব্রাডমান শেষ পর্যন্ত ভিনুকে 'প্রথম শ্রেণীর' ধীর বোলার বলতে চাননি। আমি সাধারণভাবে ভিনুর বোলিং সম্বন্ধে প্রায় কোনো আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়কে উচ্ছ্বসিত হতে দেখিনি। এর কারণ কি?

আমার মনে পড়ছে ভেরিটি সম্বন্ধে হাটনের অভিমত—ভেরিটি রোডসের তুল্য নন, কারণ রোডস আক্রমণ ছাড়া আর কিছু জানতেন না। অপর পক্ষে ভেরিটি কয়েকটি সমুদ্রপারে ভ্রমণের পর নিরাপদ নেতিপন্থার আশ্রয় নিতেন বহু সময়। উইকেট না পাও মেডেন আটকায় কে—ক্লান্ত ভেরিটির নীতি হয়ে দাঁড়াত সেই সময়। দিনের পর দিন বোলিং-এর বোঝা বইতে হয়েছিল বলে ভিনুকেও একই নীতি নিতে হয়েছে। ফলে তাঁর বোলিং-এর ধার মরে গিয়েছিল। প্রত্যেক দিনের উত্তেজনার পরিবর্তে ভিনু ভদ্রভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন।

ইচ্ছে করলে ভিনু ধারালো হতে পারতেন। কেবল যা হয়েছেন, তা হতে পারতেন না। থেমে যেতেন অনেক আগে। অন্তত এতখানি প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক খেলোয়াড় হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না। বহুমুখিতা প্রতিভার ঐশ্বর্যের দিক দেখিয়ে দেয়, আবার বহু ব্যয়ে রিক্তসম্পদ করে

ফেলে অল্পকালে। ভিনু বড় বোলার, আরো বড় বোলার হতে পারতেন যদি ইনিংসের সূচনায় ব্যাট ধরার উচ্চাশা না থাকত।

ভিনু মানকদের প্রতিভা ধনী ও গৃহিণী উভয়ই। প্রাচুর্যের কালে প্রতিভার গৃহিণীত্ব আমরা লক্ষ্য করি না, কিন্তু অভাবের সময় যিনি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার কৌশলে অভাবের শূন্যতা বুঝতে দেন না, তিনি গৃহের নির্ভর-ভিত্তি—গৃহিণী। ভিনুর ব্যাট যখন লেট কাটে অসমর্থ, তখন সোজাভাবে খাড়া থেকে বল থামাতে পারে। ভিনুর বল যখন মাটিতে পড়ে ঘুরছে না, তখন ফ্লাইট ও পেসের পরিবর্তনে ব্যাটসম্যানকে সংযত রাখে যথাসম্ভব। তাই অভাবনীয় মিলার কিংবা অসামান্য ওরেল না হয়েও ধীরচ্ছন্দ ভিনু মানকদ ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান অলরাউণ্ডার।

বিধিমার্গীয় ভিনুর জীবনে অরুণোৎসবের দিন এসেছিল। সেই চারটি দিন কি অসাধারণ ক্রিকেট-ইতিহাসে!

১৯৫২ সালের লর্ডস টেস্ট 'ভিনু মানকদের টেস্ট' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে, যদিও ভিনু পরাজিতপক্ষের।

রবার্টসন-গ্লাসগোর কলমে সহসা-দর্শনের উচ্চকিত উল্লাস: 'সে যেন এক অত্যুজ্জ্বল তারকা, জ্যোতির্বিদদের পূর্বপরিচিত, হঠাৎ স্বর্গীয় আলোকোচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ল অগণিত সাধারণ চক্ষুকে চমকিত ও অভিভূত করে।'

ভিনু মানকদ সেদিন যা দেখিয়েছিলেন, ক্রিকেটে খণ্ডকালীন ব্যক্তি-কীর্তির সেইটেই চরম শিখর বলে গৃহীত হয়েছে। অথচ ভিনু মানকদের চেয়ে বড় খেলোয়াড় পৃথিবীতে যথেষ্ট হয়েছে এবং ভিনুর দেশ ভারত ক্রিকেটে অগ্রণী নয়।

এইখানে দেখতে পাচ্ছি কৌতুকপ্রবণ বিধাতার একফালি হাসি আর ভিনুর অভিমানক্ষুব্ধ প্রতিজ্ঞা।

ভিনু বোধ হয় মনে মনে বলেছিলেন, দেখিয়ে দেব, প্রমাণ করব, প্রকাশ করব নিজেকে।

১৯৫২ সালে ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলে ভিনুকে মনোনীত করা হয়নি।

ভিন্নুর মত বোলার নাকি গণ্ডায় গণ্ডায় ভারতে মেলে। বিলেতের লোক শুনে ভাবল, ভারতের কি ভাগ্য!

ভারতের 'শূন্য' ভাগ্য প্রমাণ হতে দেরী হোল না। ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্ত হাতজোড় করে দাঁড়ালেন হ্যাসলিংডন ক্লাবের দরজায়.—ভিন্নুকে দাও। ভারতের লাগি আমি ভিক্ষা মাগি—পঙ্কজ গুপ্ত করুণ নিনাদে প্রার্থনা জানালেন।

দ্বিতীয় টেস্টে ভিন্নু এলেন। লর্ডসের সেই টেস্ট। শনিবারের বেসামাল লীগ-ক্রিকেট থেকে একজন প্রবেশ করছে ক্রিকেটের পূত মক্কায়। ভিন্নু মানকদের পেশীতে এবং শিরায় একটি মৌন উচ্চারণ—দেখিয়ে দেব। কাকে, ভারতকে না ইংলণ্ডকে?

চারদিন ভিন্নু খেলে গেলেন। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবীণ আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টার, ক্রিকেটের বিখ্যাততম বিচারক। অতি দীর্ঘ দিন মাঠে খেলোয়াড়দের সঙ্গে রৌদ্রজল গ্রহণ করেছেন।

চেস্টার অকুণ্ঠে বলেছেন, এ জিনিস তিনি দেখেননি।—

"আমি মনে করতে পারি না ১৯৫২ সালে লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ভিন্নুর সর্বাত্মক কীর্তির চেয়ে বড় একক কীর্তি কখনো দেখেছি। প্রথম ইনিংসে ৭২ রান করার পরে ভিন্নু দলের সকলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ওভার—৭৩ ওভার বল করে উইকেট পেলেন ৫-১৯৬, ইংলণ্ডের রানসংখ্যা সে ইনিংসে ৫৩৭। তারপর ভিন্নু ভারতের পক্ষে ইনিংস শুরু করে ১৮৪ রান করলেন, যাতে হাজারের সহযোগিতায় তৃতীয় উইকেট-স্ট্যাণ্ডের ভারতীয় রেকর্ড হোল ২১১ রানের। এও যথেষ্ট হোল না।

"এখন ইংলণ্ডের জয়ের জন্য মাত্র ৭৭ রান দরকার, চতুর্থ দিনে যার জন্য প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় ছিল, তখন ভিন্নু এক ওভার পরেই বল দিতে শুরু করে গোলাম আমেদের সহযোগিতায় হাটন ও সিম্পসনকে ঐ সময়ের মধ্যে মাত্র ৪০ রানে নিবৃত্ত রাখলেন। যদি সে রাত্রে ঝড়বাদল হোত, তাহলে ইংলণ্ডের পক্ষে সে খেলা জেতা সম্ভব হোত না। পরদিন সকালে যথারীতি বল করতে আরম্ভ করে মানকদ শেষ ওভার পর্যন্ত বল করলেন—সব

জড়িয়ে যা সহনক্ষমতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত, বিশেষ করে যেহেতু সেই খেলাটি ভিন্নুর সফরকারী দলের পক্ষে প্রথম খেলা। ঐ খেলার সম্বন্ধে আমার স্পষ্টতম স্মৃতির একটি হোল, মিডল স্টাম্পের বল মানকদ স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারীতে থেঁতলে পাঠাচ্ছেন।"

ইংরেজেরা শুনেছি বচনে সংযত। কতখানি অসংযত ভিন্নু সম্বন্ধে প্রশস্তি-বাক্যগুলোয় চোখ বুলোলে বোঝা যাবে। স্তুতিবচনগুলির কিছু অংশ পড়ে আমার তো একবার মনে হয়েছিল,—এ হোল লেখার জন্য লেখা। লেখকেরা লিখতে চান এবং বস্তুর সঙ্গে বাষ্প পুরে ফাঁপিয়ে তোলেন অকারণ। পরের মুহূর্তে নিজের সিদ্ধান্তের অহমিকা নিজের কাছে ধরা পড়ল। একজন মানুষ যখন কোনো কিছুকে তাঁর সর্বোত্তম দর্শন বলে ঘোষণা করছেন, তখনো যদি তিনি উচ্ছ্বসিত না হন তো হবেন কখন? বহু যুদ্ধের সেনা ও সেনানী আর্থার গিলিগানের কণ্ঠ বেতারে তরঙ্গিত হয়েছিল—"১৯০২ সালের পর এই হোল টেস্ট ক্রিকেটে সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকস কীর্তি। ভিন্নু মানকদের এই যথার্থ স্মরণীয় সাফল্যে ক্রিকেট সমৃদ্ধতর হোল। সাবাস ভিন্নু, তুমি যা করেছ তার জন্য ক্রিকেট-পৃথিবী গৌরবান্বিত। ভিন্নু, তুমি আমার বীর।" দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর তুই প্রধান বোলারের অন্যতম আলেক বেডসার (লিণ্ডওয়াল অপরজন) স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, তাঁর দেখা সবচেয়ে মাদকতাময় ইনিংস এইটেই। সমালোচক চার্লস ব্রে আরো অগ্রসর হয়ে কিছুদিন পরে বললেন, "শীতল আনন্দহীন ইংলণ্ডের শীতের মাঝখানে বসে আমি যেন এখনো সেই ঝলসানো ব্যাট, ছুটন্ত বল, শান্ত অহমিকা-শূন্য মহান খেলোয়াড়টির আক্রমণাত্মক খেলা দেখতে পাচ্ছি, যার একমাত্র তুলনা ব্রাডম্যান তাঁর শ্রেষ্ঠরূপে। আমি অনেক বড় খেলোয়াড় দেখেছি, যাঁরা বলে অবিরত জোরে আঘাত করায় বিশ্বাস করেন। মনে আসে সহজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হেডলি, ওরেল, উইকস্, অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যান, ম্যাককেব, মিলার, ইংলণ্ডের চ্যাপম্যান, হেনড্রেন, হ্যামণ্ড, লেল্যাণ্ড; কিন্তু পিছনের দিকে তাকিয়ে আমি তাঁদের একজনের একটি ইনিংসও স্মরণ করতে পারছি না, যা মানকদের অবিস্মরণীয় ইনিংসকে

অতিক্রম করতে পেরেছে।" এবং সুবিখ্যাত লেসলী এমস সাক্ষ্য দিলেন,—"যখন দ্বিতীয় ইনিংসের শেষে ভিনু প্যাভিলিয়নে ফিরছেন, তখন তিনি যে জনসম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তার থেকে বড় কিছু অন্য কোনো ক্রিকেটার, এমন কি স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানও পেয়েছেন বলে মনে করতে পারি না।"

খেলা শেষে বেরিয়ে আসছেন ভারতীয় সাংবাদিক। এক বৃদ্ধ তাঁর মেয়ের সঙ্গে ফিরছেন। বৃদ্ধটি হঠাৎ ভারতীয় সাংবাদিককে ডাকলেন মেয়ের মারফৎ। চোখ কুঁচকে ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করে বললেন, আপনি ভারতীয়, না?—হ্যাঁ।—আমাদের সঙ্গে আসুন না। তিনজনে ঢুকলেন রেঁস্তোরায়। তিনজনের জন্য পানীয়ের আদেশ দিলেন বৃদ্ধটি। সম্পূর্ণ অপরিচিতের এই আমন্ত্রণ সম্বন্ধে ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্কোচকে তিনি গ্রাহ্যই করলেন না। পানীয় আসতে গ্লাসটি হাতে তুলে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠলেন। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমি রণজিকে দেখেছি, দলীপকে দেখেছি, প্যাটকে (পাতৌদিকে) দেখেছি,—But here's to Vinoo Mankad!

ক্রিকেটের যদি কোনো ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব হয়, ঐখানে ভিনু তা করেছেন। ক্রিকেট-দেবতা তাঁর মহাবীর দাসকে বঞ্চিত করেননি। অলিম্পিয়ান পর্বত থেকে তারপর ভিনু নেমে এসেছেন সমতলে। সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বল করেছেন, ব্যাট করেছেন পুরোনো রীতিতে। আমার কেবল একটি বাসনা আছে। যদি কোনো দিন ভিনুর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ হয়, জিজ্ঞাসা করব, সেদিন তাঁর সেই বোধিদিবসে তাঁর মধ্যে কি ভর করেছিল, তিনি কি বোধ করেছিলেন?

না, ভিনুকে আমি সে প্রশ্ন করতে চাই না। ভিনু তা কখনো বলতে পারবেন না, বলা সম্ভব নয়। মহান প্রেরণা বচনের অতীত। মিথ্যে উত্তরে আমার কি হবে!

ক্রিকেটের পঞ্চমাঙ্ক

ইডেন গার্ডেনে অস্টেলিয়ার সঙ্গে ভারতের পঞ্চম টেস্ট

২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬০

"মধ্যাহ্নে আঁধার"

প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ, ইডেনে পূর্ণকুম্ভ ক্রিকেটের। এবারের মত পূর্ণাহুতিও। ২২শে জানুয়ারী রাত একটার সময় ইডেন গার্ডেনের পাশে দাঁড়িয়ে। কোন্ এক প্রত্যাশায় গভীর রাতে দলে দলে মানুষ সার দিয়ে ঘিরে রয়েছে—যেন্ কোনো প্রাচীন দুর্গের চারপাশে। দুর্গের মতই দেখাচ্ছিল ইডেন গার্ডেনকে। তার চারপাশে আগামীকালের প্রতীক্ষা। মানুষগুলো বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে। অনেকেই আগুনের ধুনিকে ঘিরে। শীতের রাতে কাঠের টুকরো আর পাতা দিয়ে জ্বালানো আগুনে চারিদিক কেমন রহস্যময়। কখনো দপ্‌দপ্ করে শিউরে উঠছে আগুনের শিখা, পাশে শুয়ে থাকা কুকুরগুলো গা গুটিয়ে নিচ্ছে, লাল আভায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষগুলোর কালো মুখ, চুল আর চোখের তারা। ২২শে জানুয়ারীর বিচিত্র একটি রাত্রি। আগামীকাল। আগামীকাল ২৩শে জানুয়ারী, নেতাজীর জন্ম দিবস। আগামীকাল ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট। ক্রিকেটের সেই পঞ্চমাঙ্কে আছে কি? সারা ভারতের ক্রিকেট-নাট্য-রসিকেরা অপেক্ষা করে আছে শেষ অঙ্কের অভাবনীয়ের জন্য। সেই রসিকদের একটা অংশ দু'দিন দু'রাত ঘিরে আছে ইডেন গার্ডেনকে, মাঠে প্রবেশের সাধনায়। যে নাটক অভিনীত হবে, সে কি ভারতের পক্ষে মিলনান্ত না বিয়োগান্ত? ২২শে জানুয়ারী রাত্রের বহু জিজ্ঞাসা।

২৩শে জানুয়ারী সকাল আটটার আগেই বাড়ীতে নেতাজীর ছবিতে ফুলের মালা পড়েছে, কারণ সকাল সকাল মাঠে পৌঁছতে হবে। আমার

মহাভাগ্য, পকেটে পাঁচদিনের প্রবেশপত্র আছে। রাস্তায় বেরিয়ে জহর-কোটের ভিতরে বুকপকেট টিপে দেখি, না টিকেট ঠিকই আছে। আগের দিন রাত্তিরে টিকেট পেয়েছি। যিনি দিলেন, রসিকতা করে বললেন, দেখবেন, কেউ যেন জানতে না পারে, তাহলে খুন হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। গোটা কলকাতা সহর একখানি টিকেটের জন্য বেঁচে আছে। পকেটমারেরা ভেবেছিল, নিশ্চয় বহুমূল্য কিছু আছে বুক পকেটে, এতবার বুকে সভয়ে হাত দিয়েছি। যখন মাঠে ঢুকলুম, তখন দশটা বেজে পনেরো, মাঠের ভিতরে এবং বাইরে জনসমুদ্র, মাঝখানে কেবল কাঠের পাঁচিল, যে কোনো মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে পারে। মাঠে ঢুকেই মনে মনে অট্টহাস্য করে উঠলুম। দৈনিক টিকেটের গেট বন্ধ হয়ে গেছে। মাঠের ভিতরে চল্লিশ হাজার ভাগ্যবান। বাইরে আরো বহু হাজার! তারা চীৎকার করছে।

—ওরা চেঁচাচ্ছে কারা?—যারা টিকেট পায়নি? আমি কিন্তু একখানা পেয়েছি। হাঃ হাঃ হাঃ। অসাম্য কি মধুর!

নিজের আসন খুঁজে নিয়ে চারপাশে তাকালুম। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের সন্ধ্যেবেলাটা চেষ্টা করেও মনে আনতে পারছি না। এক বছর আগেকার ব্যাপার। সে দিন যেন দেখেছিলুম ইডেন গার্ডেনের ধারে শাখা-কঙ্কাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণহীন এক বৃক্ষকে। সভয়ে প্রশ্ন করেছিলুম, বৃক্ষ-কঙ্কালের বক্তব্য কি? সেটা ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিন, কানহাই যে দিন ভারতের নিরস্ত্র আক্রমণের সৌভ্রাত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করে ২০৩ রান করেছিলেন। আউট হন নি, পরদিন আক্রমণের জন্য! ১৯৫৮-৫৯ সালের অশুভ ক্রিকেট-বছর। অপমান আর লাঞ্ছনার তিক্ত অধ্যায়। অপমানের রেখা সমুদ্র লঙ্ঘন করে ইংলণ্ডে পৌঁছল কয়েক মাস পরে। 'প্রথম শ্রেণীর কাউন্টি দলের সমান'—ভারতের জন্য এ সম্মানও জুটল না ইংলণ্ডে। মাইনর কাউন্টি ভারতকে হারাল। পাঁচদিনের টেস্ট খেলা দিয়ে ভারতকে খাটাতে নিষেধ করলেন ভারত-প্রেমিকেরা। ইংলণ্ডের ফিরতি জাহাজ ভারতের কূলে ভিড়তে না

ভিড়তে—আবার ক্রিকেট! অস্ট্রেলিয়া আসছে, ভারতের সঙ্গে পাঁচদিনের টেস্ট খেলবে পাঁচটি। আসছে তাদের গোটা দল নিয়ে, ভারতের জন্য নিশ্চয় নয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেই। অস্ট্রেলিয়া পিটার মে'র অহঙ্কৃত ইংলণ্ডকে ধূলো মাঠে বসিয়ে দিয়েছে। সেই অস্ট্রেলিয়া। এসেই পাকিস্তানকে হারাল চূড়ান্তভাবে—তিন টেস্টের দু' টেস্টে। মাত্র এক টেস্টে সময়ের অভাবে হারাতে না পারার লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বেনোড ভারতকে সমঝে দিলেন, ভারতভায়া, আগামী বছর পাকিস্তানের সঙ্গে তোমাদের খেলতে হবে—সাবধান। নিশ্চয়! যথারীতি দিল্লীর প্রথম টেস্টে ভারত হারল শোচনীয়ভাবে ইনিংসে। তখন সারা ভারতে ক্রিকেট সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট বৈরাগ্য। কানপুরে, বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে, কলকাতায়, ছাপা এবং না-ছাপা সিজন্ টিকেট হাওয়ায় উড়ছে ছেঁড়া কাগজের মত। তারপর হঠাৎ কানপুরে—'কী অপরূপ রূপে বাহির হইলে জননী।' কানপুরে অস্ট্রেলিয়া তচ্‌নচ্ হয়ে হেরে গেল। ভারতের 'বন থেকে বেরোল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।' উত্তর-প্রদেশের কারখানা-সহর অনভিজাত কানপুর সহসা ঐতিহাসিক সহর হয়ে উঠল। ইতিহাসের পণ্ডিত এগিয়ে এসে বললেন, কানপুরের অন্য ঐতিহ্য না থাক, বিদ্রোহের ঐতিহ্য আছে—সিপাহী বিদ্রোহের কথা মনে রেখো। নানা সাহেবের বিজয়ী অবতারের নাম জাস্যু প্যাটেল।

চাকা ঘুরে গেল। বোম্বাই টেস্টে সহজভাবে ড্র করল ভারত, যে ভারত পতনে মহান। আমেদাবাদে অস্ট্রেলিয়ান বোলিং-এর বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারল ভারতের তরুণ ছোকরারা। আমরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, অস্ট্রেলিয়ার হোল কি? আমাদের কি এত উন্নতি হয়েছে রাতারাতি? পেয়ে গিয়েছি কি রানের শস্যক্ষেত্র, উইকেটের ঝরাপাতার অরণ্য, কিংবা ফিল্ডিং-এর মৃগয়াপ্রান্তর? না কি অস্ট্রেলিয়ানরা নিজেদের ভুলেছেন, ভুলেছেন যে, মাত্র কয়েকমাস আগে দুর্ধর্ষ ইংলণ্ডকে তাঁরা ধ্বংস করে দিয়েছেন; সে বীরকাহিনী কি তাঁদের মনে নেই, পার্লহারবার ধ্বংসের মত সেই ব্যাপারখানা? বেনোডের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ানদের ছুটন্ত বাহিনীর সামনে পড়ল ভারতের গোরুর গাড়ী—আশ্চর্যের ব্যাপার, বিজয়বাহিনী

থেমে গেল। সিনিক মন দিয়ে আমরা ভাবলুম—এটা ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা মাত্র।

অস্ট্রেলিয়ানরা ভারতকে মাদ্রাজে রীতিমত হারাল। সুপরিকল্পিত অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণের রূপ দেখা গেল সেখানে। টসে জিতলে কিভাবে সুরু করে কিভাবে শেষ করবেন, সবটা ছককাটা ছিল বেনোডের মনে। ছকমত কাজ হোল। রামচাঁদ টসে হারলেন, বেনোড জিতলেন। হিসেব মত খেলাতেও জিতলেন। অস্ট্রেলিয়ান শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা গেল। তবু ক্রিকেটের জ্বর হু হু করে বাড়তে লাগলো ভাবাবিষ্ট কলকাতায়। লোকে একটা কথা শিখে নিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ানরাও হারে। ভারতের জয়কে 'ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা' বলার মত দুঃখবাদকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয় কেউ। কলকাতায় ভারত হয়ত হারবে, হারুক না, খেলায় হারজিত আছে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা কখনো কখনো রুখে দাঁড়াতে পারে—পেরেছে। কলকাতায় যদি সেই প্রতিবাদের জীবনকে দেখা যায়? কানপুরের ধূলো মাঠ ভেদ করে যে 'মুর্‌তি' উঠেছে, সে কি ধূলোয় মিশিয়ে যাবে এত সহজে?

২৩শে জানুয়ারী সকালে হাজার হাজার মানুষের অস্পষ্ট চিন্তায় ছিল এই কথাটাই। শোনা গেল অমরনাথ বাজি ধরেছেন, এই ম্যাচে ভারত জিতবে। অমরনাথ জীবনে বহু বাজি হেরেছেন, অন্তত এইবার জিতুন।

ভাল করে মাঠের দিকে তাকালুম। মাঠে আসেনি কে? সেই বরবেশী ব্যক্তিকে মাঠে পাওয়া গিয়েছিল। ভাবী জামাই বিয়ের দাবীর মধ্যে ঘড়ি, বোতাম, আংটির সঙ্গে একখানা ৩৫৲ টাকা দামের সিজন্ টিকেট যোগ করে দিয়েছিল। বরকর্তা হাওড়ার কালীবাবুর বাজার থেকে কিনেছেন উৎকৃষ্ট দই, এবং কালোবাজার থেকে ক্রিকেট টিকেট। ছেলেকে মাঠ থেকে বরাসনে নিয়ে যাওয়ার কথা।

সেই ছেলেটিও এসেছে মাঠে, যে টেস্ট পরীক্ষার আগে ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি করতে বাবার ধমক খেয়ে মায়ের কাছে হাত পা নেড়ে বলেছিল,—'টেস্ট মে কাম এণ্ড টেস্ট মে গো, বাট অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট উইল নেভার কাম।'

এসেছেন দোকানের আলুর কারবারী। ছ'দিন লাইন দিয়েছেন আলুর কারবার ছেড়ে। কনডাক্টারের খেলা তিনি দেখবেনই। তাঁকে বোঝানো গেলো না, ভারতীয় ব্যাটিং-এর 'মুখ'-রক্ষা করেন যিনি, তাঁর নাম 'কনডাক্টার' নয়—কণ্ট্রাকটার। মাথা নেড়ে বললেন, বাবু মশায়, আপুনাদের রসিকতা আমি বুঝি, বাসে কণ্ট্রাকটার বলেছিলুম বলে আপুনারা হেসেছেলেন। আর সে ভুল করি?

এসেছেন নানা ভদ্রমহিলার মধ্যে সত্যকার ক্রিকেট-রসিক সেই ভদ্রমহিলা। ল্যান্সডাউন রোডের শ্রীমতী সুনন্দা রায় খেলা শেষ হতে লিখে পাঠাবেন সংবাদপত্রে সহাস্য তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে—

"মেয়েদের ক্রিকেট-খেলা দেখা নিয়ে হাসিঠাট্টা হয়েছে, সরস কবিতাও লেখা হয়েছে। তবু বেরিয়ে পড়লাম টেস্ট ম্যাচ দেখতে। মাদ্রাজ টেস্টের বেতার ধারা-বিবরণী শুনেছি রেডিওটি খুব মৃদু করে চালিয়ে, যন্ত্রটার গায়ে কান ঠেকিয়ে, পাছে শাশুড়ী ঠাকরুণের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়। কলকাতা টেস্টের বেলা তস্য পুত্রসহ 'মা আসি' বলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চললাম। প্রগতির বিকারই বলুন, আর যাই বলুন।

"সীটে বসেই দেখি সামনে প্রকাণ্ড অক্ষরে বিস্তীর্ণ মণ্ডপশীর্ষ জুড়ে বোরোলীন ফেস-ক্রীমের বিজ্ঞাপন (আমিও জিনিসটির এক দফা বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেললাম নাকি?)—নিঃসন্দেহে মহিলাদেরই জন্য বিশেষ করে। তবে তো এই উৎসবে মহিলাদের প্রবেশ নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষিত ও স্বতঃসিদ্ধ।

"তদুপরি কলকাতার টেস্ট ম্যাচ উদ্বোধন করলেন একজন মহিলা—রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। এর পরেও অনধিকারচর্চার অপবাদ?"

আরো একজনকে দেখতে পাচ্ছি—সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ, একটি গৈরিকের শুচিতাকে। একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। খেলার মাঠে? হয়ত শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র, যৌবনের উপবনের স্মৃতির টানে, কে জানে!

মাঠ জমজমাট। মাঝখানে গোলাকার সবুজ গালচে পাতা। পুরাতন সম্পদ,—বহু চেষ্টার সৃষ্টি—পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীন ক্রিকেট-মাঠ, ইডেন

গার্ডেন। চারপাশে মানুষের গ্যালারি। নানা রঙের কাপড়ে মোড়া। হাস্যে লাস্যে রঙ্গে ব্যঙ্গে রঙিন। মাণিক্যের মতো তার মাঝে জ্বলছেন মাণিক্যদর্শিনীরা। খেলার জন্য সবাই প্রস্তুত।

এই সময় মাঠের সবাই একটি মেয়েকে খুঁজছিল, যে আব্বাস আলী বেগকে ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে যাবার আগে দুই গণ্ডে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আব্বাস আলী গালের লিপস্টিক মুছে চলে গেছেন অক্সফোর্ডে। আব্বাসের অনুরূপ সম্বর্ধনালাভে উৎসুক হয়েছেন অপর কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় একথা বলা বে-আইনী, কিন্তু কলকাতার দর্শকের একটা অংশ একই টিকেটে ক্রিকেট-টেস্ট এবং 'প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য' চিহ্নিত থিয়েটারটি দেখবার জন্য উৎসুক ছিল।

সকলে প্রস্তুত—প্রস্তুত স্টেডিয়াম-স্বর্গাসীন দৈনিক চার, প্রস্তুত প্যাগোডাপার্শ্বের মধ্যবিত্ত পঁচিশ, ও প্যাভিলিয়ান-প্রান্তের সুতৃপ্ত পঁয়ত্রিশ। প্রস্তুত কেরাণী, অফিসার, ছাত্র, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, পুলিশ, আহূত অতিথি এবং কিছু গোপন পথের অনাহূত উৎসাহী। কেবল রোদে পিঠ দিয়ে গালগল্প করছে পিচের ধারে মালীরা। এমন খেলা তারা অনেক দেখেছে। আসল জিনিসের তারা রচয়িতা—ঐ রহস্যময় জমিখণ্ডটুকুর—যার নাম পিচ। কেবল তারাই উদাসীন।

রামচাঁদ, বেনোড গেলেন টস করতে। 'অটোগ্রাফার' ফটোগ্রাফার সকলে ছুটল মাঠের মধ্যে। পাহারাদার এন. সি. সি. ছোকরাও ক্যামেরা খুলল। একটা গোল চাকতি বুড়ো আঙুলের টোকা খেয়ে উপরে উঠল। একটি করুণ প্রার্থনা মর্মরিত হোল— দেখো মা দেখো, তোমায় নিজের হাতে স-পাঁচ আনা পুজো দিয়ে আসবো। অখণ্ড মণ্ডলাকার অবতীর্ণ হলেন ভূমিতে। রামচাঁদ সহাস্যে জনতার দিকে হাত তুললেন। বাতাসে দুলছে মহাকরণের উপরে জাতীয় পতাকা। প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনিতে মাঠ ফেটে পড়ল। ভারত টসে জিতেছে।

কলকাতার দর্শক মাতোয়ারা হয়ে হাততালি দিচ্ছে এগারজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়কে। প্যাভিলিয়ানের গুহামুখ থেকে শ্বেতধারা ছড়িয়ে পড়ছে

সবুজ মাঠের উপরে। ক্রিকেটের সুন্দর দৃশ্য। সকলে বলছে অস্ট্রেলিয়ান ভায়ারা, তোমাদের ফিল্ডিং দেখতে অপূর্ব। আজ কাল গোটা ছুদিন যদি তোমাদের ফিল্ডিং কসরত একটানা দেখতে পাই মন্দ হয় না। প্রথমেই অস্ট্রেলিয়ানদের ফিল্ডিং দেখাবার সুযোগ দিতে রামচাঁদের প্রশংসায় মুখর সকলে। টসে জিতবার জন্যই রামচাঁদকে ক্যাপ্টেন করা উচিত। রামচাঁদ টসের দিব্যদ্রষ্টা। কলকাতার দর্শক দেশপ্রেমে অধীর। তারা অস্ট্রেলিয়ানদের ভালবাসলেও ভারতকে কিছু বেশী ভালবাসে। তারা যে অস্ট্রেলিয়ানদের ভালবাসে তার প্রমাণ দিতে বেনোডের হাতের ব্যাট স্মৃতিচিহ্নরূপে গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারে খুব নিন্দা হয়েছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারটি ঘটেনি। যদি ঘটতও, এটা নিশ্চয় চুরি নয়। এ হল ভালবাসার অত্যাচার। আমাদের ভালবাসার ধরণই ঐ। শ্রীযুক্ত বেনোড তো অল্পে ত্রাণ পেয়েছেন। নচেৎ গুরুর প্রতি ভক্তিবশত তাঁর জীবৎকালেই তাঁর পবিত্র কেশ উপড়ে নিয়েছিল ভক্তবৃন্দ, এমনও শোনা যায়।

চীৎকার ও হাততালি উত্তাল হয়ে উঠে—ব্যাট হাতে ছুজন ভারতীয় মধ্যমাঠের রণক্ষেত্রপানে। আনন্দের চীৎকার সহসা সংশয়ে ভেঙে পড়ে। একি—নামছে কারা? কণ্ট্রাকটারকে ঠিকই বোঝা যাচ্ছে। তার সঙ্গে কে? অমন মিশকালো রঙ তো রায়ের নয়? ফর্সা বেঁটে মোটা কলকাতার আদরের ছেলে রায়ের কি হোল? শিরদাঁড়া সোজা করে সবাই ভালো করে বসে। একটু আগে বেঞ্চে বসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে রাগারাগি হয়েছিল। 'এক বেঞ্চে সাতজন? ইম্‌পসিবল্। ফিজিক্যালি ইম্‌পসিবল্!'—চেঁচিয়ে উঠেছিলেন 'টাইটম্বুর' এক ব্যক্তি। একটি মিছরির ছুরির গলা শুনেছিলেন তিনি,—'মশাই, কর্তৃপক্ষেব ইচ্ছা আপনি ওটা স্পিরিচুয়্যালি পসিবল্ করুন।' সে সব চুলোয় যাক, পঙ্কজের হোল কি? তবে কি বসিয়ে দিলে? কদাপি না। একটু আগেও তো পঙ্কজ প্রাকটিশ করে গেছে। গলায় পাকানো চাদর, ধুতি-পাঞ্জাবি-কোঁচা-জড়ানো কলকাতার বনেদি বাবুর মত সুপরিচিত ব্যক্তিটি পঙ্কজের মাথায় স্নেহে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে গেছেন। সেই নিয়ে তামাশা করলেও বাঙালী পিতার স্নেহ

সকলের মনকে স্পর্শ করেছে। কলকাতায় পঙ্কজ আবার ভাল খেলবেন সকলে আশা করেছে। পঙ্কজ এমন কিছু খারাপ খেলেন নি যে, তাঁকে বসিয়ে দেওয়া যায়। এই সিরিজেই তাঁর ৯৯, ৫৭,—এই সব সেরা ইনিংস ভুলে যাবার মত অকৃতজ্ঞ হবেন নির্বাচকেরা? ইতিমধ্যে বুঝি কুন্দরাম নয়নের মণি হয়ে উঠেছে? কিংবা কলকাতার বাতাস এত ভারী মনে হোল যে, বল সুইঙ্গ করাতে সুরেন্দ্রনাথকেও খেলাতে হবে দেশাইয়ের সঙ্গে? তাই যদি হয়, গোপীনাথকে বাদ দাও না কেন পঙ্কজের বদলে? 'পঙ্কজদাকে যদি বসান হয়'—স্পোর্টিং ইউনিয়নের তেজী সমর্থক ছোকরাটি চেঁচিয়ে উঠল,—'মাঠে ঢুকে পড়ব। নো পঙ্কজ নো টেস্ট।'

না নিশ্চয় বসছেন না। অল্প আগে রাজ্যপালিকার সঙ্গে এক সারিতে বসে 'প্রবীণ' পঙ্কজ ছবি তুলিয়েছেন। কলকাতায় শেষ টেস্টে অন্ততঃ অধিনায়কত্ব-বঞ্চিত পঙ্কজকে স্থান-বঞ্চিত করা হবে না। পঙ্কজ খেলবেন ওয়ান ডাউন। ও জায়গাটা খালি আছে, উমরিগর নেই, বেগ চলে গেছেন। তাছাড়া নতুন কাউকে গোড়ায় সুযোগ দেওয়া দরকার। কুন্দরামের ধৈর্য না থাকলেও আক্রমণ আছে। যদি কিছু ধৈর্য আনতে পারে—ঐ আক্রমণের মনোভাব সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। দলের সূচনায় একজন মার্চেন্টের সঙ্গে একজন মুস্তাককে চাই। কে জানে পঙ্কজের পরামর্শমতই হয়ত এমন করা হয়েছে। 'না, পঙ্কজ ঠিকই খেলছে, এখন কণ্ট্রাকটার-কুন্দরামের খেলা দেখো'—সৌম্য প্রৌঢ় ব্যক্তি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন।

তাই ভাল, খেলা দেখা যাক, দেখা যাক বিলেত-ফেরত কণ্ট্রাকটারকে, এবং বোম্বাই-ক্রিকেটার কুন্দরামকে। বিলেতের মার্জনা কণ্ট্রাকটারের প্রভূত উন্নতি করেছে। পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ প্রথম উইকেটে বোলারের যাতনা, ভারতের কণ্ট্রাকটারও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই মুহূর্তে যদি পৃথিবী-একাদশের দুজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান বাছতে হয়—ডান হাতের হানিফ এবং বাম হাতের কণ্ট্রাকটারকে এগিয়ে দেওয়া যাবে। মার্চেণ্ট, হাজারে, ভিনু এবং গুপ্তের পর পৃথিবী-একাদশের ট্রায়াল খেলায় পাঠাবার মত ভারতীয়ের নাম পাওয়া যাচ্ছিল না। কণ্ট্রাকটার অন্ততঃ

প্রাথমিক মনোনয়নের অধিকারী, এই বছরের ফর্মে। কুন্দরাম কণ্ট্রাকটারের সহযোগী। খেলার স্বভাবে যতখানি বিপরীত হওয়া যায়।

ডেভিডসনের মুখোমুখি দাঁড়ালেন কুন্দরাম। কলকাতার পঞ্চম টেস্টের প্রথম বল কুন্দরামের ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে থমকে গেল। সমালোচকদের কলমে ডেভিডসন এখন পৃথিবীর এক নম্বর অলরাউণ্ডার। কুন্দরাম ভারতের নবাবিষ্কার। বিশাল প্রতীক্ষার পটভূমিকায় সাদা ফ্লানেলে ঢাকা কতকগুলি অভিনেতা। কলকাতার পঞ্চম টেস্ট সুরু হয়ে গেল।

দশটা চল্লিশ। হিণ্ডলেকারের অবতার কুন্দরাম ঝাঁঝালো হিট করলেন। দশটা পঁয়তাল্লিশ, কুন্দরামের সুন্দর মার বেরিয়ে গেল থার্ড ম্যানের পাশ দিয়ে। দশটা আটচল্লিশ—কুন্দরামের পুনশ্চ জোরালো হিট। পরের বলেও তাই। কুন্দরাম আমাদের কিনে নিয়েছেন। ক্রিকেটের গৌরবময় দিনের সুচনা হয়েছে। প্রথম উইকেটে খেলতে এসেও ভয় পায় না নবাগত টেস্ট ক্রিকেটার! এতদিন এই চেয়েছি। প্রথম বলে মুস্তাকের বাউণ্ডারী যেন অতিদূর বিস্মৃত স্বপ্ন। মুস্তাকের সুষমা না থাকলেও মুস্তাকের সাহস আছে খেলোযাড়টির। কুন্দরাম আমাদের হৃদয়রাজ্যের বিজয়ী ঘোড়সওয়ার। কুন্দরামের সহযোগী কে? সুবিখ্যাত কণ্ট্রাকটার। পরে তার দিকে তাকানো যাবে। অভাবের দিনের সাহায্যকারী সুদিনে বর্ণহীন। ঐ যে নিখুঁত নিপুণভাবে কোমর বেঁকিয়ে প্রতিটি বলকে সোজা ব্যাটে ধীরভাবে গ্রহণ করছেন কণ্ট্রাকটার—ও স্থিতির সৌন্দর্য উপভোগের মেজাজ নেই। কুন্দরাম রুচি পাল্টে দিয়েছেন। মাদ্রাজ টেস্টে দিনের শেষে কুন্দরাম নামার পরেই এক ওভারে তিনটে বাউণ্ডারী মেরেছিলেন শুনে শিউরে উঠেছিলুম। নিশ্চয় প্রাথমিক অস্বস্তি কাটাবার বেপরোয়া সাহস। আমার ক্রিকেটার বন্ধু আশ্বস্ত করেছিলেন,—কুন্দরামকে বোম্বাইয়ে দেখেছি, আর যাই হোক, তার লোহার বুকে ভয় নেই। সেকথা এখন বিশ্বাস হোল। সূচনার আধঘণ্টার আগেই ক্ষুধার্ত খেলোয়াড়। রানের জন্য অধীর। দৌড়ে ক্রীজে পৌঁছে হাতে ব্যাট চাপড়াচ্ছেন। ক্রুদ্ধ পশুর মাটিতে লেজ আছড়ানোর মতো মাঠে ব্যাট

ঠুকতে ঠুকতে আক্রমণে প্রস্তুত। কুন্দরাম একটা শক্তি, একটা সামর্থ্য। ভারতের আগামী অগ্নি।

দশটা উনষাট মিনিট। কুন্দরাম পেটাতে গিয়ে ব্যাট তুলেও মারলেন না। অপূর্ব! ত্যাগে ও ভোগে মহান খেলোয়াড়। এগারোটা বাজল। কুন্দরামের ব্যাট ঘুরে গেল চাবুকের মতো—সর্বনাশ! মাঠের হাওয়া বেড়ে গিয়েছে ব্যাটের ধাক্কায়—বল উইকেটকীপার গ্রাউটের হাতে। ভাগ্যে ব্যাটে লাগেনি! পরের বলটি কুন্দরামের প্যাডে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল। দলের রান মাত্র তের। তের'র প্রতি ভারতবাসীর বিলেতি বিদ্বেষ। ঘৃণা ও আশঙ্কাপূর্ণ চোখে সকলে চেয়ে থাকে স্কোরবোর্ডের দিকে। কন্ট্রাকটার ছু'রান করে তের'র বিভীষিকা কাটালেন। এগারোটা বেজে পনেরো, স্লিপের উপর দিয়ে কুন্দবামের খোঁচানো বল লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পরেই বিপজ্জনক খুচরো রান। ভেরি গুড, ভেরি ব্যাড,— একসঙ্গে শোনা গেল। কন্ট্রাকটার মাটিতে ব্যাট ঘষে দৌড দিয়ে উইকেট বাঁচালেন। এগারোটা ষোল মিনিটের সময় মাঠের সবচেয়ে আনপপুলার খেলোয়াড়ের নাম কুন্দরাম। শনিবারের ক্রিকেট খেলছ নাকি - ইয়ার্কি? দেখা যাক কন্ট্রাকটাব কি করে। এগারোটা কুড়িতে এলেন লিণ্ডওয়াল।

লিণ্ডওয়াল দর্শকদের সংবর্ধনা পেলেন। দর্শকেরা চাইল ভারতের উইকেট খোয়া না গিযেও লিণ্ডওয়াল যেন উইকেট পান। লিণ্ডওয়াল একটা ট্যাণ্টেলাসের যন্ত্রণাবোধ করছেন। বেডসারের রেকর্ডের নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়েও লিণ্ডওয়াল কিছু করতে পারছেন না। হাজার মাইল পথ ভেঙ্গে মন্দিরের সামনে এসে পক্ষাঘাত হলে যা হয়, লিণ্ডওয়ালের সেই অবস্থা। লিণ্ডওয়াল ভাবছেন শেষ সুযোগ। সামান্য কটি উইকেট পেলেই হয়। অনেক সুযোগ দিয়েছে নির্বাচকমণ্ডলী—তাঁকে পাঠিয়েছে উর্বরা ভারতবর্ষে। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের এরকম হৃদয়দৌর্বল্য ভাবাও যায় না। ভাগ্যও প্রসন্ন, —রোরকে অসুস্থ। দলে স্থান পাওয়া গেছে। তবু আত্মবিশ্বাস আসছে না। বেডসারই বোধ হয় জিতে গেল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একসঙ্গে খেলতে নেমেছিলুম—বেডসার আর আমি। ইংলণ্ডের পক্ষে বোলার একা

ছিল বেডসার। অস্ট্রেলিয়ায় আমার সঙ্গে ছিল মিলার। ডন বলেছে, নিজের ধরণে বেডসার টেটের চেয়ে বড় বোলার। আমার সম্বন্ধে সকলে বলে—লারউডের পরেই। কী পরিশ্রম না করতে হয়েছে দ্বিতীয় লারউড হতে। প্রাণটাকে টেনে হাতের পেশীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বল করতে হয়েছে। তবু দ্বিতীয় লারউড? বেডসারের পিছনে থাকতে হবে? স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। সে থামতে দেয়নি। আটত্রিশ বছর বয়সেও পাহাড়ে রাস্তায় দৌড় করিয়েছে মাইলের পর মাইল প্রতিদিন—যাতে টেস্ট বোলারের শরীর ঠিক রাখতে পারি। না, তাকে বেডসারের রেকর্ড-ভাঙা রেকর্ড উপহার দেওয়া যাবে না। ভারতীয় নরম ছোকরাগুলো কী যে তৈরী হয়েছে,—বাম্পারে ভয় করে না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এদের মানুষ করে দিয়ে গেছে। তবু চেষ্টা করা যাক। লিণ্ডওয়াল দৌড় দিতে সুরু করলেন।

সুন্দর ছন্দে লিণ্ডওয়ালের হাত থেকে বল পড়ল—সেই ছন্দোময় নিক্ষেপভঙ্গি,—বল ছোঁড়ার আগের মুহূর্তে কাঁধ, হাত এবং পায়ের এক রেখায় অবস্থান,—যা দেখে ক্রিকেট-রসিক বিদেশীদের অনিবার্যভাবে লারউড-দর্শন হয়। ফাস্ট বোলিং-এর গৌরবযুগের সমস্ত উত্তরাধিকার যাঁর মধ্যে, ডেলিভারির ন্যায্যতা নিয়ে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে যিনি, সেই লিণ্ডওয়াল। তিনি বল সুরু করতে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিমুখী বামপন্থী আক্রমণের অবসান হোল। এতক্ষণ দুদিক থেকে বাঁ হাতে বল চালাচ্ছিলেন ডেভিড্‌সন ও মেকিফ। লিণ্ডওয়াল দাক্ষিণ্য আনলেন। 'লিণ্ডওয়ালের ডেলিভারি আছে কিন্তু আর কিছু আছে কি?'—প্রশ্ন ঘুরতে লাগল হাজার হাজার দর্শকের মনে। তার উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন লিণ্ডওয়াল। অল্প সময়ের মধ্যে বারবার ব্যাটসম্যানের প্যাড পেলেন সামনে—অবশ্য উইকেটের সামনে নয়। ১১-২৫-এর সময় একটি রান-আউটের সঙ্কট গেল। এগারোটার পর থেকে ভারতীয় ব্যাটিং আস্থাপূর্ণ খাবি খেয়ে চলেছে। সাড়ে এগারোটার সময়ে খেলা সুরুর একঘণ্টা পরে দলের রান হল ৩০,—যার সবটা ব্যাটসম্যানের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। রানের কিছুটা হওয়া, কিছুটা পাওয়া। কুন্দরাম ইতিমধ্যে হঠাৎ-নবাব। দু'হাতে দেওয়া-নেওয়া। ম্যাকের প্রথম ওভারের প্রথম বল পেটাতে গিয়ে কুন্দরাম মিস্

করলেন। জনতা নিশ্বাস ফেলে বলল, টিকে থাকলে আনন্দ দেবে। তারপরেই গ্রাউট কুন্দরামের খোঁচানো বল ধরতে পারলেন না। আক্ষেপপূর্ণ গুঞ্জনে মাঠ পূর্ণ। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা লিণ্ডওয়াল ও ম্যাকের বলের বিরুদ্ধে শরীর-প্রয়োগ করছেন,—বল লাগছে প্যাডে ও হাঁটুতে। ফাঁকায় ব্যাট ঘুরে মাঠের বায়ুবৃদ্ধি হয়ে চলেছে ক্রমাগত। মাঠে ঠেলাগাড়ী ঢুকল এই সময়—জল আসছে। ঠেলাগাড়ীতে জল, ইডেন গার্ডেনের নয়া ব্যবস্থা। 'নয়া ব্যবস্থা' ঐতিহ্যের অন্তর্গত হতে কতদিন সময় নেবে—ফিস্ ফিস্ করে শুধোলুম নিজেই নিজেকে। খেলার বিরতিতে দর্শকেরা স্বস্তি পেল, যা অবস্থা যাচ্ছিল। স্বস্তি গলায় আটকে গেল। জলপানের ঠিক পরেই বোল্ড হয়ে গেলেন কুন্দরাম। এগারোটা উনচল্লিশ। ভারত—১-৩০।

খুব স্বাভাবিক শেষ। কুন্দরাম এতক্ষণ খেলছিলেন কি করে! কুন্দরাম দেখালেন, প্রথম উইকেটে খেলবার মনোগঠন তাঁর হয়নি। তিনি সত্যকার একজন স্ট্রোক প্লেয়ার। সাহসী। প্রাণবন্ত। কিন্তু এখনো সম্ভাবনা, সিদ্ধি নন। পতোনোথানের শিক্ষণাগারে কিছুদিন তাঁকে কাটাতে হবে। সূচনার গুরুদায়িত্ব অপেক্ষা মাধ্যমিক উৎফুল্ল পরিশ্রমে আরো কিছুদিন তাঁকে দেখলে ভাল হয়। এখনো পঙ্কজ কিংবা অন্য কেউ, যার সেই মেজাজ আছে। পঙ্কজ নামছেন। কলকাতা পঙ্কজকে হাততালি দিতে প্রায় ভুলে গেল। কুন্দরামের হঠাৎ আলোর ঝলকানির পর বড় অন্ধকার। পঙ্কজ ও কণ্ট্রাকটার—ভারতের দুই ওপেনার। পুরাতন একটা ছবি ঝেড়ে মুছে আবার টাঙিয়ে দেওয়া হোল যেন।

রায় নেমে পড়েছেন। একব্যক্তি বললেন, দেখো বাবা, তোমার নামার হাততালি ফিরে-আসার হাততালি যেন না হয়। কণ্ট্রাকটারই ভরসা। বেনোড হাসছেন। হেসে হার্ভের সঙ্গে কথা বলছেন। অবস্থা ভালোর দিকেই যাচ্ছে। ক্রিকেটে অঘটনের প্রত্যাশা করেও পরিকল্পনা মত চলতে হবে। অঘটনটা বেশী ঘটায় শক্তিমানেরা, বেনোড জানেন। পঞ্চম টেস্ট সম্বন্ধে বেনোডের মনোভাব—পারলে জিতব। ড্র করবই।

হারবো না কদাচ। 'সাবধানে খেলতে হবে।' বেনোডের মনে পড়ল ১৯৫৭ সালের বৃষ্টিভেজা ইডেন গার্ডেনকে। নিজের সাফল্যকে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের জবড়জঙ্গ খেলা। কিন্তু গোলাম আমেদ—আঃ সেই মারাত্মক অফব্রেক বোলারটি! ভেজা বা শুকনো যে কোনো উইকেটে বিপজ্জনক। প্যাটেল আছে বটে, কানপুরের শত্রু প্যাটেল—সাধারণভাবে খুব কিন্তু মারাত্মক নয়, যদি না স্পট পায়। বিপদ হয়েছে আবার রামচাঁদ টসে জিতেছে, অস্ট্রেলিয়াকে চতুর্থ ইনিংস খেলতে হতে পারে। যদি উইকেটে ভাঙন ধরে? ভারতীয় ছোকরারা উঠে পড়ে লেগেছে। কণ্ট্রাকটারকে বিশ্বাস নেই। রায় অসুবিধা ঘটাতে পারে যে কোনো সময়। বেগ নেই এক ভরসা। কেনীর হাতে স্ট্রোক আছে। তবু ভাল মিলখা সিং-কে খেলায় নি। ছেলেটা প্রতিভাবান। বুকখোলা জামা, মুখে হাসি, ঝোঁকানো-কাঁধ সিডনির সাংবাদিক-ক্রিকেটার রিচি বেনোডের মন মন থেকে কালো ছায়াটা যাচ্ছে না। কানপুরের লজ্জার কোনো কৈফিয়ত নেই। মাদ্রাজে তা অনেকটা দূর হলেও একেবারে দূর হয়নি, হওয়া সম্ভব নয়, ক্রিকেট-পৃথিবীর করুণাভাজন ভারতের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি। 'না কোনো ঝুঁকি নেওয়া চলবে না—একেবারেই না'—মর্যাদায় ও অধিনায়কের দায়িত্বে ভারী-কাঁধ বেনোড ভাবতে থাকেন। 'ক্রিকেট অনিশ্চিত খেলা'—তিক্তভাবে সত্য হয়েছে ভারতে—একই কথা কি সত্য হয়নি কয়েক মাস আগে অস্ট্রেলিয়ায়?—এইবার সাংবাদিকের নিরপেক্ষতার হাসি ফুটল বেনোডের মুখে—হাঁ তা ঠিক। ইংলণ্ড চূড়ান্তভাবে হারবার আগে কি ইংলণ্ড হেরেছে বিশ্বাস হয়েছিল? এবং তা আমারই 'সুবিজ্ঞ' অধিনায়কত্বে। রিচি বেনোড স্পষ্টই হেসে ফেললেন। পঙ্কজ বোলারের প্রতীক্ষা করছেন। ভাবলেন, কি জানি, বেনোডের হাসির মানে কি?

বেনোড হাসুন আর কাঁদুন—পঙ্কজ হাসবেন না, দর্শককেও কাঁদাবেন না,—তাঁর প্রথম বলের প্রতিরোধ থেকে সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আউট হচ্ছি না নিজের দোষে। তোমরা পার আউট কর। পঙ্কজ নিরুদ্বেগ রইলেন, নিরুত্তর রইলেন কণ্ট্রাকটার। ওভারের পর ওভার মেডেন পেতে লাগলেন লিণ্ডওয়াল ও ম্যাকে। রণজি স্টেডিয়ামের

ইলেকট্রিক স্কোরবোর্ড এগারোটা তিরিশ মিনিট থেকে বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য হারিয়ে ৩০ রানে চুপ করে বসে আছে কুড়ি মিনিটের উপর। লিণ্ডওয়ালের আউটস্যুইঙ্গ বলের বিরুদ্ধে পেণ্ডুলামের ছন্দে পিছন থেকে সামনে কণ্ট্রাকটারের ব্যাট ঘুরতে সবাই নড়ে চড়ে বসে,—মিড অফ দিয়ে সোজা বাউণ্ডারী। বিউগিল বেজে ওঠল স্টেডিয়াম-শীর্ষে। কণ্ট্রাকটার এখন ২৬। এবং তার পরেই—'হা-হা-হা, কর কি কর কি লিণ্ডওয়াল, পঙ্কজের মাথা ফাটিও না, ক্রিকেটে বাঙালীর একমাত্র জ্যান্ত মাথা!' পঙ্কজের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই লিণ্ডওয়াল বাম্পার ছেড়েছিলেন। পঙ্কজ মাথা নামিয়েছেন। লিণ্ডওয়াল একটু হাসলেন দর্শকের হাহাকারে। ৩৮ বছরের বুড়ো বাম্পারে কি আছে আর! কানের পাশ দিয়ে বলটা এখনো লাফিয়ে উঠে ঠিকই, কিন্তু বজ্রকণ্ঠ ব্যক্তির মৃদু প্রণয়সম্ভাষণের মত তা। নিখুঁত লেংথের বলগুলো যখন লাফিয়ে উঠে হাটনের রাত্রির নিদ্রা দূর করত, কম্পটনের কপাল ফাটিয়ে দিত, ওরেলের হাত থেঁতলে দিত, কিংবা উইকসকে আঘাতে আঘাতে অস্থির করে ফেলত, সে দিনগুলো গেল কোথায়? পূর্ণযৌবনের শক্তির অট্টহাস্যের দিন। সাদামাটা সর্টপিচ বাম্পারে লিণ্ডওয়ালের ভক্তি ছিল না। ওটা নিষ্ফল পরিশ্রম। ওসব বলে ব্যাটসম্যান মাথা নামিয়ে মাথা বাঁচায়, কিংবা সাহস থাকলে হুক করে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে দেয়। এমন বল করতে হবে, যাতে প্রায় নিখুঁত লেংথের বল চমকে লাফিয়ে উঠে ঘায়েল করে দেবে ব্যাটসম্যানকে। কীথ আর আমি তেমন বল করবার জন্য দিনের পর দিন কম পরিশ্রম করিনি। লিণ্ডওয়াল ভাবতে থাকেন, কীথ মিলার, আমার বন্ধু, সহযোগী। মাথা গরম ছোকরা বটে, কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপে অধীর। কীথ নিজের মনের কথা রেখে ঢেকে বলতে পারে না—আমি কিন্তু গর্ব করিনি কোনোদিন। তবু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোলার—কথাটা কেমন ভাল লাগত? কথাটা হাটন জোরের সঙ্গে বলেছে। আর—আঃ হাঃ—চশমাধারী পঙ্কজকে দেখে আর একজন চশমাধারীর কথা মনে পড়ল। সেও ওপেনিং ব্যাটসম্যান ছিল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রয় মার্শাল। আমার বলে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে থুবড়ে পড়েছিল। বরাত ভালো। আমার বলের

ধাক্কা যারা খায়, তারা উইকেটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তাতে উইকেট এবং শরীর দুই-ই যায়। মার্শালের শরীরেই শুধু লেগেছিল।

লিণ্ডওয়াল যে কথাই ভাবুন, পঙ্কজ নিজের মাঠে একটা কিছু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হাজার হাজার লোকের আক্ষেপের কারণ হতে চাই না। বাড়ীর লোকজন আর বন্ধু-বান্ধব। এদের লাঞ্চ-টিফিনকে বিস্বাদ করা উচিত হবে না। তাছাড়া—পঙ্কজ বোধ হয় ভাবতে থাকেন,—কিছু করতে না পারলে নিজের লাঞ্চও বিস্বাদ হয়ে যাবে নির্বাচকদের মুখের দিকে চাইলে।

লাঞ্চের সময় পর্যন্ত রায় ও কন্ট্রাকটার ভারতীয় ব্যাটিংএর নির্ভর-যোগ্যতা দেখালেন। একটিও ভুল মার নয়, অশোভন আক্রমণের উগ্রতা নেই, স্থির বিন্যাস এবং নাতিদ্রুত অগ্রগতি। কন্ট্রাকটারের খেলায় ছিল নিয়মবদ্ধতা কিন্তু পঙ্কজের স্বল্প রানের খেলার মধ্যে এমন কয়েকটি মার দেখা গেল যা সুনির্বাচিত সৌন্দর্য-সঞ্চয়ন। বারোটা বাজতে না বাজতে যে সব ক্ষুধার্ত 'পঁয়ত্রিশ-টাকা' সুন্দর লাঞ্চের সন্ধানে উঠে পড়েছিলেন, তাঁরা ১২-১০ মিনিটের সময় ম্যাকের বলে পঙ্কজ স্কোয়ার লেগে চাপড়ে দিয়ে দু'রান এবং তার পরেই মিড অফে সোজা মনোরম যে বাউণ্ডারী করেছিলেন, তা দেখতে প্যাননি। কয়েক মিনিট পরে পঙ্কজের লেটকাট মার দেখার আনন্দ থেকে তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন। এ পর্যন্ত রায়ের আক্রমণ ও প্রতিরোধ নিখুঁত। দৈনিক চার ও সিজন-পনেরোর দর্শকেরা উপভোগ করেছিলেন তাঁদের প্রিয় পঙ্কজের খেলা—খেলার প্রতিটি মুহূর্তকে যে দর্শকেরা অতিমূল্যে কিনেছেন। উদর নামক ধীবরটি যখন অদৃশ্য জালে খেলোয়াড়দের গুটিয়ে আনল প্যাভিলিয়নে, তখনো ভারতের ভবিষ্যৎ একেবারে মসীবর্ণ মনে হয়নি। এক উইকেটে ৫৭। স্কোর খুব বড়ো না হোক, বড় স্কোরের আস্থায় প্রশস্ত হয়ে আছে পঙ্কজ ও কন্ট্রাকটারের ব্যাট।

বাতাসে বল ভাঙছিল—বললেন একজন সাংবাদিক।

মনে হয়, লাঞ্চের পর বল দ্রুত ছুটবে—বিশেষজ্ঞের ভাষণ।

[illegible] একজন বলে উঠলেন কথার মধ্যে বাধা দিয়ে,—ক্রিকেট কি বিচিত্র! খেলার জড়তা ভাঙতে কুন্দরাম চঞ্চল হোল, চঞ্চলতা আসতে নিজে হোল জড়, প্যাভিলিয়ানের চেয়ারে।

অবাঞ্ছিত মন্তব্যে বিশেষজ্ঞরা বিরক্ত হয়ে তাকালেন। টেকনিক্যাল আলোচনার মধ্যে চাপল্য। একজন বললেন,—আমার মনে হয় মেকিফের ডেলিভারির মধ্যে—

রায় কণ্ট্রাকটার মাঠে নামছেন লাঞ্চের পর। ভারতের খেলার সূচনা হচ্ছে যেন। মধ্যে কুন্দরামের অনাবশ্যক প্রবেশ এবং বাদ্যহীন বিদায়। জোরে বইছে উত্তরে বাতাস। কনকনে ঠাণ্ডা। ময়দানের দিক থেকে বল শুরু করলেন অধিনায়ক বেনোড। পৃথিবীর খ্যাতনামা লেগব্রেক বোলার। লাঞ্চের পর ভর্তি পেটে কণ্ট্রাকটার আয়েশভরে স্কোয়ার লেগে বল ঘোরালেন এবং পঙ্কজ খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামের প্রয়োজনে লম্বা পা বাড়িয়ে বেনোডের বলের সামনে টেনে দিলেন একটি প্রসারিত 'না'। ধীর ছন্দে খেলা চললো খানিক, ভোজনান্তিক উদ্গারের মতো দর্শকের চেঁচানির ঢেঁকুর উঠতে লাগল মাঝে মাঝে, এমন সময় চল্লিশ হাজার উদরের চর্বিত পাউরুটি, স্যাণ্ডউইচ, প্যাটিস, কাটলেট একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। কণ্ট্রাকটার বোল্ড। বেনোডের হাতে। ভারত—২-৫৯। কণ্ট্রাকটার ৩০।

ক্লান্ত হাততালির মধ্যে নাদকার্ণির প্রবেশ। শোভাযাত্রা সুরু হল নাকি? না, পঙ্কজ ভয় পাননি। একটা অপূর্ব হুক করলেন অবিলম্বে—অর্থাৎ অপূর্ব হোত যদি ব্যাটে লাগত। কয়েক মিনিট পরে রায় সত্যই ক্রিকেটের গৌরব আর একবার তুলে ধরলেন, বেনোডের লেগব্রেক বলকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করার পরে যখন তিনি কভারের বাউণ্ডারীতে পাঠালেন স্বাচ্ছন্দ্যভরে। বিউগিল বাজল স্টেডিয়ামে যা-পাও-কুড়িয়ে-নাও সুরে। এবং এর পরেই রায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এগারোটি অস্ট্রেলিয়ান গর্জন। এল বি-র আবেদন। অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে দ্বিমত হয়ে ভারতকে বাঁচালেন আম্পায়ার। তার পরেই হার্ভেকে শ্রদ্ধা জানালেন পঙ্কজ রায়, হার্ভের দিকে বল যেতে রান নেবার জন্য বাড়ানো পা টেনে নিয়ে। রায় কিছু

ভিনু মানকদ
ভারতের শ্রেষ্ঠ চৌকশ খেলোয়াড়

ফ্র্যাঙ্কি ওরেল
'ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান যাদুকর'

এভার্টন উইকস
'দ্বিতীয় ব্রাডম্যান'

বিজয় হাজারে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ
ব্যাটসম্যানদের একজন

ডেনিস কম্পটন
একমাত্র পরিচয় — জিনিয়াস

নীল হার্ভে
ব্রাডম্যানের পরে শ্রেষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান

আলেক বেডসার
'মরিস টেটের মত কিংবা তাঁর থেকেও বড়'

আস্থার সঞ্চার করেছেন। তারই আবেগে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি শুধোলেন—রায়-নাদকার্ণি,—তারপর কে? অমঙ্গলে প্রশ্নে রেগে ওঠে আশপাশের লোক,—খেলা দেখুন মশাই! হাইকোর্টের দিক থেকে মেকিফের বলে এদিকে সত্যকার জোর এসেছে। মেকিফকে এতক্ষণে ফাস্ট বোলার মনে হচ্ছে। মেকিফের বল লাফিয়ে উঠে রায়ের ব্যাটে ঠোকা খেয়ে স্লিপের উপর দিয়ে চলে গেল। রায় পিচ পর্যবেক্ষণে গেলেন। তার পরেই অফের দিকের বলের পিছনে ব্যাট তুলে ধাওয়া করে পঙ্কজ উইকেট থেকে মেকিফের বলের দুরত্ব দর্শকের সামনে খুলে ধরলেন,—প্রতি বলে রান না করতে পারার কৈফিয়ত স্বরূপে যেন।

বেনোড অপরদিকে অবিরত মেডেন পেয়ে যাচ্ছেন। গুপ্তের অবর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেগব্রেক বোলার যদি শীতের প্রবল বাতাসের সুযোগে এবং ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সাবধানী মনোভাবের প্রশ্রয়ে মেডেন ছিনিয়ে নিতে না পারেন, তো কি পারলেন? সে মেডেনে অস্ট্রেলিয়ার সামান্য লাভ এবং ভারতের সামান্য ক্ষতি। তবু ব্যাপারটা হৃদয়ঘটিত হয়ে দাঁড়াল জনৈক রসিক ব্যক্তির কাছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপত্তি করলেন তিনি, ছিঃ বেনোড, এত মেডেন প্রীতি কেন তোমার? উমরিগর নেই, বেনোড তাই তুমি আছ,— সকলের আক্ষেপ। স্পিন বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতের যৌবনরাগের দিনগুলো স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল অনেকের। পৌনে দুটো পর্যন্ত কিছু সুঘটন ঘটল না অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে। বেনোডের চোখে এই সময় একটা কি পড়ল। জনৈক অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় বেনোডের 'চোখের বালি' পরিষ্কার করলেন। বেনোড চাইলেন, বল দিয়ে উইকেট পরিষ্কার করা হোক। চোখ-খারাপ রায়ের চোখ তৈরী হয়ে এসেছে। তাবলে নতুন আসা নাদকার্ণিও অব্যস্ত থাকবে? হাজাবের ছন্দে নাদকার্ণি বলের সামনে পদ-প্রসার করে চলেছে, এতো ভাল কথা নয়? অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে বল দিয়ে ভারতের চিরন্তন দুর্বলতা আহ্বান করেও মেকিফ ভারতীয় ব্যাটসম্যান দুজনকে প্রলুব্ধ করতে পারছেন না। হাইকোর্টের দিক থেকে মেকিফের বদলে লিণ্ডওয়াল হাতে বল নিলেন এবং নাদকার্ণিকে ভুলিয়ে ভুল করালেন। স্লিপে পরমানন্দে ক্যাচ লুফেছেন ডেভিডসন।

শীতের কাঁপুনির সুরু। বাতাসের হু হু শরবর্ষণ। কলকাতায় বিলম্বিত শৈত্য। অস্ট্রেলিয়ানদের চমৎকার লাগছে। রোদের কোলে মধুর বাতাস। সূক্ষ্ম মূর্তি কেনীকে দেখা গেল ব্যাট হাতে। বড্ড সূক্ষ্ম, অবিশ্বাস্য, আস্থার পক্ষে খুবই শীর্ণ। বেনোডের বলে রায় পা বাড়িয়ে ব্যাট এধার ওধার সরিয়ে এক সময় থতমত খেয়ে ঠেকালেন। এক বৃদ্ধ সেই দেখে রেগে গেলেন একটি মেয়ের 'ব্যাভারে'। উত্তরে বাতাসের ঠেলায় সকলে যখন গায়ে গরম কাপড টেনে দিয়েছে ঘন করে, তখন মেয়েটির একেবারে ঠাণ্ডা লাগছিল না। সে কথা সে প্রমাণও করেছিল সর্বাঙ্গে হাওয়া লাগাবার নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন —'মা লক্ষ্মী, গায়ে কাপড় দাও, উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে, অসুখ করবে।' লাঞ্চের পর ভারতের প্রতিটি স্কোর অসুস্থ ও ক্লান্ত, গা নাড়াতে অপারগ। ১৭ রানকে ভালবেসে ফেলে রায় অনেকক্ষণ ধরে রেখেছেন। নো বলেও মারতে ভুলে গেলেন। ছুটোর সময় মন্থর ভঙ্গিতে জলের গাড়ি গড়িয়ে ঢুকল মাঠে, সবুজ ও নীল কোট পরা ছুই প্রহরীকে পাশে নিয়ে। কী সুন্দর মাঠ—কী নরম— অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। জল খেয়ে কেনী সুন্দরভাবে লেগে ঠেলে দিয়ে তিন রান নিলেন। উৎসাহ পেয়ে রায়ও কাট করে নিলেন এক রান। বেনোড একটা চলন্ত ফিল্ডিং দেখালেন, যে কোনো উচ্চস্তরের মারের সমতুল জিনিস। স্টেডিয়ামে রোদ চড়েছে, তবু দর্শকেরা শান্ত, এমন একটা ম্লানতা ছড়িয়েছে খেলায়। তারপরেই দর্শক শিউরে সহানুভূতি জানাল কেনীর সম্বন্ধে, বেনোডের বাঁকা বল থেকে অল্পের জন্য অফস্টাম্প বেঁচেছে। ট্রানজিস্টার রেডিও সেট চালিয়েছে কে যেন, শুনতে পাচ্ছি ভাষ্যকারের কণ্ঠ—'এই ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনে—', ভাবছি দর্শকেরা জানে তো তারা ইতিহাসের অংশ? এবং তার পরেই ছুটো বাইশ মিনিটের সময় কলকাতা সদয় হোল লিণ্ডওয়ালের উপর—কেনী গ্রাউটের হস্তগত হলেন লিণ্ডওয়ালের বলের তাড়নায়। ভারত ৪-৮৩। গোপীনাথ এবার।

আমার প্রিন্স। আমার সুখের সৌরভ, ভারতীয় ক্রিকেটের বিরল পুষ্প গোপীনাথ। গোপীনাথ ক্রিকেটকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন

একদিন। গোপীনাথ নামছেন। একজন চেঁচিয়ে বলল—গোপীনাথ তোমার নির্বাচনের ন্যায্যতা প্রমাণ কর। আমি ফিরে গেলুম যৌবন-স্বপ্নের দিনে, তখনকার অর্ধস্ফুট অপূর্ব ফুলটির স্মরণে।

গোপীনাথ কোনোদিন ফুটলেন না ভাল করে। গোপীনাথকে দেখে মনে হয়েছিল বড় ক্ষীণবৃন্ত। তাঁকে প্রথম থেকে অবিশ্বাস করেছিলুম। এরা সুন্দর হয়ে আসে শুধু প্রহরের সৃষ্টিতে মুগ্ধ করবার জন্য। গোপীনাথের মত জাত শিল্পী তরুণদের মধ্যে কেউ ছিল না। কিন্তু স্বাস্থ্যহীন শিল্পীর যা হয়, সম্ভাবনাকে সম্ভবে উপনীত করতে হয় অসমর্থ, রসিকের দীর্ঘনিশ্বাসের দৈর্ঘ্যকে দেয় বাড়িয়ে। এখন তো চুল উঠে গোপীনাথের কপাল চওড়া হয়ে গেছে, চলা ফেরার মধ্যে অবসর-গ্রহণের ধীরতা, গোপীনাথ ইডেন গার্ডেনে ফিরেছেন বেড়িয়ে যাবার জন্য। গোপীনাথকে দেখে তাই মনে হোল।

একদিন তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে গোপীনাথ ছিলেন খেলার মনোহারিতায় অদ্বিতীয়। যে মার মারতে ভুলে গিয়েছে দায়বদ্ধ ক্রিকেট, গোপীনাথের হাত থেকে সে মার ঝরত অজস্র দাক্ষিণ্যে। ব্যাক ফুট ড্রাইভের হিসেবী ব্যবহারে ক্রিকেটারেরা খেলাকে বৃদ্ধের কর্তব্যে উন্নীত করেছে- এমন প্রবীণ জগতে গোপীনাথ সত্যই ছিলেন তরুণ—কেবল বয়সেব মাপে তরুণ নন। তাঁর খেলায় স্কোয়ারকাট ও লেটকাটের প্রাচুর্যময় উপস্থাপনা দেখেছি, সমারোহ বলতে পারি। স্কোয়ার কাট মারতে ভয় পাচ্ছেন ব্যাটসম্যান। অফস্টাম্পের বাইরে ব্যাট বাড়ানো? কদাপি নয়,—স্লিপের ফিল্ডসম্যানগুলো এক একটি পতনের গহ্বর। পঙ্কজ আগে স্কোয়ার কাট মারতেন, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাটাকুটি ছেড়ে ড্রাইভে মন দিয়েছেন। আর লেটকাট? লেটকাট ইদানীং ক্রিকেটেব নিষিদ্ধ সাধনা। মার্চেন্ট মারতেন লেটকাট,—ক্লাসিক মার্চেন্ট রোমান্টিক হয়ে উঠতেন তখন। লেটকাটে মানকদেরও আসক্তি ছিল। মার্চেন্টের নৈপুণ্য তাতে না থাকলেও ছিল এক ধরণের জবড়জঙ্গ সৌন্দর্য, অপ্রতিভ অথচ সুন্দর হাসির মতো। মুস্তাক যখন লেটকাট মারতেন আমরা কপালের মাঝখান পর্যন্ত ভ্রূ তুলে ভয়ে বিস্ময়ে সে কাণ্ড দেখেছি, বিষদাঁত

না-ভাঙা সাঁপের মুখে হাত দেওয়া! অথচ গোপীনাথের ক্ষেত্রে স্কোয়ার কাট, লেটকাটই স্বাভাবিক মার। ঐ মার মারতেই তিনি মাঠে নেমেছেন, আমাদের নির্মল চ্যাটার্জির মতো। সুশ্রী না হয়ে কখনোই থাকব না। সুন্দর না হয়ে কি সত্যই বাঁচা যায়,—এই অভিজাত প্রশ্নটি প্রতিটি আশ্চর্য মারের পর নির্মল বা গোপীনাথ ব্যাটের আঁকাবাঁকা রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই একটি কথা ভুলে গিয়েছিলেন, পলান্ন প্রতিদিনের জন্য নয়, অন্ন দৈনন্দিনের। সোজা ব্যাটের পরিশ্রমে সেই অন্ন জোটে। বাঁকা ব্যাটের বাঁশীতে সুর তুলতে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথ সৌন্দর্যের ক্ষয়িষ্ণুতায়।

কে বলে ফুরিয়ে গিয়েছেন? এই তো গোপীনাথ নামছেন আবার টেস্ট ক্রিকেটে। নরম সবুজ মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটি সবুজ স্বপ্ন। হে ঈশ্বর, স্বপ্নভঙ্গ যেন না হয়। বিশেষত ভারতের এই দুঃসময়ে।

প্রথম বলেই লিণ্ডওয়াল 'ঘাউ' করে ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন গোপীনাথের বিরুদ্ধে। লিণ্ডওয়াল বেডসারের পশ্চাদ্ধাবনে শেষ শক্তি প্রয়োগ করছেন। এর পরেই বেরিয়ে এল সেই মার,—পুরাতনী অলঙ্কারের আলো ছড়িয়ে পড়ল মাঠে—গোপীনাথের স্কোয়ারকাটা। মেরেই উদাসীন তিনি। লিণ্ডওয়াল বল দেবার জন্য পিছু হাঁটছেন, গোপীনাথ ব্যাটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে (আহা যেন ত্রিভঙ্গ !), ক্ষণমাত্র লাগে তাঁর স্টাম্প দিয়ে বল মারতে। গোপীনাথকে পেয়ে রায় বোধহয় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনকে ফিরে পেলেন। অবিলম্বে স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীতে পাঠালেন বেনোডের বল। মাঠ ফেটে পড়ল উত্তেজনায়। ঠিক পরের বলের মুখে পা ও ব্যাট বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে রায় অন্য প্রান্তের গোপীনাথকে জানালেন,—বন্ধু, তাবলে সত্যই আমি ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড় নই আর। এরপর পোপীনাথ ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে যেভাবে বল তুলে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন, তাতে মনে হোল ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ ফিরে এসেছে। রায় এগিয়ে এলেন, বোধহয় সাবধান করতে। বুঝিয়ে দিলেন, ভায়া, ক্ষণকালের গৌরবের লোভে বিদায়ের অগৌরব ডেকে এনো না। বিশেষত ভারতের এই অবস্থা। রায় বড় বেশী

দায়িত্বশীল। আমি কিন্তু সদানন্দ বিপজ্জনক পুরুষ,—একথা গোপীনাথ প্রমাণ করলেন রান আউটের সুযোগ সৃষ্টি করে। অস্ট্রেলিয়ানরা চাবুকের মত ফিল্ডিং করছে। রায়-গোপীনাথকে খেলতে দেওয়ার বিপদ আছে। একজন সানাইয়ের পোঁ—অন্য জন সুর। দুজনে মিলে ভারতের মঙ্গলগান বাজাতে পারে। উইকেটের স্বাদ পেয়েছেন লিণ্ডওয়াল। বলের গতি বাড়িয়ে ক্ষণে ক্ষণে গর্জন করছেন। আড়াইটের সময় রায় স্বচ্ছন্দে কভারে বাউণ্ডারী করে প্রমাণ করলেন, তিনি সানাইয়ের পোঁ নন, সুরও বটে। ভারতের একশো রানের গাঁট পেরিয়ে হোল ১০২। রায় গোপীনাথের সহযোগিতায় পনের মিনিটে কুড়ি রান। গোপীনাথের আধঘণ্টা বারবার কামনা করলেন জনৈক ক্ষণবাদী। দুটো ছত্রিশ মিনিটের সময় গোপীনাথকে যখন মেডেনে থামালেন লিণ্ডওয়াল তখন সেটা মনে হোল খুবই বিস্ময়কর, কারণ ইতিমধ্যেই গোপীনাথ অদম্য বলে গৃহীত হয়েছেন।

কলকাতার ছেলে পঙ্কজ রায়কে নিজের বাড়ীতে চা-খেতে সুযোগ না দেবার জন্য নিশ্চয় কেউ অনুযোগ করেছিল। নচেৎ চা-পানের পরই হাইকোর্টের দিক থেকে ডেভিডসনকে বল দিতে দিলেন কেন বেনোড? ডেভিডসনকে রায়ের বিরুদ্ধে বল দিতে দেখে মোটেই ভাল লাগল না। একটা সাগরপারের চেঁচানি কানে এসে বাজল,—'বেডসার, তোমার কেকটা খেয়ে নাও।' অস্ট্রেলিয়ান ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর্থার মোরিস ইংরেজ বোলার বেডসারের অতি প্রিয় খাদ্যরূপে ক্রিকেট-কাহিনীতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। মোরিসের বিরুদ্ধে বেডসার বল দিতে সুরু করলেই দর্শক চেঁচাত —'আর কেন কেকটা খেয়ে নাও।' পঙ্কজ-ডেভিডসনের মধ্যে ঐ ধরণের একটা খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। পঙ্কজ ভদ্র ব্যক্তির মতো সম্পর্ক রক্ষা করলেন। চা-পানে সতেজ পঙ্কজ রায় অফ-স্টাম্পের বাইরে উঠতি বলে পেটাতে গিয়ে ক্যাচ তুললেন উইকেটকীপারের অভ্রান্ত হাতে। পঙ্কজ রায় ৩৩; ভারতের ৫—১১২। একটি নিখুঁত নিষ্ঠাপূর্ণ খেলার পর্যাপ্ত মূল্য পেলেন না পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ আজ যা খেলেছেন, এ পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটিং-এর তা শ্রেষ্ঠ রূপ সন্দেহ নেই। ধীর অভ্রান্ত ক্রমগতি। পঙ্কজের ১৪৩ মিনিটের ইনিংসের উপর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে 'ম্যাচিওরিটি' শব্দটি লেখা ছিল। দলের এবং

না-ভাঙা সাপের মুখে হাত দেওয়া! অথচ গোপীনাথের ক্ষেত্রে স্কোয়ার কাট, লেটকাটই স্বাভাবিক মার। ঐ মার মারতেই তিনি মাঠে নেমেছেন, আমাদের নির্মল চ্যাটার্জির মতো। সুশ্রী না হয়ে কখনোই থাকব না। সুন্দর না হয়ে কি সত্যই বাঁচা যায়,—এই অভিজাত প্রশ্নটি প্রতিটি আশ্চর্য মারের পর নির্মল বা গোপীনাথ ব্যাটের আঁকাবাঁকা রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই একটি কথা ভুলে গিয়েছিলেন, পলান্ন প্রতিদিনের জন্য নয়, অন্ন দৈনন্দিনের। সোজা ব্যাটের পরিশ্রমে সেই অন্ন জোটে। বাঁকা ব্যাটের বাঁশীতে সুর তুলতে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথ সৌন্দর্যের ক্ষয়িষ্ণুতায়।

কে বলে ফুরিয়ে গিয়েছেন? এই তো গোপীনাথ নামছেন আবার টেস্ট ক্রিকেটে। নরম সবুজ মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটি সবুজ স্বপ্ন। হে ঈশ্বর, স্বপ্নভঙ্গ যেন না হয়। বিশেষত ভারতের এই দুঃসময়ে।

প্রথম বলেই লিণ্ডওয়াল 'ঘাউ' করে ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন গোপীনাথের বিরুদ্ধে। লিণ্ডওয়াল বেডসাবের পশ্চাদ্ধাবনে শেষ শক্তি প্রয়োগ করছেন। এর পরেই বেরিয়ে এল সেই মার,—পুরাতনী অলঙ্কারের আলো ছড়িয়ে পড়ল মাঠে—গোপীনাথের স্কোয়ারকাট। মেরেই উদাসীন তিনি। লিণ্ডওয়াল বল দেবার জন্য পিছু হাঁটছেন, গোপীনাথ ব্যাটে ভর দিয়ে দাঁড়িযে (আহা যেন ত্রিভঙ্গ!), ক্ষণমাত্র লাগে তাঁর স্টাম্প দিয়ে বল মারতে। গোপীনাথকে পেয়ে রায় বোধহয় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনকে ফিরে পেলেন। অবিলম্বে স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীতে পাঠালেন বেনোডের বল। মাঠ ফেটে পড়ল উত্তেজনায়। ঠিক পরের বলের মুখে পা ও ব্যাট বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে রায় অন্য প্রান্তের গোপীনাথকে জানালেন,—বন্ধু, তাবলে সত্যই আমি ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড় নই আর। এরপর পোপীনাথ ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে যেভাবে বল তুলে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন, তাতে মনে হোল ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ ফিরে এসেছে। রায় এগিয়ে এলেন, বোধহয় সাবধান করতে। বুঝিয়ে দিলেন, ভায়া, ক্ষণকালের গৌরবের লোভে বিদায়ের অগৌরব ডেকে এনো না। বিশেষত ভারতের এই অবস্থা। রায় বড় বেশী

দায়িত্বশীল। আমি কিন্তু সদানন্দ বিপজ্জনক পুরুষ,—একথা গোপীনাথ প্রমাণ করলেন রান আউটের সুযোগ সৃষ্টি করে। অস্ট্রেলিয়ানরা চাবুকের মত ফিল্ডিং করছে। রায়-গোপীনাথকে খেলতে দেওয়ার বিপদ আছে। একজন সানাইয়ের পোঁ—অন্য জন সুর। দুজনে মিলে ভারতের মঙ্গলগান বাজাতে পারে। উইকেটের স্বাদ পেয়েছেন লিণ্ডওয়াল। বলের গতি বাড়িয়ে ক্ষণে ক্ষণে গর্জন করছেন। আডাইটের সময় রায় স্বচ্ছন্দে কভারে বাউণ্ডারী করে প্রমাণ করলেন, তিনি সানাইয়ের পোঁ নন, সুরও বটে। ভারতের একশো রানের গাঁট পেরিয়ে হোল ১০২। রায় গোপীনাথের সহযোগিতায় পনের মিনিটে কুড়ি রান। গোপীনাথের আধঘণ্টা বারবার কামনা করলেন জনৈক ক্ষণবাদী। দুটো ছত্রিশ মিনিটের সময় গোপীনাথকে যখন মেডেনে থামালেন লিণ্ডওয়াল তখন সেটা মনে হোল খুবই বিস্ময়কর, কারণ ইতিমধ্যেই গোপীনাথ অদম্য বলে গৃহীত হয়েছেন।

কলকাতার ছেলে পঙ্কজ রায়কে নিজের বাড়ীতে চা-খেতে সুযোগ না দেবার জন্য নিশ্চয় কেউ অনুযোগ করেছিল। নচেৎ চা-পানের পরই হাইকোর্টের দিক থেকে ডেভিডসনকে বল দিতে দিলেন কেন বেনোড? ডেভিডসনকে রায়ের বিরুদ্ধে বল দিতে দেখে মোটেই ভাল লাগল না। একটা সাগরপারের চেঁচানি কানে এসে বাজল,—'বেডসার, তোমার কেকটা খেয়ে নাও।' অস্ট্রেলিয়ান ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর্থার মোরিস ইংরেজ বোলার বেডসারের অতি প্রিয় খাদ্যরূপে ক্রিকেট-কাহিনীতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। মোরিসের বিরুদ্ধে বেডসার বল দিতে সুরু করলেই দর্শক চেঁচাত —'আর কেন কেকটা খেয়ে নাও।' পঙ্কজ-ডেভিডসনেব মধ্যে ঐ ধরণের একটা খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। পঙ্কজ ভদ্র ব্যক্তির মতো সম্পর্ক রক্ষা করলেন। চা-পানে সতেজ পঙ্কজ রায় অফ-স্টাম্পের বাইরে উঠতি বলে পেটাতে গিযে ক্যাচ তুললেন উইকেটকীপারের অভ্রান্ত হাতে। পঙ্কজ রায় ৩৩; ভারতের ৫—১১২। একটি নিখুঁত নিষ্ঠাপূর্ণ খেলার পর্যাপ্ত মূল্য পেলেন না পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ আজ যা খেলেছেন, এ পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটিং-এর তা শ্রেষ্ঠ রূপ সন্দেহ নেই। ধীর অভ্রান্ত ক্রমগতি। পঙ্কজের ১৪৩ মিনিটের ইনিংসের উপর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে 'ম্যাচিওরিটি' শব্দটি লেখা ছিল। দলের এবং

নিজের প্রয়োজনে সুস্থির পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত আছে এখানে। কিন্তু পঙ্কজের এই 'খাঁটি ক্রিকেট' শেষ পর্যন্ত নিম্নবিত্ত থেকে গিয়েছে রানসংখ্যায়। পঙ্কজের পরিণতির সঙ্গে ধরা যাক, হার্ভের পরিণতির পার্থক্য আছে। হার্ভের ক্ষেত্রে পরিণতি মানে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সুষম বিন্যাস। প্রতিভার দায়িত্বহীন উচ্ছ্বাসকে নির্দিষ্ট খাতে চালিত করা হয়েছে সেখানে। পঙ্কজ তেমন বিপুল প্রতিভাসম্পদে বঞ্চিত। পঙ্কজের সব চেয়ে বড় প্রশংসা এইখানে, তিনি প্রভূত পরিশ্রমে, অর্থাৎ সাধনায়, নিজের শক্তির শেষ ফসলটুকু ফলিয়েছেন। পঙ্কজের পরিণতির অর্থ হোল, তাঁর সর্বসম্পদের আকর্ষণ ও উপস্থাপনা। এইখানে আমার আশঙ্কা হতে লাগল,– আমার বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়, তাহলে এর পরেই দ্রুত ক্ষয়। পঙ্কজ ক্রিকেটের চোখ হারিয়েছেন,—ক্রিকেটের মন আছে তাঁর,—কতদিন শুধু মনের জোরে চলবে? কেবল মারবার বলে মারলে বোলার মরে না। তাকে না মারবার বলে মেরে গুঁড়িয়ে দিতে হয়। পঙ্কজ অনেক সময় মারবার বলেও মারতে দ্বিধা করেন। বোলার অস্থানে সম্মান পায় তাতে। পরে এক সময় সুযোগমত অসম্মানে ঠেলে দেয় ব্যাটসম্যানকে। তাছাড়া হাজারের কনসেনট্রেসন নেই পঙ্কজের। বুঝতে পারছি না, ভবিষ্যতে পঙ্কজ কি করবেন!

বোরদে নেমেছেন। বোরদের উপর ভরসা নেই। না, নিশ্চয়ই আছে। ইংলণ্ডে বোরদের খেলা ভুলে যাও কেন? কিংবা গত বছরে মাদ্রাজে শেষ টেস্টে বোরদের কীর্তি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কামানের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চনা? বোরদের মধ্যে অমরনাথ নিশ্চয় কিছু দেখেছেন—নইলে চার টেস্টে সাড়ে তের অ্যাভারেজের পরেও বোরদেকে দলে রেখেছেন কেন? বোরদে সম্বন্ধে মানসিক উৎসাহ বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল সকলে। গোপীনাথ ও বোরদে খেলতে লাগলেন। গোপীনাথ চওড়া কপাল ঢেকেছেন টুপিতে, খোলা মাথায় চুলের ঐশ্বর্য মেলে রেখেছেন বোরদে। গোপীনাথের খেলায় অস্বস্তি প্রকাশ পেতে লাগল। বেনোডের লেগব্রেক বল মিস করলেন, বলটি অন্যায় রকম ঘুরেছিল। পরের বলে স্কোয়ার লেগে বাউণ্ডারী। তারপরে

স্টাম্পড্ হতে হতে বাঁচলেন। বেনোডের শেষ বল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কোলের কাছে। আঃ কি কর, বলে চাপড়ে দৌরাত্ম্য থামালেন। গোপীনাথ এখন ২৪। ওদিকে ডেভিডসনকে সামলাতে বোরদে নাজেহাল। ভারতের তুইজন সেরা স্বচ্ছন্দ ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বেনোড ও ডেভিডসন অস্বাচ্ছন্দ্যের সর্বরকম আয়োজন করেছেন। তিনটে বেজে গেছে অনেকক্ষণ, আকাশে কাক উড়ছে, কালো কতকগুলো ছায়া মাঠের উপর রেখা টেনে সরে যাচ্ছে। গোপীনাথের মিস্ হিট বাউণ্ডারীতে গেল। সাড়ে তিনটের সময় এক রান করে বোরদে রানের খাতায় প্রথম আঁক টানলেন। একটানা বল করে চলেছেন বেনোড। তাঁর চলার ভঙ্গিতে ক্লান্ত মর্যাদার ভাব। বেনোড অধিনায়কত্বের ভারে ক্লান্ত—মেডেন পেয়েও ক্লান্ত বোধ হয়। তিনটে ৪০ মিনিটের সময় মাথায় চড়া রোদ এবং ভারতীয় খেলোয়াড়দের ঠাণ্ডা খেলা দেখে স্টেডিয়ামের দর্শক গোপীনাথকে—গোপীনাথকেও,—ব্যারাক করল। পৌনে চারটের সময় নিজের উপর বিরক্ত বোরদে মিডঅনের বাউণ্ডারীতে পাঠালেন বেনোডকে। এবং ব্যাটসম্যানের উপর বিরক্ত বেনোড তারপরেই বোরদের উইকেট বলের লম্বা বাঁকে ভেঙে দিলেন একেবারে। বোরদে তাঁর গড় বজায় রেখেছেন—৬। ভারত ৬—১৩১।

রামচাঁদ, অধিনায়ক রামচাঁদ, হাততালির মুষ্টিভিক্ষার মধ্যে মাঠে নেমে গোল্লা রানের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে গোঁজা দিয়ে এক রান করলেন ম্যাকের বলে। এরই মধ্যে একটা রান-আউট রান আউট উত্তেজনা গেল। হার্ভে বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙে দিয়েছিলেন, ভাগ্যবশে গোপীনাথ ক্রীজে পৌঁছেছিলেন তার আগেই। যখন চারটে বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি—তখন সমস্ত দর্শক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—পয়সার দাম উঠে গেছে—গোপীনাথ স্কোয়ার কাট করেছেন। তারপরেই পুনশ্চ একই জিনিস। মাঠ মেতে উঠল। বিউগিল বাজল বাঁশীর সুরে। শেষ রোদে মাঠে ধোঁয়া ধোঁয়া আচ্ছন্নতা—চারটের সময় জলের গাড়ী গড়িয়ে ঢুকল মাঠে। ক্লান্ত বোলার ঊর্ধ্বমুখে জলের কুলকুচিতে রামধনু সৃষ্টি করল। পানস্নিগ্ধ গোপীনাথ অপরদিকে বেনোডের প্রথম বলের বিরুদ্ধে কঠিন হতে ভুলে গেলেন। গোপীনাথ—ব—বেনোড—৩৯। ভারত ৭—১৪২। বেনোড

এখন পর্যন্ত ৪০ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছেন। প্রাণহীন উইকেটে মূল্যবান সঞ্চয়।

জয়সীমা এলেন। রামচাঁদ নিখুঁত ডিফেন্সের চেষ্টায় আছেন। দর্শকজন চীৎকার করে বলল—রামচাঁদ নিজের খেলা খেল, আমাদের যা হবার তা তো হয়েছেই। সত্যই তাই প্রয়োজন। ব্যাট হাতে দাঁড়াবার মত শেষ খেলোয়াড় গোপীনাথ ফিরে গেছেন প্যাভিলিয়নে। সৌন্দর্য ও সন্দেহে পূর্ণ ইনিংস দেখেছি। গোপীনাথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি কত বড় খেলোয়াড় ছিলেন। নিছক লাবণ্যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে (আব্বাস আলীকে দেখিনি, তাঁর বিষয়ে বলতে পারবো না) গোপীনাথ এখনো অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি উদাসীন, নিরুদ্বেগ, প্রতিভানির্ভর। যৌবনের অবহেলার সৃষ্টিযুগ বাদ দিলে পরবর্তীকালে কেবল প্রতিভার উপর নির্ভর করে মাঠে দাঁড়ানো যায় না। পঙ্কজের সিরিয়াসনেস ও গোপীনাথের সুষমা যদি একদেহে মিলিত হোত! অর্থাৎ আমি ছোট আকারে গ্রেস ও রণজির মিলন চাই—যা অসম্ভব। অসম্ভব? কেন কম্পটন? হাঁ কম্পটনই তা পেরেছেন। তার জন্য জিনিয়াস কম্পটন রানের বৃহত্তম সংগ্রহ-শালা হতে পেরেছেন। ক্রিকেট কম্পটনের স্বপ্ন এবং কর্ম একসঙ্গে ছিল বলেই এ জিনিস সম্ভব হয়েছিল। কম্পটন চোখে দেখেছেন স্বপ্ন, হাতে ধরেছেন ব্যাট। চোখের স্বপ্ন এবং ব্যাটের ব্লেডের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে অসামান্য প্রতিভা এবং প্রয়াস। আধুনিক পৃথিবীতে কম্পটন একমাত্র। গোপীনাথের আজকের খেলা দেখে মনে হোল, তাঁর টেস্ট-জীবন শেষ হয়েছে। যদি ভারতীয় ব্যাটিং কখনো এমন অবস্থায় পৌঁছায়, যখন প্রথম দিকের খেলোয়াড়েরা নিশ্চিতভাবে প্রভুত রান করবেন, দলের বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না, তখন না হয় গোপীনাথকে ভারতীয় যাদু বিস্তারের জন্য ডাকা যাবে। ভারতীয় ব্যাটিং এখন সে পর্যায়ে নেই।

মাঠে ওদিকে বিখ্যাত নাটকের অভিনয়।—তুমি কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা কর পুরুরাজ? পুরুরাজ উত্তর দিলেন—রাজার ব্যবহার। আলেকজাণ্ডার-বেনোড এবং পুরুরাজ-রামচাঁদ মুখোমুখি। তিনবার পরপর বেনোড রামচাঁদকে বেকায়দায় ফেললেন। শেষকালে উত্ত্যক্ত রামচন্দ্রের

ডাণ্ডা ঘুরল। বল বিদ্যুতের গতিতে বাউণ্ডারীতে। তারপরেই 'অতিরিক্ত' তিন রান। ভারতের ১৫০ রান হোল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অনেকে। যাক, দেড়শো রানের ভারতীয় দল লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। রামচাঁদ আবার শান্ত হলেন। দর্শকেরা বুনো রামচাঁদের প্রশান্তি দেখে সবিস্ময়ে চোখ রগড়ে নিল। চারটে বেজে গিয়েছে। অর্ধচন্দ্রাকার এক বিশাল কালো ছায়া প্যাভিলিয়নের দিক থেকে উইকেটের দিকে ধীরভাবে এগিয়ে চলেছে। গ্যালারির ধারে শালিখ পাখীগুলো অদৃশ্য খাদ্য পরমানন্দে খুঁটছে—কাছাকাছি বল এলে বিরক্ত হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে সরে যাচ্ছে। এন. সি. সি. ক্যাডেট ও অফিসারদের ডাক দেওয়া হয়েছে নিজ নিজ জায়গায় প্রস্তুত থাকবার জন্য। মারার বল ব্যাটে পেয়েও দাঁতে দাঁত টিপে ব্যাট তুলে নিয়েছেন রামচাঁদ। জয়সীমা এমন খেলছেন যাতে কোনো বলই যে মারবার হতে পারে বোধ হচ্ছে না। পনের টাকার সিজন টিকেট এখনো স্থির আছে। পঁয়ত্রিশ টাকা উঠে পড়েছে, যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে লোভীর মত খেলা দেখে নিচ্ছে, যেমন সিনেমার শেষ কয়েক ফুট ছবি উঠে-পড়া দর্শক দেখে থাকে। মেকিফের নাকের সামনে দিয়ে একটা কাক উড়ে গেল—তার দিকে মেকিফ হাঁ করে তাকিয়ে আছেন—আম্পায়ার বেল তুলে নিলেন। প্রথম দিনের শেষ। ভারত ৭—১৫৮। অতি দীন একটি রানসংখ্যা। ভারতীয় দলের হঠাৎ-পতন হয় নি। অল্প অল্প সময়ের ব্যবধানে একটির পর একটি উইকেট গেছে। যেমন গিয়ে থাকে অল্পশক্তি দলের অধিক শক্তিশালীর বিরুদ্ধে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে সন্ধ্যা নেমে পড়ল। শালিখগুলো রোদে-ছায়ায় ঘোরাঘুরির পরে বাসার খোঁজে উড়ে গেল। দূরে হু হু করে উঠল গাছগুলো। বয়ে গেল অদৃশ্য শান্তির ঢেউ। আবার আগামী কাল।

যাঁরা আজ সারারাত লাইন দিয়ে থাকবেন প্রবেশের জন্য, তাঁদের ক্ষেত্রে সই আগামীকাল সুরু হয়ে যাবে সন্ধ্যে থেকেই।

ভারত—প্রথম ইনিংস

বি. কে. কুন্দরাম	ব ম্যাকে	১২
নরী কণ্ট্রাকটার	ব বেনোড	৩৬
পঙ্কজ রায়	ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৩৩
বাপু নাদকার্ণি	ক ডেভিডসন ব লিণ্ডওয়াল	২
আর বি কেনী	ক গ্রাউট ব লিণ্ডওয়াল	৭
সি. ডি. গোপীনাথ	ব বেনোড	৩৯
সি. বোরদে	ব বেনোড	৬
জি. এস. রামচাঁদ	নট আউট	১২
এম. এল. জয়সীমা	নট আউট	২
	অতিরিক্ত	৯
	মোট (৭ উইকেট)	১৫৮

বোলিং

	ও	মে	রান	উই:
ডেভিডসন	৯	১	২০	১
মেকিফ	১২	২	২৩	০
লিণ্ডওয়াল	১৬	৫	৪৪	২
ম্যাকে	১১	৫	১৬	১
বেনোড	২৭	১১	৪৬	৩

অন্য দিগন্তের 'নীল' স্বপ্ন

মানুষ-ঘেরা সবুজ হ্রদের ধারে আবার হাজির হলুম ২৪শে জানুয়ারী সকালে। আজকের মনাকাশে অস্ট্রেলিয়ান তারকারা ফুটে আছে। ভারত যা দেখাবার তা দেখিয়েছে,—'বলিহারি খেল',—অন্তত একবার দেখে যাই অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যাটিং,— কলকাতার ক্রিকেট-উদ্দীপনা মরিয়া মনে ভাবছে আর ভাবছে। অস্ট্রেলিয়ানরা ভালো খেলুক, তাদের খেলা দেখতেই তো আসা,—ক্রিকেটের বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারত। কিন্তু—। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ছোট মন 'কিন্তু'-কাঁটাকে জাগিয়ে রাখল। তিক্ত মনে দর্শকেরা ভাবতে লাগল,—বাপুহে, অবশিষ্ট ভারতীয়গণ, তাড়াতাড়ি শেষ কর, রোজ রোজ লাইন দেওয়ার ধকল সহ্য করতে পারি না। ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন রামচাঁদ ও জয়সীমা।

সাড়ে দশটার সময় রোগা ঝড়ো চেহারার মেকিফ ময়দানপ্রান্ত থেকে জয়সীমার বিরুদ্ধে সুরু করলেন। সকলে ভাবল, আর কতক্ষণ? কয়েক মিনিট আগে একটা বিতর্ক হয়ে গেছে গ্যালারিতে, যা প্রায় হাতাহাতিতে পৌঁছেছিল। প্রথম ইনিংসে ভারতের মোট কত রান হবে? একজন বললেন, ১৭০। অন্যজন প্রতিবাদ করলেন, না ১৮৫। ১৫ রান নিয়ে মনকষাকষি হয়ে গেল দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির। বিবাদের সময় উপস্থিত অন্য ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিসম্বাদ ছিল না একটি সিদ্ধান্তে, তা হোল, মাঠের দুই ভারতীয় বাছাধন বেশীক্ষণ টিকবে না। রামচাঁদ, জয়সীমা নৈশ প্রহরী; সারারাত পাহারা দেবার পর ঘুমচোখে সকালবেলা খাড়া থাকা যায় না।

মেকিফের বোলিং দেখে দর্শকের মনে বিশেষ সম্ভ্রমের উদ্রেক হয় নি। হল ও গিলক্রাইস্টের পাঞ্জাব মেলের পর মেকিফ নিতান্তই দিল্লী একস্‌প্রেস। মেকিফের বিস্ময়করতা তাঁর ভঙ্গি-বৈচিত্র্যের জন্য,—বুক চিতিয়ে বাঁ হাতে ফাস্ট বোলিং? তার উপর বল ছোঁড়ার সময় হাতের সন্দেহজনক বাড়তি

ঝাঁকুনি। মেকিফ বিখ্যাত হয়েছেন উদ্ভট কিছু করে। হাটন ঠিকই বলেছেন, ছোকরা টিকবে না। হাতের জোরে ফাস্ট বোলিং হয় না—দেহের ভার তার সঙ্গে যোগ করা চাই। তার জন্য বল ছাড়ার আগের মুহূর্তে হাত, কাঁধ, শরীর এবং পা এক রেখায় আনতে হবে। লিণ্ডওয়াল যার আদর্শ দৃষ্টান্ত।

সে যাই হোক, মেকিফ অবশিষ্ট ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে যথেষ্ট। অপর প্রান্তে ভয়াবহ ডেভিডসন তো আছেনই। বৃদ্ধ পশুরাজ লিণ্ডওয়ালের সব কটা দাঁত এখনো পড়ে যায়নি। তার সঙ্গে যোগ কর বেনোডের বাঁ-দিকে বাঁকা বলের চাতুরি কিংবা ম্যাকের ডাইনে ঢুকে আসা বলের ছুর্বৃত্ততা। ভারতীয় দল পদ্মপত্রে।

ভারতের অধিনায়ক দর্শকের অনুমান সমর্থন করে গেলেন। খেলা শুরুর পনের মিনিটের মধ্যে রামচাঁদের অফ স্টাম্প খসে গেল ডেভিডসনের বলে। মেডেন এবং উইকেট কুড়িয়ে ডেভিডসন ইডেন গার্ডেনে দৌড় দিতে ব্যস্ত,—দেশাই নামলেন। 'আহা, কি বাচ্ছা ছেলেরে!'—সকলে খুব স্নেহ করতে লাগল দেশাইকে। চুল ওলটানো, কলার ওঠানো, সদ্য গোঁফ ওঠা পাড়াতো ছোকরার মত চেহারা। একে ছেড়ে দেওয়া হোল অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তরবাসী দস্যুদলের সামনে? বাছা কতক্ষণ?

'মাত্র' পঁয়তাল্লিশ মিনিট। দশটা চল্লিশ থেকে এগারোটা পঁচিশ। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘটনা-ঠাসা চলচ্চিত্র,—ভারতীয় ব্যাটিং-এর সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল কাল। ঐ সময় ব্যাট করেছেন জয়সীমা ও দেশাই। জয়সীমা উঠতি খেলোয়াড়, এখনো কেতাবী ভাষায় তিনি 'অন্যতম নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান' হয়ে ওঠেন নি। আর দেশাই তো কোনোমতেই ব্যাটসম্যান নন। সওয়া পাঁচ ফুট হালকা শরীর থেকে যাকে বাম্পার বার করতে হয়, তার পক্ষে ব্যাটসম্যান হওয়া সম্ভব নয়। তবু দেশাইয়ের হাত থেকে বেনোডের বলে এমন একটি স্কোয়ার-কাট পাওয়া গেছে, যাকে নিজের হাতে পেলে যে-কোনো প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান খুসী হবেন। ক্যাঙারুর লেজের ঝাপটের কথা এতদিন সসম্ভ্রমে শুনে এসেছি, দেখা গেল ভারতীয় বলদের লেজেও জোর আছে।

এগারোটা কুড়ি মিনিটের সময় অপূর্ব স্কোয়ার কাট মারটি মেরেছিলেন দেশাই। তার আগের চল্লিশ মিনিটের ইতিহাসটি চমৎকার। ভারতীয় পক্ষে এমন সজীব ব্যাটিং দেখিনি বহুদিন। ঠেকার বল ঠেকাও, ছাড়ার বল ছাড়ো, অপেক্ষা করো খারাপ বলের, মারবার জন্য,—ক্রিকেটের এই ধারাপাত খেলাটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ক্যাপ্টেনের পক্ষে মাঠ সাজানো এখন নিতান্ত সহজ। সহজেই তিনি ন'জন ফিল্ডসম্যানকে দিয়ে ব্যাটসম্যানকে ঘিরিয়ে দিতে পারেন। ব্যাটসম্যান মাথার উপর দিয়ে বল তুলে পাঠাতে জানে না। রান বাঁচানোর প্রয়োজন হলে বেড়ার ধারে ফিল্ডার ছড়িয়ে দিতে ক্যাপ্টেনের অসুবিধা নেই,—কারণ খুচরো রানের কায়িক শ্রমে ব্যাটসম্যান গররাজী। অথচ ক্রিকেট-রসিকের জানা আছে খুচরো রানের মজা কত। ছুটোছুটির মজাদারি। সে বাহাদুরি দেখালেন জয়সীমা-দেশাই। জয়সীমা বা দেশাই যখন বল ঠেকিয়েই দৌড়াদৌড়ি করেছেন, তখন গোড়ার দিকে জনতার বচনে ছিল করুণার কৌতুক—এই কর্ বাবা, আউট হবার বেশী তো কিছু করতে পারবি না। কিন্তু ক্রমে খুচরো 'রান-চুরি'গুলো আর চুরি রইল না, রান-দাবী হয়ে দাঁড়ালো। ভারতপক্ষে রান ক্রমেই বেড়ে চললো। বিপদের উত্তেজনা এবং প্রাপ্তির খুসীর অক্ষরে ভরা খেলার শেষ পাতাটি হয়ে উঠল কোনো রহস্য-রোমাঞ্চের শেষ পাতার মত। টাট্টু ঘোড়ার মত ছটফটে দেশাই এবং ভঙ্গিপ্রধান ঢ্যাঙা চেহারার জয়সীমা দুজনে এখন রঙের রাজা।

পড়িমরি রাণের স্ফূর্তি ছাড়াও এই দুজনের খেলায় আরো কিছু ছিল। সেটা স্পষ্ট হোল অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যস্ততায়। দেশাই যখন স্বচ্ছন্দে ডেভিডসনের অতি তীব্র একটি বল সোজা ব্যাটে ব্লক করলেন, কোমরে হাত দিয়ে সে দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডেভিডসন। ছোকরা করে কি? মেকিফকে সরিয়ে দিয়ে স্বয়ং বেনোড এলেন। বেনোডকে এই টেস্টের একটি লজ্জাজনক ওভার বল করতে বাধ্য করলেন দেশাই এবং জয়সীমা। এগারোটা কুড়ি মিনিটের সময় বেনোড যে ওভারটি দিয়েছিলেন, তাতে তিনটে বাউণ্ডারী হয়েছে, দুটো মেরেছেন দেশাই, একটি জয়সীমা। মারগুলো পুচ্ছ খেলোয়াড়ের এলোপাথাড়ি ব্যাট থেকে

বেরোয়নি। স্বতঃস্ফূর্ত সুনিপুণ মার। জয়সীমা রীতিমত ক্রীজে চলাফেরা করে খেলেছেন। অযথা ব্যস্ততা বা সন্ত্রস্ততার কোনো চিহ্ন ছিল না তাঁর খেলায়। প্রয়োজনীয় মেজাজে মোড়া অতি প্রয়োজন ইনিংস। তাঁর স্থানের উপরে তাঁর স্থান।

দেশাইও দেখিয়েছেন, তিনি ব্যাট হাতে কৌতুকাভিনেতা নন। প্রখর অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণের বিরুদ্ধে মুক্ত হাতে ব্যাট চালিয়ে দেশাই দর্শকের মনে এমন আস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে, একবার যখন ডেভিডসনের মুখ থেকে দেশাইকে বাঁচাবার জন্য জয়সীমা পর পর তিনটি খুচরো রান ছাড়লেন, তখন সকলে চেঁচিয়ে বলেছে, জয়সীমা, নিজের চরকায় তেল দাও। অন্যসময় ভারতীয় বোলারদের ব্যাটিং দেখে মনে হয় ব্যাটিংটা বুঝি খেলার বাইরে। দেশাই সে ভ্রান্ত ধারণার সমূহ বিরোধিতা করে গেলেন।

এগারোটা পঁচিশ মিনিটের সময় দেশাই ডেভিডসনের বলে কটবিহাইণ্ড হলেন। মাঠে বেড়িয়ে যাবার জন্য প্রবীণ প্যাটেল এলেন। ভারতীয় দলের রান '১৭০' পেরিয়ে '১৮৫' পেরিয়ে—১৯৪-তে উঠল।

অস্ট্রেলিয়া নামবে দশ মিনিট পরে। অবসর পাওয়া গেছে কিছুক্ষণের। বিড়ালটির প্রসঙ্গ ধরে কতকগুলো টুকরো কাহিনী মনে পড়তে লাগল। বিড়াল ?

ভারতীয় ব্যাটিং-এর শেষ শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিল যা দর্শকের কাছে বাড়তি-ক্রিকেট। এগারোটা নাগাদ সময়ে দেশাইয়ের ব্যাটিং-বীরত্বে দর্শকের হাতে ও মুখে আনন্দবাদ্য বাজছে, সেই সময়ে আনন্দে সায় দিয়ে মাঠে প্রবেশ করল একটি মার্জার (নাকি মার্জারী ? মার্জারীই বোধ হয়)। মার্জারী মহাশয়া মাঠে বেশ খানিক নৃত্যগীত করলেন। কমলাকান্ত শর্মা উপস্থিত থাকলে মার্জারী সংবাদের পুরো বিবরণ পাওয়া যেত। লাইনের ধারে ফিল্ডিং করছিলেন পিটার বার্জ। মার্জারী-নৃত্যে খুসী হয়ে সুস্মিত দার্শনিকতা নিয়ে খানিক নিরীক্ষণ করলেন, তারপরে সপ্রেমে তুলে নিলেন কোলে। আদর করে পিঠে হাত বুলোলেন। শেষে অনিচ্ছাভরে হস্তান্তরিত করলেন পুলিশের কাছে।

শোনা গেল বিচ্ছেদ-অসহিষ্ণু মার্জারী বিদায়ের আঁচড়চিহ্ন এঁকে দিয়েছে শ্রীযুক্ত বার্জের হাতে।

ক্রিকেট যতখানি বর্তমান, ততোধিক অতীত। ক্রিকেটে ইতিহাসের অতি মর্যাদা। আবার এই ব্যাপারটি ঘটেছে 'ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে।' ইতিহাস কী বলে এ ব্যাপারে? লর্ডস মাঠের পানশালার বিড়ালটির কথা স্মরণ করতে পারেন। সুবিখ্যাত বিড়াল,—যার সম্বন্ধে বলা হয়,—'স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্ণারের মতই সুপরিচিত।' দিনে বেশ কয়েকবার সে মাঠে নাটকীয় আবির্ভাব দেয়, বিশেষতঃ যখন দর্শকদের লাঞ্চ-অবশেষ থেকে নিজেদের লাঞ্চ সারতে ব্যস্ত থাকে পায়রা বা চড়াই পাখীরা। বিড়ালটিকে কতবার দেখা গিয়েছে—সে সদর্প অথচ নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগোচ্ছে কোনো একটি পাখীর দিকে—তার ছুটো কাণ এবং প্রতিটি লোম খাড়া। এই সময় হয়ত কোনো একটি বল ছুটে এল সে দিকে—পাখী উড়ে গেল ঝটপট করতে করতে—বাভৎস দৃষ্টি মেলে আশাহত বিড়ালটি তাকিয়ে রইল অন্যায়কারীর দিকে। এই বিড়ালই ১৯৪৮ সালে লর্ডসে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচের সময় একটি অনুপ্রাণিত নৃত্যগীতের ইনিংস খেলেছিল। ক্রিকেট-গ্রন্থ সে ইনিংসটিকে এখনো স্মরণ করে সানন্দে।

আমার মনে হোল পিটার বার্জ নিশ্চয় ইডেনের বিড়ালটিকে লর্ডসের বিড়ালের বংশধর মনে করেছিলেন, কারণ লর্ডস ও ইডেনের মধ্যে ভাব-রক্তের সম্পর্ক আছে।

আজ আরো একটি পশু ইডেন উদ্যানে প্রবেশ করেছিল—একটি কুকুর। দর্শকের গ্যালারি থেকে সোল্লাসে ডগ-রেস দেখেছি ও করতালিতে অভিনন্দিত করেছি। বিরক্ত হয়েছি তার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পুলিসী হস্তক্ষেপে।

ইডেনে কুকুর নতুন নয় সকলে জানেন।

কিন্তু একবার মাত্রই গোরুকে প্রবেশ করতে দেখেছি। যতদূর মনে পড়ছে, কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে খেলার সময়ে। কুকুরেরা বাবুদের ফেলে দেওয়া চপ-কাটলেটের লোভে মাঠের ধারে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু

গোরু আসে কেন? সে নিয়ে দর্শকেরা গবেষণা করেছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, চপ-কাটলেটের জন্যই—ইডেনের সবুজ ঘাস গোরুর কাছে চপ-কাটলেটের তুল্য। অথচ গোরু-বেচারাকে লাল-পাগড়ি লাঠি উঁচিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কী হৃদয়হীনতা! সেদিন আমার পার্শ্ববর্তী জনৈক আধুনিক কবি গোরুদের বড়ো বড়ো করুণ চোখে বঞ্চনার দিগন্ত খুঁজে পেয়েছিলেন।

মাঠে আরো নানা জীব হাজির হয়, যেমন চড়াই। পাখীটা প্রাণ দিয়ে অমর হয়ে আছে। একটা ছুটন্ত বল তাকে মেরে ফেলেছিল। সে সযত্ন আশ্রয় পেয়েছে লর্ডসের সংরক্ষণশালায়। আর বিখ্যাত হয়ে আছে 'সোয়ালো' পাখীটি, যাকে নাকি স্লিপে ফিল্ডিং করার সময় লুফে নিয়েছিলেন সি. বি. ফ্রাই।

ইডেন গার্ডেনের শালিখ পাখীদের আপনারা চেনেন। চেনেন কাঠবিড়ালীদের বা বানর-দম্পতিকে, যারা বাসা নিয়েছে প্যাগোডা-প্রান্তে। কিন্তু চেনেন কি ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামের কালপ্রাচীন শকুনদলকে? ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম শকুনদের বাৎসরিক উপনিবেশ-স্থান। প্রতি বছর ক্রিকেট মরশুমে তারা হাজির হয়। তারা খেলা বড় ভালবাসে। খেলা চলবার সময় মন্দগতিতে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে মাঠের উপরে। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিল এডরিচ কোনো শকুনপালকে দেখতে পাননি বলে দুঃখ করেছেন। তাঁর ধারণা, নিশ্চয় তাঁর খেলা এমন খারাপ হয়েছিল যে, ক্রীড়জ্ঞ শকুনেরা আকৃষ্ট হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ানরা খেলার মাঠে একটি জীবকে বড় বেশী চেনে—যদিও পরোক্ষে। সে জীবটিকে তারা মনে মনে বয়ে আনে মাঠে। সে জীবের নাম ঘোটক। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের রেস-প্রীতির কথা সুবিদিত। তাদের মেলবোর্ন সহর বিখ্যাত দুটি কারণে—ক্রিকেট-মাঠের জন্য ও রেসকোর্সের জন্য। জনৈক ইংরাজ লেখক উদারভাবে জানিয়েছেন, ক্রিকেটার-রূপে অস্ট্রেলিয়া গমন করলে একই পরিশ্রমে ঘোড়দৌড়ের মহৎ শিক্ষা পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ানরা মাঠে নামছে। পশুতত্ত্ব থাক।

অস্ট্রেলিয়া সুরু করল এগারোটা চল্লিশ মিনিটে। দেশাই ফ্যাভেলের বিপক্ষে দৌড় আরম্ভ করলেন হাইকোর্টের দিক থেকে। ও—ও—ও—ও—ক্! প্রথম বলেই আউট চাই। শেষ পর্যন্ত জাতীয়তার জয়। দেশাইয়ের খাটো চেহারা কি করে জোর বল ছুঁড়তে পারে, তার কারণ বোঝা গেল। অতি চমৎকার নিক্ষেপভঙ্গি। বল ছোঁড়ার ঠিক আগে ছিটকে লাফিয়ে ওঠেন এবং বলের পিছনে সমস্ত শরীরের ভার যোগ করে দেন। দেশাইয়ের হাত থেকে ছুটে যাওয়া বলের মতই দেশাইকেও একটা ছুটন্ত মনুষ্যবল মনে হতে লাগল। গ্রাউট অবিলম্বে ভুল করলেন। ব্যাটে খোঁচা লাগা বল উৎসাহের আধিক্যে উইকেটকীপার কুন্দরাম ধরতে গেলেন লাফ দিয়ে, যেটা সহজেই ধরতে পারত প্রথম স্লিপ। ফলে ধরতে পারল না কেউ। যৌথ চেষ্টার করুণ সমাপ্তি। সেটা দেশাইয়ের প্রথম ওভারের পঞ্চম বল, গ্রাউট তখন শূন্য। বিভ্রান্ত কুন্দরামের হাত ফসকে বল গেল বাউণ্ডারীতে তারপরেই। কয়েক মিনিট না যেতে পুনশ্চ আত্মঘাতী উদারতা দেখা গেল ভারতপক্ষে। দেশাইয়ের দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে লেগস্লিপে ফ্যাভেলের সহজতম ক্যাচ ফসকালেন বোরদে। দীর্ঘ সময়ের জন্য বিক্ষুব্ধ মাঠ গ্লানিতে ধিক্কারে ভরে রইল। উপায় নেই, এই দেখতে হবে। বোলারের বুক ভেঙে যাবে, একটার পর একটা ত্রুটির বেড়া টপকে নাচতে নাচতে বিপক্ষের স্কোর উপরে উঠবে।

ভারতীয় মহানুভবতায় কৃতজ্ঞ গ্রাউট বাউণ্ডারী করে চললেন একদিকে, অন্যদিকে ফ্যাভেল প্রান্তরক্ষা করতে লাগলেন সহিষ্ণুভাবে। একজন ভারতীয়কে প্রশংসাযোগ্য দেখা গেল সর্বরকমে, যাঁর নাম—রামকান্ত দেশাই। নিখুঁত তীক্ষ্ণ বোলিং—নিষ্প্রাণ উইকেটে, এবং চকিত চমকে ফিল্ডিং। মার্কিন সিনেমার রোমাঞ্চ-নায়কের মতো বোলিং-ফিল্ডিং-এ দেশাইয়ের তৎপরতা। তার কাছে গুরুভার অধিনায়ক রামচাঁদের বোলিং যাত্রায় ভীমের গদা ঘোরানো। যতদিন রামচাঁদ-ধরণের বোলার দিয়ে বোলিং-এর আরম্ভ করতে হবে, ততদিন ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে—'স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ'। বারটা ছয় মিনিটের সময় প্যাটেলের হাতে বল

দিলেন অধিনায়ক—আনন্দরব তুলে সকলে দি গ্রেট প্যাটেলকে লক্ষ্য করতে লাগল। প্যাটেলের বলে গ্রাউট ও ফ্যাভেল অস্বস্তিবোধ করলেও রান থেমে ছিল না—লাঞ্চের সময় পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার রান হোল বিনা উইকেট ৪১।

লাঞ্চে এদেশীয় কারো কোনো সুখ ছিল না। ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের দু'বার জীবন দিয়েছে। কর্ণের নিজ পুত্রকে উৎসর্গ করার গল্পটা বেনোডকে কেউ শুনিয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু খুশী ছিলেন তাঁরা ভারতবর্ষের ব্যর্থতা-বিশল্যকরণী থেকে প্রাণ পেয়ে। লাঞ্চের পর ভোজনতৃপ্ত অস্ট্রেলিয়ানরা কিছু সময়ের জন্য শান্ত থাকলেও, এবং স্ক্রীনের ধারের গোলমালে কিছু বিরক্তবোধ করলেও, অল্প পরেই আনন্দে বল ছিটোতে লাগলেন মাঠের সব দিকে। দেখা গেল গ্রাউট চারের সুরে কথা বলতেই ভালবাসেন। গ্রাউট প্রথম শ্রেণীর স্ট্রোক প্লেয়ার নন। মারে পালিশের অভাব আছে। কিন্তু মারটা হয় ঠিকই, এবং বল ঠিকই যায় বাউণ্ডারীতে। অপর প্রান্তে ফ্যাভেল ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষক। জানেন, উইকেটে থাকলেই রান হয়, সুতরাং উইকেটে বাসা নেওয়াই তাঁর বাসনা। অদম্য দেশাই সকালের মতই দুপুরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন অক্লান্ত। ভর দুপুরে মেডেন পেয়েছেন, এবং গ্রাউটকে উঁচু ক্যাচ তুলতে বাধ্য করেছেন, যাকে কেনী ধরতে পারেন নি, ধরা শক্ত ছিল বলে, গোপীনাথ চেষ্টা করলে সেটা শক্ত ক্যাচ নাও হতে পারত। দেড়টা বেজেছে, গ্রাউট এক পা এগোলেন, ব্যাট সামান্য তুললেন, কব্জির চমৎকার এক ঠোকা দিয়ে মিডঅন বাউণ্ডারীতে পাঠালেন প্যাটেলের বল। সকলে গ্রাউটকে সংবর্ধনা জানাল—গ্রাউট পঞ্চাশ করেছেন। ভারতীয় প্রীতিকামনার উপযুক্ত প্রতিদান দিলেন গ্রাউট প্যাভিলিয়ানে ফিরে গিয়ে। প্যাটেল ওভারের শেষ বলে গ্রাউটের অফ স্টাম্প বেঁকিয়ে দিয়েছেন। গ্রাউট তাঁর অর্ধশত প্রাপ্য দিয়ে চলে গেলেন পূর্ণ চিত্তে, ভারতীয় দর্শকদের মনে হোল, —তা প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রাপ্তি।

গ্রাউটের বিদায়ের করতালি আরো বড় এক করতালিতে ডুবে গেল—হার্ভে আসছেন। বীরপূজক বাঙালীরা খুবই খুসী। তার আধখানা মন

বলল, হার্ভে খেলুক, অন্য অর্ধ বলল, ফিরে যাক। হার্ভের পাশে, সকলে বলল, ফ্যাভেল বেমানান। সুতরাং ফ্যাভেল আর কেন? জনতার দাবীর পক্ষে সংগ্রাম করলেন কমরেড দেশাই, এবং সে দাবীর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন উদারনৈতিক ফ্যাভেল। ধরাশায়ী মাঝকাঠির দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ফিরে চললেন তিনি। দেশাইয়ের কাণ্ড। আনন্দ আনন্দ। সকলে উত্তেজনায় অধীর। মাঠের নতুন নায়ক আসছে—ও'নীল। শব্দের সমুদ্রে ব্যাটের দাঁড় হাতে ভাসতে ভাসতে হাজির হলেন ক্রীজের দ্বীপে ক্রিকেটের নবকুমার।

মাঠে ঘন গর্জন। সকাল থেকে পরিশ্রম করে, দলীয় ফিল্ডসম্যানদের সমূহ বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশাই এতক্ষণে সফল হয়েছেন। মেডেন উইকেট পেয়েছেন। টেনে এনেছেন পিচের দুই ধারে দুই বীরকে, নীল এবং ও'নীল। পুরোনো এবং নতুন। অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য দলের এগারো জন খেলোয়াড়ের হাতে, একথা বলা হয়। তবু এখন বিশেষভাবে এই দুজনের হাতেই। এঁরা থাকবেন কতক্ষণ—আজ? কাল? খেলে আনন্দ দেবেন, না না-খেলে? স্কোয়ার লেগে প্যাটেলের অফব্রেক বলকে নিজ গতির মুখে ঘুরিয়ে দিলেন হার্ভে। এমন সময়বোধ যে শব্দমাত্র হোল না, অথচ চোখের পলকে বল বাউণ্ডারীতে পৌঁছে গেল। দর্শকের তৃষিত চোখ খেলার সৌন্দর্য-প্রান্তরে পৌঁছে গেছে। তাদের চোখে নীল-স্বপ্ন। অস্ট্রেলিয়ার দ্বি-নীল,—নীল হার্ভে এবং ও'নীল খেলছেন দুদিকে। এদের খেলা বাঁধিয়ে রাখার মত। নিজেদের ক্ষতির মূল্যে তাকে কিনতে হলেও। সকলে খুসীমনে সেকথা স্বীকার করতে লাগল—যতই দেখল নীল-ও'নীলের আত্মবিস্তারের রূপ।

নীল হার্ভে কিন্তু আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন আজ দুপুরে। ৩১ বছরের প্রবীণ হার্ভে একুশ বছরের যৌবনকে পথ ছেড়ে দিলেন। হার্ভের ছেড়ে-দেওয়া সিংহাসন স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করলেন ও'নীল, যিনি নাকি ব্রাডম্যানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। খেলাটা যে কিছুই নয়, খেললেই খেলা যায়,—ও'নীলের ভঙ্গি দেখে তাই মনে হতে লাগল। প্রচারে অক্ষত, প্রত্যাশার সামনেও অব্যাহত ও'নীল ব্যাট করে চললেন। ও'নীলকে দেশাই অফ থেকে আক্রমণ করছেন। ও'নীল নাকি অফে দুর্বল। পৌনে দুটোর

সময় দেশাইকে পেটাতে গিয়ে ও'নীল ফসকালেন, পরের বলে মিস হিট করলেন। ও'নীলের ভুল মার সকলকে অবাক করে দিল, ইতিমধ্যেই এমন দুর্ভেদ্যতার আস্থা সৃষ্টি করেছেন তিনি। সে আস্থা পুনরায় ফুটে উঠল খেলায়। প্রায় দুটোর সময় সৌন্দর্যে বিচলিত স্টেডিয়ামের দর্শক যখন চেঁচাল 'বল হরি হরি বোল', তখন দেশাইয়ের বলে একটি অপূর্ব লেট কাটের মোহনতায় দর্শকদের স্তব্ধ করে দিলেন ও'নীল। অস্ট্রেলিয়া ৯০ মিনিটে ১০০ রান করল। এর অল্প পরেই ও'নীল অফে অন্ততঃ দু'ফুট সরে গিয়ে লেগে বল ঘুরিয়ে লেগের প্রতি নিজের আসক্তির প্রমাণ দিলেন। কিন্তু অফেও যে তিনি দুর্বল নন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল যখন রামচাঁদের বল ও'নীলের ব্যাটের ধাক্কায় কভারে ছুটে গেল গোলার মত। তারপরেই ও'নীলের বিরুদ্ধে প্যাটেলের ও চল্লিশ হাজার দর্শকের আর্ত এল. বি. আবেদন অগ্রাহ্য হোল। হাইকোর্টের দিক থেকে দেশাইয়ের বদলে নাদকার্ণি এলেন। নাদকার্ণিকে সকলে দেখতে চাইছিল, দেখতে চাইছিল ভিনু মানকদের উত্তরাধিকারীকে। ছিপছিপে নাদকার্ণির প্রথম বলেই পুশ করে রান নিলেন ও'নীল। কিছু পরে প্যাটেলের বলকেও ও'নীল একইভাবে ঠেলে দিলেন, একই সুষমায়।

হার্ভের কথা এতক্ষণে ভুলেই গিয়েছিলাম। তাঁর তুল্য ঝকঝকে খেলোয়াড়কে আচ্ছন্ন রাখার মত খেলা খেলছিলেন ও'নীল। হার্ভে আজকে যথেষ্ট বিনীত। এর দ্বারা ভারতীয় বোলিং-এর দক্ষতা প্রমাণিত। নাদকার্ণি এবং প্যাটেল ত্রুটিহীন বল করে চলেছেন। নাদকার্ণি অবশ্য ভিনুর মত ফ্লাইট দিচ্ছেন না বলে। মাঠে প্রচুর হাওয়া থাকলেও বলে তার অভাব। বলকে যথেষ্ট বায়বীয় করতে আরো প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার দরকার হবে। কিন্তু তবু নাদকার্ণি প্রখর। এবং প্যাটেলও নিপুণ। হঠাৎ হার্ভে, যাঁর কথা মনেই ছিল না, দর্শনীয় হয়ে উঠলেন প্যাটেলের বিরুদ্ধে। দুটো ষোল মিনিট—মিড অফে ড্রাইভ করলেন হার্ভে। এবং নীচু দিয়ে ছুটে যাওয়া বলটি মাটি ছোঁয়ার আগেই ছোঁ মেরে তুলে নিলেন জয়সীমা। হার্ভে আউট। এই আউটের জন্য হার্ভের মারের দোষ, প্যাটেলের বলের গুণ, ও জয়সীমার ধরার কৃতিত্ব—

তিন বস্তু দায়ী। তিনটির মধ্যে জয়সীমার প্রাপ্যই বেশী। অস্ট্রেলিয়া ৩—১১৬। অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক হতে হবে। বার্জ এসে গেছেন। খেলা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কী হয় বলা যায় না। যে কোনো অঘটনের কামনায় উত্তেজিত হয়ে উঠল সকলে। সকলে খুব খুসী পঙ্কজের ফিল্ডিং-এ। পঙ্কজ বল ধরলেই আনন্দ। গত বছরের গোলালো পঙ্কজ মেদ ঝরিয়ে সাদা ফোর্ড গাড়ীর মত ছুটছেন। ভারতের গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং চমৎকার। মনে হয় রামচাঁদ ধমক-ধামক দিয়ে খেলোয়াড়দের গা-গতর নাড়াতে বাধ্য করছেন। পারেননি 'নবাব' গোপীনাথকে। গোপীনাথের ফিল্ডিং যথারীতি গা-এলানো। প্যাটেল চেষ্টা করছেন যথেষ্ট। বোরদে এসেছেন লেগব্রেকের প্রলোভন নিয়ে, কিন্তু ও'নীল অনবদ্য, অসামান্য। ছুটো চল্লিশ মিনিটের সময় অস্ট্রেলিয়া ১৫০ রানে পৌঁছে গেল। রানের হার রীতিমত দ্রুত, ১৩৪ মিনিটে ১৫০। এই দেড়শো রানে পৌঁছবার পূর্বে ও'নীল ক্রিকেট-রসিকদের চিরজীবনের কয়েকটি স্মৃতিখণ্ড দান করেছেন, বিশেষতঃ ছুটো চৌত্রিশ মিনিটের সময়কার অপূর্ব শব্দটি—ব্যাট-বলের আনন্দাঘাতের শব্দ—তারপরেই বেড়ার ধারে দর্শকের হাতে বল। নাদকার্ণিকে ও'নীল হাঁটু মুড়ে মেরেছেন। বলটি বলছিল—'this fellow O'nill *strikes* me as a great batsman. পা-মুড়ে মার দেখে উইকসের স্মৃতি মনে এল উইকসের ভীষণতা বাদ দিয়ে। চা-পানের জন্য ও'নীল যখন ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নে, তখন তাঁর রান পঁয়তাল্লিশ এবং বার্জের তের। অস্ট্রেলিয়া—৩-১৫১।

চায়ের পর ও'নীল ঊনপঞ্চাশ কাটালেন দর্শকের 'বলহরি' ধ্বনির মধ্যে। ৭৮ মিনিটে পঞ্চাশ রান। ও'নীল যদি এখনি আউট হয়ে যান তবু সংক্ষিপ্ত ক্লাসিক ইনিংসের গৌরব থেকে বঞ্চিত হবেন না। তাঁর এবং বার্জের খেলায় কিছু অস্বস্তি দেখা গেল এবার। গঙ্গার দিক থেকে ধোঁয়া উঠে আকাশে কালো কালো রেখা টেনে দিয়েছে, আকাশের অজস্র চিল ডানায় 'রৌদ্রের গন্ধ' সঞ্চয় করছে, এমন সময় ও'নীল বোরদেকে সম্পূর্ণ ফসকালেন। ব্যাটসম্যানরা বাঁচলেন কয়েকবার।

তখন ও'নীল নিজের অস্বস্তি কাটাতে তাঁর সবচেয়ে বড় মারটি উপহার দিলেন দেশাইয়ের বলে স্কোয়ার কাট করে। এমন একটি জিনিস দেখবার জন্য সারারাত লাইন দেওয়া যায়। সময়জ্ঞান, দৃষ্টিশক্তি এবং কব্জির জোরে রচিত সুষমার দীর্ঘবিকাশ। এর পরে খেলা কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে পড়ল। অস্ট্রেলিয়ানরা দম নিতে লাগলেন। আরো কয়েকদিন মাঠে বল খোঁজার সম্ভাবনায় ভারতীয়রা বিমর্ষ। অধৈর্য দর্শক শ্লোগান দিয়ে প্যাটেলকে ডাকল। অধিনায়কের অনুমতি নিয়ে প্যাটেল এলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পরাভূত করলেন ও'নীলকে। লাফিয়ে দুহাত আকাশে ছুঁড়তে গিয়ে তোলা হাত কপালে চাপড়ালেন রামচাঁদ। বল উইকেটে লাগেনি। অস্ট্রেলিয়ানরা শীতলভাবে খেলছেন। বিউগিল বাজছে প্রতি বলের সঙ্গে ব্যঙ্গভরে। স্কোয়ার লেগে বাউণ্ডারী করে, অফে কাট করে উত্তর দিচ্ছেন মাঝে মাঝে ও'নীল। প্যাটেলের বলে স্কোয়ার লেগে বাউণ্ডারী করতে অস্ট্রেলিয়ায় রান হল ১৯৬, তিন উইকেটে। ভারতের প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা পেরিয়ে গেল। ভারতের প্রথম রাউণ্ড পরাজয়। ১৯৮ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬ রান। অস্ট্রেলিয়া যে গতিতে রান তুলছে তাতে চমৎকার ভারসাম্য আছে। মিনিটে এক রান করে। এতে জিতবার সম্ভাবনা বেশী। হারবার সম্ভাবনা অল্প। ড্র'ও হতে পারে। এরপর কিছু সময়ের জন্য নাদকার্ণি ব্যাটসম্যানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে অনেকগুলি মেডেন পেলেন। জয়সীমাকে একবার নিষ্ফল ডাকা হোল। খেলা শেষ হয়ে আসছে। তীব্র শীতের হাওয়ার জন্য এবং ভারতের অবস্থার জন্যও বটে, দর্শকদের গা শিরশির্ করছে। সকলে শেষ মুহূর্তে নতুন কিছু, অর্থাৎ দিনান্তের প্রাপ্য উইকেটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। সাড়ে চারটের সময় উন্মত্তের মত নাদকার্ণি ও'নীলের বিরুদ্ধে এল বি আবেদন জানালেন। আম্পায়ারের অবিচলিত মনোভাবের প্রশ্রয়ে ও'নীল নাদকার্ণিকে দর্শনীয়ভাবে লেট-কাট করলেন, এবং উইকেট তুলে নেবার ঠিক আগে যখন বার্জের পায়ে বল লাগাবার সাফল্যে জয়সীমা আবেদন ছাড়লেন, তখনও আম্পায়ার আজ সারাদিনের অভ্যাসমত নিরুত্তর রইলেন। জয়সীমার

করুণ মিনতি সকলকে স্পর্শ করল,—'তুমি আঙুল তোল না কেন আম্পায়ার ?' দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার তিন উইকেটে ২২৯। তৃপ্তিকর অবস্থা।

নরম্যান ও'নীল আজকের মাঠের বীর। যত শোনা যায় সবটা সত্য নয়—কথাটা যে মিথ্যে হতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে ও'নীল তা প্রমাণ করেছেন আজ। সংবাদপত্রের বিবরণকে ও'নীল বাস্তব করেছেন ইডেন উদ্যানে। ও'নীল সম্বন্ধে বিশেষভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

'কে লইবে মোর কার্য ?'—সন্ধ্যারবির এই প্রশ্নের উত্তরে জগৎ নিরুত্তর ছবি থেকে গিয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-রবি ব্রাডম্যান যখন স্বেচ্ছাবসান বরণ করলেন, তখন তাঁর কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিশেষতঃ অস্ট্রেলিয়ানরা। কারণ বীরের আসন পূর্ণ না হলে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে অরাজকতা আসবে। তাই আগামী-ব্রাডম্যান ও আগত-ব্রাডম্যানে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-মাঠ ভর্তি হয়ে গেল। ভিড় পরিষ্কার হতেও দেরী হোল না। দুজন ছোকরা তার মধ্যে দাগ কাটল—কিছু পূর্ববর্তী আয়ান ক্রেগ ও নিতান্ত বর্তমানের নরম্যান ও'নীল। আয়ান ক্রেগ-রূপী ব্রাডম্যান অকালে ক্রীড়াত্যাগ করছেন, মাঠে আছেন নরম্যান ও'নীল। তাঁকে অনেক পথ হাঁটতে হবে ব্রাডম্যান-শিখরে পৌঁছবার পূর্বে।

কোনো দিন সত্যই পৌঁছবেন কি ? ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে না, ভবিষ্যৎ-বক্তৃতার সহজ অধিকারসম্পন্ন ক্রিকেট-লেখকেও না। কোনো একটি খেলার জন্য ব্রাডম্যান মহান নন, বহু সময়ের বহু সংখ্যক অসামান্যের মধ্যেই তাঁর মহিমা। ও'নীলের ভবিষ্যৎ-জীবন কতখানি দীর্ঘায়ত হবে তার উপরই নির্ভর করছে তাঁর ব্রাডমানত্ব। এখন বর্তমানে নিবদ্ধ থাকাই ভাল।

কলকাতায় আজ ও'নীল যে খেলা দেখিয়েছেন, তা যে ইডেন গার্ডেনের শ্রেষ্ঠ ইনিংসের অন্যতম তা ক্রিকেটের বহুদর্শী ব্যক্তিদের সোচ্ছ্বাস উক্তি শুনলেই বোঝা যায়। গত মরশুমে আর একটি শ্রেষ্ঠ ইনিংস দেখেছি

কানহাইয়ের! সোবার্সও ভাল খেলেছেন। ১৯৫৬ সালে হার্ভের খেলা মনে পড়েছে। তার আগে ১৯৪৮ সালে উইকসের। মধ্যে ওরেলের স্বল্পস্থায়ী সুষমা। এই সকল ইনিংসের মধ্যে আমার বিবেচনায় একদিক থেকে ও'নীল সকলের উপরে—তাঁর খেলার ক্লাসিক্যাল রীতিতে। যুদ্ধবাজ অস্ট্রেলিয়ানরা খেলার সময় স্বাধীনতাকে ভালবাসে। তারা অপেক্ষাকৃত অল্পদিন খেলে, কিন্তু যতদিন খেলে চোখের ও শরীরের পটুতার প্রমাণচিহ্ন রেখে দেয় খেলার প্রতি অংশে। ও'নীলের মধ্যে কিন্তু ইংরেজী-রীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেল। ও'নীলের কলকাতার ইনিংসে ছিল না উইকসের নির্মমতা, ওরেলের মনোহারিতা, কানহাইয়ের বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য। একমাত্র সোবার্সের সঙ্গেই তুলনা করা যায় ও'নীলের। কিন্তু সোবার্সের গত বছরের ইডেনী ইনিংসের বহু যোজন এগিয়ে আছে ও'নীলের ইনিংস, যদিও দুজনের ভঙ্গি প্রায় এক। সোবার্স অবশ্য কিছু বেশী ঢিলেঢালা, ও'নীল অনেক বেশী নিখুঁত, নিশ্চিন্ত, অভ্রান্ত এবং সৃষ্টিশীল। আমি উভয়ের ইডেন গার্ডেনের ইনিংসের উপর নির্ভর করেই এই মন্তব্য করছি।

ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে ও'নীলের খেলা দেখে প্রভূত প্রশংসার পরেও বিজয় মার্চেণ্ট ঈষৎ বিদ্রূপ না করে পারেন নি—ও'নীল নাকি ব্রাডম্যান? মার্চেণ্ট বলেছেন, ও'নীল যে-সময়ে সেঞ্চুরী করেছেন, তরুণ ব্রাডম্যান সে সময়ে তিনশো রান করে ফেলতেন। কথাটা ঠিক। ও'নীল ব্রাডম্যানের চেয়ে ধীর। ও'নীল বয়সের তুলনায় পরিণত। ব্রাডম্যানের ভ্রান্তিহীন সংহারের পরিবর্তে নীতিশীল আক্রমণই তিনি পছন্দ করেন। ব্রাডমানকে দমিয়ে রাখতে পারে, এমন বোলারের সন্ধান ব্রাডম্যান পান নি তাঁর যৌবনে। বডিলাইন সিরিজের সময় লারউড কিছু পেরেছিলেন—বলের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু অভিসন্ধি মিশিয়ে দিয়ে। অথচ ও'নীল প্রশমিত থাকেন ভারতবর্ষেও, যেখানে উইকেটে অবিশ্বাস নেই (কানপুর বাদ), বোলিং-এ নেই অভব্য গতি, কিংবা অভাবিত স্পিন। ব্রাডম্যান ও হ্যামণ্ডের তুলনা করে সমালোচক বলেছেন,—"হ্যামণ্ডকে শান্ত রাখা সম্ভব, ব্রাডম্যানকে কখনো নয়। সিডনির টেস্ট ম্যাচে (১৯৩৬-৩৭) হ্যামণ্ড

১৯৫৯-৬০ সালের ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়গণ

১৯৫৯-৬০ সালে ভারত সফরকারী অষ্ট্রেলিয়ান দল

প্রায় আট ঘণ্টা ব্যাট করেছিলেন, এবং তৃতীয় দিন সকালেও, যখনো তিনি উইকেটে আছেন,—তখনো ইংলণ্ডকে নিরাপদ অবস্থায় আনতে পারেন নি। ঐ একই সময়ের মধ্যে ব্রাডম্যান সমস্ত বোলিং-কে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারতেন।"

নরম্যান ও'নীল বোধহয় হ্যামণ্ডের ধারাতেই আসছেন। তাঁকে যদি ব্রাডম্যানের পথবর্তী বলা হয়, সে ও'নীল খুব বড় ব্যাটসম্যান, এই কথাটি বোঝাবার জন্য। ব্রাডম্যান আধুনিক ক্রিকেটের মানদণ্ড।

হ্যামণ্ডের মধ্যে ছিল অভ্যস্ত পেশাদারী নিপুণতা ; প্রশস্ত কিন্তু বিচিত্র নয়,—যাকে সাধারণভাবে বলা চলে না অগ্নিগর্ভ। হ্যামণ্ড তাঁর প্রতিভাকে ঢালাই করেছিলেন প্রয়োজনের ছাঁচে। তাতে 'প্রতিভা হয়ত নিঃশেষিত হয়নি, কিন্তু প্রাণপূর্ণতা হয়েছিল সঙ্কুচিত।' হ্যামণ্ড হয়ে উঠেছিলেন পরিপূর্ণ টেস্ট ক্রিকেটার, ক্রিকেটের সুমহান আভিজাত্য। ব্রাডম্যানের খেলায় শেষ পর্যন্ত একটা 'আদিমতা' ছিল, প্রতিভাবেষ্টিত যে আদিমতা পৃথিবীকে জয় করল সবলে।

নরম্যান ও'নীল অস্ট্রেলিয়ায় জন্মেও হ্যামণ্ড-স্বভাব আয়ত্ত করেছেন। তবে হ্যামণ্ড—হাটন নয়। হ্যামণ্ডের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতা আইনগ্রন্থ থেকে আসেনি কেবল, সে হোল মহত্তের স্বাভাবিক আত্মশাসন। অপরপক্ষে হাটনের বৈজ্ঞানিকতার মধ্যে আছে কারিগরির প্রাধান্য। হ্যামণ্ড রীতিকে মেনেছেন রীতির গৌরব বাড়াতে।

নরম্যান ও'নীলের মধ্যে আছে ভারসাম্য, বৈজ্ঞানিকতা, ছন্দ-জ্ঞান, নিয়মতান্ত্রিকতা ও আত্মস্থতা। এ কথাগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে হ্যামণ্ড সম্বন্ধেই। ব্রাডম্যান নিয়মের রাজত্বে অনিয়ম এবং অনিয়মের রাজ্যে নূতন নিয়মের স্রষ্টা। হ্যামণ্ড নিয়মের সম্রাট।

আমি হ্যামণ্ডকে দেখিনি, কিংবা ব্রাডম্যানকে। তাঁদের বিষয় পড়ে আমার যা মনে হয়েছে, তাই বলবার চেষ্টা করলুম।

নরম্যান ও'নীলের খেলা দেখে তাঁকে মিলিয়ে নিতে চাইলুম ব্রাডম্যানের খেলার কল্পিত রূপের সঙ্গে, কারণ ও'নীল প্রসঙ্গে ব্রাডম্যানের কথা বারবার উঠেছে। ব্রাডম্যানের চেয়ে হ্যামণ্ডের সঙ্গে মিলই বেশী মনে হোল।

এদেশের যদি কেউ হ্যামণ্ড, ব্রাডম্যান এবং ও'নীল, তিনজনকেই খেলতে দেখে থাকেন, তিনি আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবেন।

শেষ কথা, ও'নীলের ইনিংসের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়েছে তাঁর সময়জ্ঞান। ও'নীলের বল যখন বিদ্যুৎগতিতে বাউণ্ডারীতে ছুটেছে, তখনও ব্যাটে যে শব্দ বেজেছে তা আশ্চর্য রকমের কোমল ও মৃদু। ও'নীল সম্বন্ধে আরো একটি কথা,—তিনি দর্শকচিত্তে কল্পনার উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন নি। ত্রুটিহীন অভিব্যক্তিতে তিনি দর্শককে মুগ্ধ করেছেন, কিন্তু উত্তেজিত করতে পারেননি দুঃসাহসে, যেমন ধরা যাক করেছিলেন উইকস, যেমন করতেন আমাদের অমরনাথ বা মুস্তাক আলী। এমনকি কানহাইয়ের সুখময় বিস্তারশীলতাও তাঁর ছিল না। কানহাই সম্বন্ধে বলেছিলুম মনে পড়ছে, তিনি বিক্ষিপ্তির শ্রেষ্ঠ শিল্পী। বলকে ইতস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত করে তিনি মাধুর্যের সঞ্চার করেন। বলের শাসনে নয় শোধনে কানহাইয়ের ইনিংস ইডেন গার্ডেনে অনতিক্রান্ত। ও'নীলের খেলা দেখার পরেও সে মন্তব্য বলবৎ থাকল। ও'নীল বলের শাসনই করেছেন। তবে শাসনের মধ্যে এমন নির্ভুল বিচারবোধ, অননুকরণীয় শিক্ষানীতি আছে যে, সে শাসনকে বলদৃপ্ত মনে হয়নি। শিথিল অলস বিলাসীও মনে হয়নি ও'নীলকে, যেমন মনে হয়েছিল ওরেলকে।

ও'নীলের খেলা দেখে একটি অভাবের কথা মনে হয়েছে—তাঁর সামনের পায়ে মারের স্বল্পতা। ও'নীল মূলতঃ পিছন পায়ের খেলোয়াড়। তবে জাত খেলোয়াড় বলে সামনের পায়ে যখন মেরেছেন, অমর মুহূর্তের সৃষ্টি সেগুলি। এইখানে বলা চলে, ক্রিকেটে সামনের পায়ে মারিয়ে খেলোয়াড়রাই দৃশ্যসৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন বেশী। পিছিয়ে ধাক্কা দেওয়ার চেয়ে ঝাঁপিয়ে মার দিলেই খুসী হয় চোখ আর মন। পিছন পায়ে মারের মধ্যে আছে নিপুণতা, সামনের পায়ের মারে—মহিমা। ও'নীল পিছন পায়ে মারের মত সামনের দিকে মারে সমান স্বতঃস্ফূর্ত নন, এই কথা বলতে আমার জনৈক ক্রিকেটার-বন্ধু বললেন, আপনি ও'নীলের উপর অবিচার করছেন। নেটে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'সম্মুখ সমর'। ও'নীল যে

টেস্ট ম্যাচে ইডেন গার্ডেনে সে রকম পরিমাণে সামনের দিকে মারেন নি, তা ও'নীলের প্রতিভাকেই প্রমাণ করছে। ইডেনের পিচ এই বছর নিতান্ত মন্থর। সামনের পায়ে মারতে গেলেই বল উঠে পড়বে,—যেজন্য হার্ভে আউট হলেন। উইকেটের অবস্থা বুঝেই নিজেকে সংবৃত রেখেছিলেন ও'নীল।

বন্ধুর কথা সম্ভবত সত্য। তাতে ও'নীলের মহিমাই প্রমাণিত হয়। আর প্রমাণিত হয়, বয়সের তুলনায় তাঁর প্রবীণতা। ও'নীল সম্বন্ধে আমার শেষ ভয় জাগতে লাগল, যান্ত্রিকতার দিকে তিনি কি তবে এগিয়ে যাবেন? এই সময় একটি অপূর্ব অনুচিতকে দেখলুম। দেখলুম, অফে কয়েক ফুট সরে গিয়ে ও'নীল লেগে বল ঘোরালেন। আনন্দে মন শিউরে উঠল। কল্পনায় দেখলুম ব্রাডম্যানের ক্রশব্যাটের ঔদ্ধত্য, স্মৃতিতে ভেসে এল কম্পটনের এলোমেলো ব্যাটের আর্যপ্রয়োগ। ও'নালের লেগের দিকে মারে আসক্তি আছে। সেইখানেই মুক্তি।

ভারত—প্রথম ইনিংস

বি. কে. কুন্দরাম ব ম্যাকে	...	...	১২
নরী কণ্ট্রাকটর ব বেনোড	...	...	৩৬
পঙ্কজ রায় ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	...	...	৩৩
বাপু নাদকার্নি ক ডেভিডসন ব লিণ্ডওয়াল	...	...	২
আর বি কেনী ক গ্রাউট ব লিণ্ডওয়াল	...	...	৭
সি. ডি. গোপীনাথ ব বেনোড	...	...	৩৯
সি. বোরদে ব বেনোড	...	...	৬
জি. এস. রামচাঁদ ব ডেভিডসন	...	...	১২
এম. এল. জয়সীমা নট আউট	...	...	২০
আর. বি. দেশাই ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	...	...	১৭
জেসু প্যাটেল রান আউট	...	...	০
		অতিরিক্ত	১০
		মোট	১৯৪

বোলিং

	ও	মে	রান	উইকেট
ডেভিডসন	১৬	২	৩৭	
মেকিফ	১৭	৪	২৮	
লিণ্ডওয়াল	১৬	৫	৪৪	
ম্যাকে	১১	৫	১৬	
বেনোড	২৯.৩	১২	৫৯	

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

লেস ফ্যাভেল ব দেশাই	...	...	২৬
ওয়ালী গ্রাউট ব প্যাটেল	...	...	৫০
নীল হার্ভে ক জয়সীমা ব প্যাটেল	...	...	১৭
নরম্যান ও'নীল নট আউট	...	...	৯৩
পিটার বার্জ নট আউট	...	...	৪৩
		অতিরিক্ত	০
	মোট (৩ উইকেট)		২২৯

বোলিং

	ও	মে	রান	উইকেট
দেশাই	২১	২	৭৪	১
রামচাঁদ	৬	০	১৭	০
প্যাটেল	১৬	০	৭৯	২
নাদকার্নি	১৫	৭	২৬	০
বোরদে	৭	১	১৬	০
জয়সীমা	৪	০	১৭	০

নানা মনের দিন

তৃতীয় দিন সকালে মাঠে প্রবেশ করার কালে বিশুদ্ধ ক্রিকেট-প্রীতিতে ভরপুর ছিলাম। অস্ট্রেলিয়ানরা একটা বড় রকমের স্কোর করবে অক্লেশে, চল্লিশ হাজার দর্শক নৈপুণ্যের প্রদর্শনী দেখে আনন্দে শিউরে শিউরে উঠবে, ভাববে কি চমৎকার,—কী অদ্ভুতভাবে আমাদের ছিন্নভিন্ন করছে! তারপরে অস্ট্রেলিয়ানরা রান-পান-রসে প্রমত্ত হয়ে আমাদের বাছাদের একটির পর একটিকে ধরে উইকেটের সামনে বলি দেবে। তা দেখে আমাদের কলা-কৈবল্য প্রাপ্তি হবে। এই সব সুন্দর আর্টের ভাবনা নিয়ে আসনে বসেছি—চোখ তুলতেই সামনে দেখা গেল কালো স্কোরবোর্ডের উপর বিজয়-কাব্য,—তিন উইকেটে দুশো উনত্রিশ,—ভারতীয়দের ঘামে ও রক্তে মাখানো অস্ট্রেলিয়ান সৃষ্টি।

ও'নীল ৯৩ রানের উপর নতুন করে স্টান্স নিলেন। প্রায় সেঞ্চুরীর মত একটা বিপজ্জনক সম্পদ আয়ত্ত করেও কোনো মানসিক অশান্তি নেই।

টেস্ট সেঞ্চুরী যে ক্রিকেটারের জীবনের মহারত্ন ও'নীলের যেন সে কথা মনেই নেই, এত সম্পদ তাঁর। শরীর ও মনকে প্রতিভার তারে জড়িয়ে যা করা যায়, তেমন সৃষ্টিধর্মী খেলা খেলে যেতে লাগলেন ও'নীল। গতকালকার চেয়েও সাবলীল এবং উন্নত। পৌমে এগারোটার সময় রামচাঁদের বলকে স্কোয়ার লেগে চোখের পলকে পাঠিয়ে সেঞ্চুরী করলেন। ক্রিকেটের গৌরব ঘোষিত হোল হাজার হাজার মানুষের সানন্দ অভিনন্দনে। আনন্দের গর্জন থামতে গিয়েও বারবার না থেমে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে থরে থরে খুলে ধরল। মালা হাতে কয়েকজন দৌড়ল মাঠের মধ্যে 'ধাবন্ত' পুলিশকে পিছনে নিয়ে।

এইটেই ছন্দপতন। মাল্যদানটা আড়ালে সারো। বোম্বাই কালচারকে বাংলা আর রুখতে পারছে না। সমাল্য 'স্বয়ংবরা' যুবকবৃন্দকে দেখে অধিকাংশ দর্শকের ভালো লাগেনি। কেউ কেউ সমর্থন করে বললেন, খেলাটা আনন্দের বস্তু, আর মাল্যদান হোল আনন্দের অভিব্যক্তি। বেশীর ভাগ বাঙালী দর্শকের মত হোল, আনন্দ মানে ফচকেমি নয়।

মালা পেয়েও ও'নীল হৃদয়দৌর্বল্য দেখালেন না। পূর্ববৎ স্বচ্ছন্দে ব্যাট চালিয়ে মাঠের সব দিকের ফিল্ডসম্যানকে ব্যস্ত রাখলেন। এবং আউটও হলেন একইভাবে। এগারোটা বাজার পরেই দেশাইয়ের বলে অফে কাট করলেন। একটা কট্ করে শব্দ হোল। সুন্দর মার দেখার প্রত্যাশায় চোখ চলে গিয়েছে বাউণ্ডারীর সীমানায়—না, আ—হা—হা—আউট! উইকেট-কীপারের হাতে বল। ও'নীল—১১৩। তের'র কুসংস্কারে বন্দী ও'নীল দর্শকদের অকুণ্ঠ সমাদরের মধ্য দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। এবার সম্মোহনমুক্ত হয়ে অন্য খেলোয়াড়দের হিসেব নেওয়ার অবসর হোল। ও'নীলের বিরুদ্ধযোদ্ধা দেশাইকে চোখে পড়ল, আকারে ক্ষুদ্র, প্রাণে পূর্ণ ডায়নামোটিকে। কয়েক মুহূর্ত আগেও যার প্রতিটি মার বেতারে কান ডুবিয়ে সপ্তসিন্ধুপারে হাজার হাজার মানুষ 'দেখছিলেন', সেই ও'নীলের পক্ষেও সামান্য ছিল না দেশাইয়ের আক্রমণ। দেশাইকে দিয়ে ক্রিকেটের একটি বজ্র নির্মিত হয়েছে, যাকে ব্যবহার করতে পারার মত দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী অধিনায়ক রামচাঁদ।

দেশাই যে ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিতীয় ফজল মামুদ হয়ে উঠছেন, প্রমাণ করে দিলেন অবিলম্বে। এগারোটা ষোল মিনিটে দেশাইয়ের বলে অফস্টাম্প খুলে বেরিয়ে গেল, বাকি দুটো বেঁকে রইল করুণভাবে। সাইক্লোনের পরের দৃশ্য। দেশাই-ঝটিকাকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন বার্জ, উড়ে গেলেন। বার্জ আউট হওয়ার পরে সকলে সচেতন হোল তাঁর বিষয়ে। তিনি অনেকক্ষণ ও'নীলকে সঙ্গদান করেছেন, অস্ট্রেলিয়াকে রান-দানও করেছেন ভালমতে,—কম নয় ৬০। তার মানে একবার ৫০ রান পেরিয়েছেন এবং হাততালি পেয়েছেন অর্ধশতের। মনে পড়ল এই বার্জের বিরুদ্ধে দেশাই বাম্পার দিয়েছিলেন, ফলে জনতা চেঁচিয়েছিল, দুর্বোধ্য একটি চীৎকার, যা দেশাইয়ের কৃতকর্মের সমর্থনে না প্রতিবাদে বোঝা যায়নি। সাফল্যে অধীর দেশাইকে এখন আর মিডিয়াম ফাস্টের মধ্যে ধরে রাখা যাচ্ছে না। ম্যাকে নামামাত্র প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে দেশাই বাম্পার ছাড়লেন। ম্যাকের বুকে লাগল। দেশাই মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম করছেন। ম্যাকেকে সুস্থির হতে দেবেন না। ছোকরার দংশনে ম্যাকেও অস্থির। মাঠ রীতিমত উত্তেজিত ও উত্তপ্ত। ভারত আর শান্তিনীতিতে অবিচল নেই। তাতে আপোষবিরোধী জনসাধারণের উল্লাস। দর্শকের উত্তেজনায় চালিত হয়ে তরুণ বালকের মত দৌড়চ্ছেন প্রবীণ পঙ্কজ। পঙ্কজের গ্রাউণ্ড-ফিল্ডিং আজ স্পার্কলিং। দেশাইয়ের গুড লেংথের বল লাফিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। রামচাঁদ ম্যাকের ব্যাটের একেবারে মুখে সর্ট লেগে টেনে এনেছেন জয়সীমাকে। বয়স্ক প্যাটেলের বলে বুদ্ধির ক্রূরতা। সন্ত্রস্ত ম্যাকে ব্যাট না তুলেও উদ্‌ভ্রান্ত। অবস্থা ঘনীভূত। এমন সময়ে জলের গাড়ী গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠে ঢুকল। অস্ট্রেলিয়ানরা ভাবল বাঁচা গেল, ভারতীয়রা ভাবল জলদানের পুণ্য কর্মকে বিলম্বিত করলে ধর্ম কি রসাতলে যেত ?

জলপান করে দেশাই শান্ত হলেন। অস্ট্রেলিয়ানরা ধাতস্থ। সাড়ে এগারোটার সময় প্যাটেল এলেন হাইকোর্ট-প্রান্তে। গৌরবময় বোলিং-এর পর বিশ্রাম নিলেন দেশাই। অল্প পরেই পানতৃপ্ত সরস মনের পরিচয় দিলেন অধিনায়ক রামচাঁদ—প্যাটেলের বলে স্লিপে ম্যাকের অতি সহজ

ক্যাচ ফেলে। বীতশ্রদ্ধ কণ্ঠে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, তাহলে তোমাকে দলে রাখা হবে কেন? না ব্যাটিং, না বোলিং, ফিল্ডিং পর্যন্ত নয়। সুসভ্য কণ্ঠে জানালেন অন্য একজন, ভারতীয় দলে ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং-হীন নির্ভেজাল অধিনায়কত্বই রামচাঁদের অবদান। প্রথম ব্যক্তি আরো চটে গিয়ে বললেন, তার মানে শুধু দারোয়ানি?

অন্যপক্ষে শুধু বোলিং-এর জন্য প্যাটেল দলে ঠাঁই পেয়েছেন। পদ্মশ্রীও পেয়েছেন। ম্যাকডোনাল্ড ও ম্যাকে যখন ওপেনিং পাটনারের মত ধীর স্থিরভাবে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন প্যাটেল তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের তাগিদে আউট করলেন ম্যাকেকে—আউট করার শেষ উপায় অবলম্বন করে—ম্যাকে বোল্ড হলেন প্যাটেলের বলে। অস্ট্রেলিয়া ৬—২৯৯। নিরেনববুইকে চোখে রেখে লিণ্ডওয়াল নামলেন। বল স্পিন নিচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ড লিণ্ডওয়াল, সাবধান। প্যাটেল জোরের উপর অফব্রেক করাচ্ছেন। পুঁটু চৌধুরী তুমি কোথায়? দ্রুত অফব্রেক বোলিং-এ আধুনিক ভারতের তুমি সেরা বোলার। অন্যদিকে নাদকার্নি নিখুঁত টানা ধাঁচের অফব্রেক বলে মেডেন নিয়ে রানসংখ্যার গতি-নিবারণে সচেষ্ট। লাঞ্চের ঠিক আগে হাইকোর্টের দিকে বোরদে এলেন; বুক চিতিয়ে, বল ছাড়ার মুখে এক মুহূর্ত থেমে বিচিত্র ভঙ্গিতে বল করলেন। কিন্তু লাঞ্চ পর্যন্ত নতুন কিছু ঘটল না, দর্শকদের বিরক্তি-উৎপাদক কয়েকটি মাইকে ঘোষণা ছাড়া। খেলার মাঠে ইদানীং আকাশবাণীর যথেষ্ট প্রসার। হাতে হাতে ট্রানজিস্টার রেডিও সেট। মাঠে বসে ভদ্রমহোদয়েরা রেডিও মারফৎ খেলা শেখেন। এ ছাড়াও ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষের একটি নিজস্ব আকাশবাণী আছে। কর্তৃপক্ষ খেলার ক্লান্তি দূর করার জন্য, দর্শকের উপকারের জন্যও বটে, মাইকবাণীর ব্যবস্থা করেছেন। 'বাড়ীতে গুরুতর অসুখ এখনি চলে আসুন',—একথা ঘোষিত হলে সকলে সহানুভূতি জানান। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, রুগী ফেলে মাঠে না আসাই উচিত ছিল। ডাক্তারদের যখন ডাকা হয়, নিন্দুকে বলে ডাক্তারদের পাবলিসিটি বাড়ছে। কিন্তু 'আপনার দাদা লাঞ্চ নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি যান,'—একথা শুনে অনেকেরই মনে হোল, 'আকাশবাণী'র প্রোগ্রাম

খুবই নেমে গেছে। প্যাভিলিয়ানের লাঞ্চের ডাকে সাড়া দিয়ে খেলোয়াড়রা যখন প্রস্থান করলেন—তখন অস্ট্রেলিয়া—৬—৩১৩।

লাঞ্চের পর ক্রিকেটের একটি চির সত্যের নব উদ্ভাস দেখা গেল,—শূন্য থেকে পূর্ণ হয়ে উঠা। চাঁদু বোরদে যা হলেন। গতকাল বোরদে ছিলেন অসহ্য ও অমার্জনীয়, সোজা ক্যাচ ফসকানোর জন্য। তাঁর সুন্দর ফিল্ডিং পর্যন্ত দর্শকের ব্যঙ্গ-চীৎকারে বিদ্ধ হয়েছে। রাত্রে অনেকগুলি বিনিদ্র প্রহর কেটেছে বোরদের। শেষ লগ্নের সম্মুখীন তিনি। কঠিন পাণিতে তাকে যদি গ্রহণ না করতে পারেন, পাণিগ্রহণটা এজন্মে নাও হতে পারে। বোরদে রাত্রে মনস্থির করেছিলেন। সকালে অভ্রান্ত হাতে ও'নীলের উইকেট বহু গজ দূর থেকে বল ছুঁড়ে ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার নমুনারূপ দেখালেন। ও'নীল রান আউট হননি, আগেই ক্রীজে পৌঁছে গিয়েছিলেন. কিন্তু বোরদে ভরসা পেয়েছিলেন মনে মনে। লাঞ্চের আগে সামান্য ক্ষণের জন্য বোরদেকে ডাকা হোল। কাঁধ থেকে নখের ডগা পর্যন্ত বেঁকিয়ে বলে স্পিন দিয়েও কিছু হোল না, দু'এক ওভারে কিছু হয় না। লাঞ্চের পর পুনশ্চ আহূত বোরদে নিজ অধিনায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। আর সহানুভূতি বোধ করলেন প্রবীণ ম্যাকডোনাল্ডের উপর, খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর অযথা পরিশ্রমে। ম্যাকডোনাল্ডের দ্বিধাগ্রস্ত পা-খানিকে টেনে আনলেন উইকেটের সামনে, তাতে বলের টোকা দিকে মধুরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন পিছন ফিরে,—কি মনে হয় আম্পায়ার? আম্পায়ারের কাছে আবেদন-নিবেদনের পালা চলেছে গতকাল থেকে। এই প্রথম গলার দরখাস্তে মঞ্জুরের উঁচু আঙুলের দস্তখত পড়ল। বোরদে এখানেই থামবার লক্ষণ দেখালেন না। লোকনিন্দা দূর করতে হলে আরো কিছু কসরত দেখাতে হবে। অবশ্য বোরদের পরবর্তী কসরতের আগেই বাচ্ছা দেশাই অবসর দেবেন অবসরমুখী লিণ্ডওয়ালকে। দেশাইয়ের বলে কট বিহাইণ্ড হয়ে লিণ্ডওয়াল এদেশীয় শাঁখঘণ্টার মহিমা প্রমাণ করে যাবেন। অনেক আধুনিক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা সে মাহাত্ম্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। ২৫শে জানুয়ারী একটা আটত্রিশ মিনিটের সময় তাঁদের অবিশ্বাস কিছু টলেছিল। ঠিক ঐ সময় স্টেডিয়াম-মন্দিরেতে ঠং ঠং কাঁসর বেজেছে এবং

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেশাইয়ের বলে আউট হয়েছেন লিণ্ডওয়াল। যাঁরা বাজিয়েছেন তাঁদের সংযমকে ধন্যবাদ। সারা দিনের মধ্যে ঐ একবারই ঘণ্টা বেজেছে এবং উইকেটও পড়েছে। লোভে পড়ে তারপরে বারবার ঘণ্টা বাজিয়ে ঘণ্টাকে তাঁরা খেলো করেন নি। ধর্মধ্বনির সমাদর আছে আমাদের ক্রিকেট-মাঠে। 'বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে', 'বলহরি হরিবোল' তো ক্ষণে ক্ষণে শোনা যায়।

সকলের আদরের দেশাই একটা উইকেট কেড়ে নেবেন বোরদের কাছ থেকে। বোরদের স্পিন বুঝতে না পেরে ছুটোপাটি করে বল ধরবার চেষ্টা করবেন কুন্দরাম। কুন্দরাম ছুটি ক্যাচ ধরেছেন উইকেটের পিছনে। কিন্তু উইকেটরক্ষার নিম্নমানের নমুনাও দান করে গেছেন। তিনি বল ধরেন নি, থামিয়েছেন। লোভী বালকের মত বল নিয়ে খামচাখামচি করেছেন। প্রমাণ করেছেন, টেস্ট উইকেট-কীপারের স্থান পেয়েছেন অকালে। এ সমস্ত জিনিস মুছে যাবে বোরদের কীর্তিতে। সেই ক্যাচটি, নিজের বলে যা তিনি এক হাতে ধরেছিলেন, যে অবিশ্বাস্য ব্যাপারটির জন্য ভগ্নমনে বেনোডকে ফিরে যেতে হয়েছিল, সেই বিস্ফারিত-চোখে চেয়ে দেখার ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন বোরদে। সেখানেও থামেননি, ডেভিডসনের মতো মারমার মরদ যখন পর-বল-সহিষ্ণুতা দেখিয়ে বিস্ময়-সৃষ্টি করতে লাগলেন, তখন বোরদে ডেভিডসনকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করে লেগব্রেকের এক দীর্ঘ ঘোরাপথে উইকেট ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এসব বোরদেই করেছিলেন। 'জীরো' থেকে 'হীরো'। 'চাঁদু' বোরদে গতকাল ছিলেন নষ্টচন্দ্র, আজ পূর্ণিমার চাঁদ। নব নবোন্মেষশালিনী ক্রীড়ার নাম ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়ানদের আজ ৭ উইকেটে ১০৩ রানের দয়াভিক্ষা দিয়ে ভারত ফিরিয়ে দিল। জয় হোক ভারতের। প্রথম শ্রেণীর বোলিং এবং উদ্দীপ্ত ফিল্ডিংয়ের (যদিও ত্রুটিহীন নয়) জোরে প্রায় প্রাণহীন উইকেটে ভারতীয়রা নিজেদের উন্নতি প্রমাণ করল। এর পরে?—

—আমরা বুক দিয়ে পড়ে থাকব উইকেটে, দেখি অস্ট্রেলিয়া কি করে? ভাল কিছু করবই।

হয়ে গেল—আজকেই শেষ!

অর্ধলক্ষ মানুষের ককিয়ে চীৎকার শুনেছেন কখনো?

ভারতের ইনিংস আরম্ভ হবার এক···দুই · তিন···, তৃতীয় বল পড়ার পরেই সেই গলায় পাক দেওয়া গোঙানি বেরিয়ে এল। ভারতীয় দলের 'এক নম্বর' ব্যাটসম্যান কুন্দরামের স্টাম্প ছিটকে গেছে। ডেভিডসনের হত্যাকাণ্ড। অধিনায়ক রামচাঁদের বাহাদুরির মূল্য দিয়ে গেলেন কুন্দরাম প্রথম উইকেটে খেলতে নেমে। প্রথম বলেই গিয়েছিলেন। ডেভিডসন যেভাবে কুন্দরামের বিরুদ্ধে এল. বি. চেঁচিয়েছিলেন, আবেদন অগ্রাহ্য হতে যে বীভৎস মুখ করে তাকিয়েছিলেন, তাতে শিকার-ফসকে-যাওয়া বাঘের কথা মনে হচ্ছিল। আম্পায়ারের সময়োচিত নির্বিকারত্বে কুন্দরাম অব্যাহতি পেয়েছিলেন সে যাত্রা। কিন্তু কুন্দরাম-পতঙ্গ আজ বহ্নি-বিবিক্ষু। দুটো বলও তারপর পেরোল না। রায় নামছেন। 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি' করবার দ্বিতীয় উৎসাহী ব্যক্তি। ডেভিডসনের হাতের গোলাও তৈরী। এমন জোরে প্রথম বল পড়ল যে, প্রায় দেখাই গেল না। সুরুতেই সাবাড়,—এই মনোভাব। ভারতীয় দলের টেস্ট-রেকর্ড ডেভিডসনের হঠাৎ মনে পড়ে গেছে—শূন্য রানে চার উইকেট। অন্যতম শূন্যবাদী সাধক সামনে উপস্থিত। রায় তবু অবিচলিত। প্রথম বল স্বচ্ছন্দে ঠেকালেন ব্যাটে। দ্বিতীয় বল ইচ্ছে করে ঠেকালেন পায়ে। হতাশাভরে গালে হাত দিলেন বেনোড। রেকর্ডটা তাহলে হোল না। পঙ্কজ ভালো দোকান থেকে চশমা করিয়েছেন, কাঁচের মধ্য দিয়ে বল বেশ বড় দেখছেন। ক্রিকেটের চশমার প্রতি পঙ্কজের কোনো আকর্ষণ নেই।

ট্রানজিস্টার রেডিও সেটের একঘেয়ে বিরক্তিকর আওয়াজের মধ্যে একটা কথা কানে এল—মাঠের কোথায় নাকি আগুন লেগেছে। দেখলুম আগুন যদি কোথাও লেগে থাকে, বলে আর ব্যাটে। কণ্ট্রাকটারের ব্যাটে আগুন। লিণ্ডওয়ালের প্রথম দান স্কোয়ার-লেগের বাউণ্ডারীতে হারিয়ে গেল মুহূর্তে। পঙ্কজ রায় একইভাবে রানের হিসেব খুললেন,

লিণ্ডওয়ালকে একই জায়গায় মাঠের বাইরে তাড়না করে। দেখলুম ডেভিডসন আগুনের গোলা ছুঁড়ে যাচ্ছেন। আগুনের মত রোদ ঝরে পড়ছে স্টেডিয়ামের উপর। চোখ কপালে তুলে, দমবন্ধ করে, সকলে খেলা দেখছে।

ভারতের অবস্থা? থাক, ভেবে কাজ নেই। আজ সকালে অস্ট্রেলিয়ানরা অল্প রানে ফিরে গেলেও তাদের সংগ্রহে মোট ৩৩১ রান। ভারত ১০৩ রানে পেছিয়ে আছে প্রথম ইনিংসে। দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করেই ছুঁড়ে দিয়েছে একটি উইকেট। ইনিংসে পরাজয় এড়ানোই মহত্তম লক্ষ্য। এড়াতে না দেওয়াই অস্ট্রেলিয়ার নিকটতম অভিপ্রায়। কানপুরের পরাজয়ের প্রতিশোধ ভাল করে নিতে হবে। তাছাড়া যত আগে খেলা শেষ করা যায়, তত সুবিধা। বাড়ী ফেরার আগে কলকাতা সহরটাকে (যদিও ন্যাষ্টি তবু এম্পায়ারের, থুড়ি কমনওয়েলথের দ্বিতীয় সহর) ভাল করে দেখা দরকার। —ক্যা—আ—আ—আ—হাজার কাকের জমাট আওয়াজ শোনা গেল মানুষ ডেভিডসনের গলায়। 'পঙ্কজকে বাড়ী যেতে বল আম্পায়ার'—ডেভিডসন কর্কশ গলায় হুমকি দিলেন। অমন বিটকেল চীৎকার করে মানুষ? কুন্দরামের বিরুদ্ধেও এই পিলে-চমকানো চেঁচানি ছেড়েছিলেন। আম্পায়ারের কাছে নাকি 'আবেদন' জানানো হয়। নিশ্চয়ই। তবে মুষ্টিবদ্ধ আবেদন। সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের আবেদনের মত। 'অস্ট্রেলিয়ানিজম্'।

বেনোড দেখলেন, ডেভিডসনের চরমপত্রে আম্পায়ার অব্যস্ত! লিণ্ডওয়ালকে চারে-চারে কাটছে ব্যাটসম্যানেরা। তখন তিনি ডেভিডসনের অনুরূপ বাঁ-হাতের দ্রুত বোলার মেকিফকে স্মরণ করলেন। বাম হাতের বিপদ নিয়ে লিণ্ডওয়ালের স্থানে এলেন মেকিফ। আড়াইটে বেজে গেছে। মাঠের উপর তীব্রতম সংঘাত। আকাশে কোথা থেকে উড়ে এল এক পাল চিল। উপরে ঘুরতে লাগল অশুভ ছায়া বিস্তার করে। বোমারু বিমানের মত চিলগুলো। চারিদিকে যেন যুদ্ধকালীন আবহাওয়া। চিলের বিরুদ্ধে আম্পায়ারের কাছে আবেদন জানানো যায় না—যেমন করা হয় স্ক্রীনের সামনে লোক ছুটলে? ছুটো

আটত্রিশের সময় অফস্টাম্পের বাইরে ডেভিডসনকে মারতে গিয়ে রায় ফসকালেন।—কি হচ্ছে পঙ্কজ, তোমার আক্কেল হবে কবে?—দাঁতে দাঁত পিষে দর্শক চেঁচাল। হার্ভে, সাধারণতঃ যিনি বেঁটে চেহারা নিয়ে হেলে দুলে হাঁটেন, ঠিক প্রয়োজনের সময় নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন,—দূর থেকে বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙে দিলেন। বল ছাড়ার পরেও ক্ষুধার্ত কুটিল চোখে ব্যাটসম্যানের দিকে একটানা তাকিয়ে রইলেন ডেভিডসন, ব্যাটসম্যানেরা যাঁর সম্মোহনের মধ্যে। এর মধ্যে একটি মাত্র আনন্দ ছিল দর্শকের, বেনোডের বদলী ফিল্ডার জারম্যানের কমিক চেহারা ও ব্যবহারে। তবু চা পর্যন্ত কোনো উইকেট পড়ল না, কারণ ভারতপক্ষে যে দুজন এই সময় ব্যাট করেছেন, তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়বার মত প্রতিজ্ঞা, প্রত্যয়, এবং প্রতিভা দেখিয়েছেন। পঙ্কজ রায় এবং কণ্ট্রাকটারের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ একখণ্ড আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াপদ্ধতি পাওয়া গেছে এইকালেই। চা পর্যন্ত ভারত ১—২৯।

চায়ের পর সওয়া ঘণ্টার আরো একটি মনোহারী যুগ্ম ব্যাটিং-এর নিদর্শন পাওয়া গেল রায়-কণ্ট্রাকটারের কাছ থেকে। মেকিফের বলে কণ্ট্রাকটার প্রথম দিকে সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেও এই পরিশ্রমী সতর্ক-দৃষ্টি খেলোয়াড়টি অচিরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রায় অন্যপ্রান্তে যখন ব্যাট করছেন, সেই সামান্য অবসরে কণ্ট্রাকটার অদৃশ্য আয়নার সামনে বৈকালিক অনুশীলন-কর্ম সেরে নিলেন। তাঁর পুরোনো ফর্ম ফিরে এল। প্রারম্ভিক বিপর্যয় সত্ত্বেও মনোরম একটি অপরাহ্ন উপহার দিলেন দর্শককে পঙ্কজের সহযোগিতায়। তিনটে তিরিশ মিনিটের সময় ডেভিডসনের বলে রায়ের উইকেট ছিটকে গেলেও,—দুর্গা দুর্গা ওটা নো বল ছিল,—রায়কে ডেভিডসন মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রস্ত করতে পারলেন না, কারণ পঙ্কজ অবিলম্বে দুবার লেগগ্লান্স করলেন ডেভিডসনকে ভারতীয় ঐতিহ্যে (লেগগ্লান্স ক্রিকেটে ভারতের নিজস্ব দান), এবং মেকিফের বদলে আগত বেনোডকে রায় ও কণ্ট্রাকটার কখনো ড্রাইভ, কখনো সুইপ, কখনো গ্লান্স করে রানসংখ্যাকে তুলে নিয়ে গেলেন পঞ্চাশের উপরে।

ডেভিডসন একটানা অদ্ভুত বল করে বিনা পারিতোষিকে একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, বাড়াবাড়িরকম চেঁচাচ্ছিলেন,—দর্শকেরা রায়-কণ্ট্রাকটারের আত্মবিশ্বাসে সেই ধৈর্যহীনতাকে ক্ষমা করল সানন্দে। চারটে নাগাদ সময়ে জারম্যান যখন বল থামাতে গিয়ে ডিগবাজি খেলেন, তখন সকলে মোটার কাণ্ড দেখে হেসে উঠল প্রাণখুলে। জল এল, সকলে অসন্তুষ্ট হোল যৎপরোনাস্তি। যে কোনো বিরতির পরে প্রথম ইনিংসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিপাকের কথা সকলের স্মরণে আছে। তারপরেই মজার কাণ্ড ঘটল মাঠে। দারুণ হৈ চৈ। আবার কুকুর। পূর্বদিন আমি ক্রিকেটের পশুতত্ত্ব নিবেদন করেছি। বন্ধু পাশে ছিলেন, ঠেলা দিয়ে উৎসাহিত করে বললেন, ওরে, ব্যাটা কুকুর তোর লেখা পড়েছে। অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকে লেখার সমাদরে খুশী না দুঃখিত কি হব ঠিক করতে পারছি না, কুকুরটি ইতিমধ্যে গ্যালারির হাততালি কুড়ুতে কুড়ুতে নানা ক্রীড়া-কসরত দেখাতে সুরু করে দিল। অস্ট্রেলিয়ানরা শুয়ে পড়ল মাঠের উপর—কুকুরকে স্বাধীনতা দিল খেলা করার। পঙ্কজ রায় একটা অন্যায় করলেন; ব্যাটটাকে বেয়নেটের মত বাগিয়ে কুকুরের দিকে এগিয়ে গেলেন বীরদর্পে। একজন দর্শক সময়োচিত সতর্কবাণী শোনাল—'বাছা পঙ্কজ, ধর্মরাজকে চটিও না।'

কুকুরদত্ত বিশ্রামের পর ডেভিডসন নবশক্তিতে কয়েকটি বাম্পার ছাড়লেন। এ পর্যন্ত হাইকোর্ট-প্রান্ত থেকে তিনি একটানা বল করে চলেছেন, রান দিয়েছেন মাত্র ৬, প্রমাণ করেছেন কোন্ শ্রেণীর খেলোয়াড় তিনি, তবু রায়-কণ্ট্রাকটার এমন আস্থার সঙ্গে খেলছেন ভয়ের কোনো কারণ দেখছি না। অপরাহ্নের বিদায়ী আলোর অপরূপ মাধুরী চারিদিকে। শঙ্কাউত্তীর্ণ প্রসন্নতা। এমন সময়—একি? কণ্ট্রাকটার গ্লান্স করলেন, বল ব্যাটে লাগল না, বোলার বেনোড আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে কি একটা বললেন,—সর্বনাশ! আম্পায়ারের আঙুল মাথার উপরে!! চারটে পঁচিশ। মাথা নামিয়ে কণ্ট্রাকটার আসছেন প্যাভিলিয়ানের পথে। অবিশ্বাসের যাতনাভরা ক্রন্দনের মত একটা ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল মাঠে। তারপরেই বিদ্বিষ্ট কণ্ঠের কোলাহল।—জঘন্য! জচ্চুরী! বেনোডের

চোখরাঙানিতে ভয় পেলে আম্পায়ার ? পর ভালানে। ক্ষোভে ক্রোধে কটু কণ্ঠের কাতরোক্তি চারিদিকে।

আম্পায়ারের বিলম্বিত অঙ্গুলী ভারতের বিষণ্ণ ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতের মতো। আম্পায়ারের আঙুল উঠতে দেরী হয়েছিল। দেরীই যদি হোল উঠল কেন—বহু সহস্র দর্শকের অবুঝ প্রশ্ন।

আশার সমাধি,—গোধূলির মরণ-লগ্নে। কুন্দরাম ছিটকে বেরিয়ে যাবার পর নতুন বলের রঙ নষ্ট করতে প্রথম ওভারেই এসেছিলেন পঙ্কজ রায়, কন্ট্রাকটারের সহযোগিতায়। দুজনে খেলেছেন অনবদ্য। সকলে আশা করছে আগামীকাল বিশ্রাম-দিনের পর ২৭শে জানুয়ারী সকালে দুজনে ভারতের খেলা আরম্ভ করবেন নবোদ্যমে। নির্ভরযোগ্য কণ্ট্রাকটার এবং প্রয়োজনীয় পঙ্কজের বনিয়াদী খেলা দেখা যাবে ধীরে সুস্থে। অনেক আশা। দ্বিতীয় উইকেটে নতুন রেকর্ডের ক্ষীণ স্বপ্ন পর্যন্ত। সাদা জামায় ঢাকা আম্পায়ারের কালো হাত আশার রূপালী রেখাটিকে মুছে দিল।

দর্শকরা আম্পায়ার সম্বন্ধে সুবিচার করেনি। দর্শকরা নাকি খেলার সবটুকু দেখতে পায়। তাই তারা আম্পায়ারের দায়িত্ব তুলে নিতে চায় নিজের ঘাড়ে। আম্পায়ারে দর্শকে চিরকালীন মতভেদ। রেগে গিয়ে কখনো আম্পায়ার মাঠ ছেড়ে দর্শকদের মধ্যে গিয়ে বসে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, এখান থেকেই সিদ্ধান্ত দেওয়া সহজ, তোমাদের ব্যবহারে তো তাই মনে হচ্ছে। দর্শকের মনোভাব আরো ভয়াবহ। পথচারী মাঠে ভীড় দেখে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে মশাই, কোনো লোক আহত নাকি ? দর্শক ঘৃণাভরে বলে,—লোক নয়, আম্পায়ার।

কন্ট্রাকটারকে যিনি আউট দিয়েছেন, তাঁর বিষয়ে দর্শক সুবিচার করেনি। কন্ট্রাকটার আউট হয়েছিলেন। কন্ট্রাকটার অপেক্ষা করছিলেন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য, অস্ট্রেলিয়ানরা আশা করছিল কন্ট্রাকটারের স্বেচ্ছাবিদায়ের। একটা থতমত অবস্থা। অগত্যা তাঁরা ডাকলেন। অতএব আম্পায়ার হাত তুললেন। এবং কণ্ট্রাকটার ফিরে গেলেন। কিন্তু অবস্থাটা কী শোচনীয় রকম !

ভারত—২-৬৭। জয়সীমা আসছেন। এসে আর হবে কি? বুঝতে পারছি বিদায়ের শোকযাত্রা সুরু হয়ে গেছে। একমাত্র ভরসা পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ রায়ের কাঁধে গোটা ভারতবর্ষ। পঙ্কজের কাঁধ চওড়া হলেও তেমন চওড়া কি?

বন্ধুবর 'পৃথ্বিজিৎ' প্যারডি শোনালেন কানে কানে—তিনি ভালো গান গাইতে পারেন—

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে'—

—তবু—

'ওরে পঙ্কজ পঙ্কজ রায় মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না খেলা।'

কান্নার মত শোনাল। সুরেলা কান্নায় নিজের বেসুর জুড়ে দিয়ে উঠে পড়লুম। সামনে সন্ধ্যা।

ভারত—প্রথম ইনিংস—১৯৪

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

লেস ফ্যাভেল ব দেশাই	...	২৬
ওয়ালী গ্রাউট ব প্যাটেল	...	৫০
নীল হার্ভে ক জয়সীমা ব প্যাটেল	...	১৭
নরম্যান ও'নীল ক কুন্দরাম ব দেশাই	...	১১৩
পিটার বার্জ ব দেশাই	...	৬০
কলিন ম্যাকডোনাল্ড এল. বি. ডবলিউ ব বোরদে	...	২৭
কেন ম্যাকে ব প্যাটেল	...	১৮
রে. লিণ্ডওয়াল ক কুন্দরাম ব দেশাই	...	১০
এ. ডেভিডসন ব বোরদে	...	৪
রিচি বেনোড ক ও ব বোরদে	...	৩
আয়ান মেকিফ নট আউট	...	০
	অতিরিক্ত	০
	মোট	৩৩১

বোলিং

	ও	মে	রান	উইকেট
দেশাই	৩৬	৪	১১৯	৪
রামচাঁদ	১০	১	৩৭	০
প্যাটেল	১৬	২	১০৪	৩
নাদকার্নি	২২	১০	৩৬	০
বোরদে	১৩.১	৪	২৩	৩
জয়সীমা	৪	০	১৭	০

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

কুন্দরাম ব ডেভিডসন	...	০
কণ্ট্রাক্টর ক ডেভিডসন ব বেনোড	...	৩০
পি রায় নট আউট	...	৩১
জয়সীমা নট আউট	...	০
	অতিরিক্ত	৬
	মোট (২ উইকেট)	৬৭

বোলিং

	ও	মে	রান	উইকেট
ডেভিডসন	১৩	৮	৯	১
লিণ্ডওয়াল	৭	১	২৪	০
মেকিফ	৫	০	১৪	০
বেনোড	৯	৫	১৪	১

শীতের দিনে বসন্ত

মাঠের রোমাঞ্চচূর্ণগুলিকে সংগ্রহ করে রাখছিলুম নোট বুকে। ২৭শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪টা ৪৪ মিনিটে তাতে শেষ কথা লিখেছি—'ধন্য ধন্য জয়সীমা!' কিন্তু অন্যায় রকম অল্প মনে হোল কথাগুলোকে। আমরা আমাদের আবেগ বা আনন্দকে কেন পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারি না? প্রকাশে দীন কেন আমরা? জয়সীমা সম্বন্ধে 'ধন্য' কথাটি কী সামান্য! মাঠ থেকে বেরিয়ে যখন জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, তখন কেবলই মনে হতে লাগল, যদি আমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকত, তাহলে জয়সীমাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দিতুম প্রশংসা-মুখর জনতাকে দেখবার জন্য, লক্ষ কর্ণ দিতুম স্তুতিবাদ শোনবার জন্য। আমি আর কতটুকু ব্যক্ত করতে পারব অগণিত মানুষের মনোভাব? মনে কেবল কতকগুলো বিচ্ছিন্ন পংক্তি নেচে বেড়াতে লাগল—ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল! ও ইয়েট ওয়াণ্ডারফুল! 'গোলাপ যেটা গোলাপ সেটা, গোলাপ সেটা, গোলাপ'। জয়সীমা তাঁর জীবনের ইনিংস খেলেছেন। জয়সীমা! তোমার জয়ের সীমা নেই।

অথচ মাঠে ঢোকার সময় মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। গেট দিয়ে ঢুকছি, এন সি সি ছোকরাটি টিকেটের অংশ ছিঁড়ছে, রসিকতা করার চেষ্টা করলুম,—আস্‌ছে কাল ভাই টিকেট ছিঁড়বেন তো? চমৎকার ছেলেটি সুন্দর হেসে বলল, ছিঁড়তে দেবেন তো? আসনে বসতে যাচ্ছি—সকাল থেকে যে দৃশ্যটি মনে ভাসছে, সেটা আবার মনে এল। দৃশ্যটা আপনারা সকলেই দেখেছেন, সিনেমার পরিচিত দৃশ্য। কোনো প্রিয়জন মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছেন—ক্যাবিনের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণান্ত উৎকণ্ঠায় আত্মীয়েরা—ডাক্তার বেরুতেই ব্যাকুল চাহনি ও প্রশ্ন—বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু? তার দু'রকম উত্তর আছে, এক ডাক্তারের নৈরাশ্যপূর্ণ কাঁধ ঝাঁকানি। কিংবা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ভরা উত্তর,—রোগী নিজের মনঃশক্তি নিয়ে লড়াই করছে, আমার বিশ্বাস বাঁচবেন তিনি। ঠিক সেই সময় আপনি রোগীর ঘরে দৃষ্টিপাত করতে পারবেন, দেখবেন কোথা থেকে এক অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত রোগীর মুখ। কোন্‌টা সত্য হবে ভারতের সম্বন্ধে? আমি ভাবছিলুম, অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণ মারাত্মক, স্বাভাবিক-ভাবে না বাঁচাই সম্ভব। যদি বাঁচে—সে মনঃশক্তিতে।

আসনে বসতে চুপিচুপি এক ব্যক্তি আমার পাশে সরে এলেন। তিনদিনে মুখ-চেনাচেনি পরিচয়। আমি খবরের কাগজে লিখি, এ পরিচয়ও জেনে ফেলেছেন। বললেন, মশাই, একটা গান বেঁধেছি প্যারডি করে, শুনবেন?—নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক আমার সহযোগী লেখক পৃথ্বিজিৎ-এর পার্শ্ববর্তিনীর চমৎকার প্যারডি শুনে উৎসাহিত হয়েছেন বুঝলুম। ভদ্রলোক গাইলেন—সেই পঙ্কজ রায় সম্বন্ধে—যাঁর চওড়া কাঁধে নাকি ভারত চেপে আছে—

খর বল ধায় বেগে
পিচ ঢাকে ধূলা মেঘে
ওগো 'রায়' সোজা ব্যাট ধরিও,
তুমি যদি ধর হাল
তবে বাঁচে 'রাম'-পাল
'গোপী' বাঁচে, বাঁচে ডোবা 'নরী'ও।

গণি গণি প্রস্তি বল

মন প্রাণ চঞ্চল

কিবা হয় বাঁচি কি না বাঁচিরে !

মেকিফের ডেভিডের

বাঁ হাতের ডেভিলের

রূপ দেখে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহিরে।

যদি মাতে লিণ্ডাল

বাম্পারে উত্তাল,

বিনোদের যদি লেগ ব্রেক,

ঠুক্ ঠুক্ পিচ ঠুকে

চশমার কাঁচ মুছে

সোজা ব্যাটে রায় দিও চেক।

মুখে বললুম, আহা বেশ। মনে বললুম, পৃথ্বিজিৎ-এর পার্শ্ববর্তিনীর তুলনায় কিসৃস্যু নয়। তারপর বললুম, আচ্ছা যদি রায় 'চেক' না দিতে পারেন ? ভদ্রলোক না দমে বললেন, সেখানেও আমার গান তৈরী আছে—

যাবার বেলা এই কথাটি বলে আমি যাই,

আশা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে তুলনা তোর নাই।

এগারোটা বেজে নয় মিনিটের সময় পঙ্কজ রায় তাঁর মহামূল্য সম্পত্তির মত চরণখানি কোথায় রাখবেন ঠিক করতে না পেরে বেনোডের বলের সামনে পেতে দিলেন। আম্পায়ার সানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (অবশ্যই আলঙ্কারিক ভাষায়) কণ্ট্রাক্টরের মত রায়কে প্যাভিলিয়নের আরাম-কেদারায় ফিরিয়ে দিল।

গোপীনাথ নামছেন গ্লাভস পরতে পরতে মাথা ঝুঁকিয়ে। গোপীনাথের আঙুলগুলো যেন গ্লাভসের সুন্দর নীড় খুঁজে পাচ্ছে না। গোপীনাথ এসেই সাবলীল। তিনি ভারতীয় দলের সেরা স্টাইলিস্ট খেলোয়াড়।

স্বচ্ছন্দভাবে বেনোডের বল নিজের মাথায় তুলে দিলেন, পুলকভরে উইকেট-কীপার গ্রাউট বলের আশীর্বাদটিকে তুই অঞ্জলিতে ভরে নিলেন। গোপীনাথ স্পোর্টসম্যানের মত আম্পায়ারের নির্দেশের পূর্বেই ক্রীজ ছেড়ে ফিরে চললেন, চল্লিশ হাজার দর্শক বুক ভেঙে থুবড়ে পড়ল নিজের আসনে। এরই জন্য পয়সা আর পরিশ্রমের শ্রাদ্ধ তারা করেছে।

অস্ট্রেলিয়ানদের উল্লাস তখন দেখার মত। 'সন্ধ্যেটা আজ কি চমৎকার কাটানো যাবে'—তাঁরা ভাবছেন। বেনোড হয়ত ভাবলেন কিভাবে ভারতকে বিদায়সম্ভাষণ দেবেন। ছোকরা খেলোয়াড়দের হয়ত মায়ের বা বোনের কিংবা অন্য কারুর কথা মনে পড়ল। বয়স্করা সিডনি কিংবা মেলবোর্ণের নীড়ের আবাসটিকে কল্পনায় নিজের অঙ্গে পেলেন। একদিন আগে খেলা শেষ হতে ম্যানেজার লক্সটনও চিন্তিত নন, কারণ তাঁকে তুরু তুরু বুকে গেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না, অবিশ্বাস্য মোটা টাকা কবুল করতেই তবে তাঁরা এদেশে পদার্পণ করেছেন।

এই সময় একটি ছেলে অন্য রকম ভাবছিল। তার নাম জয়সীমা। ময়দানের দিক থেকে জয়সীমা যখন বেনোডের প্রথম বল পেলেন, ঘাড় নীচু করে ব্যাটের পিছনে প্যাড রেখে মাঝ-ব্যাটে বলটি আটকালেন। ভঙ্গিটি দেখিয়ে দিল, আজ আমি নিজে থেকে আউট হচ্ছি না, যদি পার তোমরা আউট কর। জয়সীমার প্রতিজ্ঞা অস্ট্রেলিয়ানরা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু ডেভিডসন জয়সীমাকে প্রথম যে বল দিয়েছিলেন, সেটি ছিল বাম্পার। জয়সীমার বিরুদ্ধে সারাদিন তাঁরা বাম্পার দেবেন। জয়সীমার হাত থেঁতলে যাবে। তবু জয়ী থাকবেন শেষ পর্যন্ত।

নাদকার্নি যখন এলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ানরা আগ্নেয়গিরি। ডেভিডসনের বল তো নয়—'দারুণ অগ্নিবাণ'। নাদকার্নি বিশেষ কোনো প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসেন নি। খেলে যাব সহজভাবে, এইটিই ছিল বোধহয় তাঁর মনোভাব!

দর্শকদের হৃদয়রক্তে ডোবানো প্রতি মুহূর্তের উপর দিয়ে নাদকার্নি. জয়সীমা খেলতে লাগলেন। সকলেই ভাবছে, লাঞ্চ পর্যন্ত টিকবে তো? নাকি মাঠের বাইরে ইডেন গার্ডেনের গাছতলায় বসে লাঞ্চ সারতে হবে?

বাড়ীতে তো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্যাটসম্যানেরাও যদি লাঞ্চ খেতে যান, সে হবে বলির জীবের বটপাতা খাওয়ার মত।

১০টা ২৩ মিনিটের সময় ডেভিডসনের ভয়াবহ বাম্পার লাফিয়ে উঠল নাদকার্নির মাথায়। মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটে নাদকার্নি প্রাণ বাঁচালেন। কতক্ষণ বাঁচবেন?

নাদকার্নি আউট হলেন লিণ্ডওয়ালের ওভারের শেষ বলে—উইকেট-কীপার গ্রাউটের হাতে ক্যাচ তুলে। নাদকার্নি বড় বেশী উৎসাহিত হয়েছিলেন, দুঃসাহসী বলাই ঠিক।

কিন্তু নাদকার্নি ভারতের ইনিংসে-পরাজয় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি আউট হয়েছেন লাঞ্চের ঠিক আগে। সেইটেই তাঁর একমাত্র দোষ। লাঞ্চের আগের ওভারটি সাবধানে খেলা উচিত ছিল। ১১টা ১৪ মিনিট থেকে ১২টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত নাদকার্নি খেলেছেন। থেমে থাকেন নি, মেরেছেন। শূন্যে ব্যাট চালিয়েছেন বহুবার, ভুল স্ট্রোক করেছেন, কিন্তু এমন সব স্ট্রোকও সেই অনিখুঁত ইনিংসের মধ্যে করেছেন, যার সৌন্দর্যে মাঠ উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি যেভাবে খেলেছেন, তাতে রান পাওয়া যায়, আউট হওয়া যায়। নাদকার্নি রান পেয়েছেন, এবং আউট হয়েছেন। মাঝখান থেকে ভারত বেঁচেছে ইনিংস-পরাজয়ের গ্লানিময় সম্ভাবনা থেকে।

ঠিক ও ভুল মিলিয়ে নাদকার্নি যখন রান করে যাচ্ছেন, তখন একজন অধ্যাপক আনন্দভরে চেঁচালেন—'পঞ্চাশ রান করলেই পদ্মশ্রী'। নাদকার্নি যখন জয়সীমার সহযোগিতায় ছুটোপাটি করে খুচরো রান নিচ্ছিলেন, তখন ব্লাডপ্রেসারপূর্ণ ব্যারিস্টারটির কোরামিন প্রয়োজন হয়েছিল। ঠিক ১২টার সময় শেষ মুহূর্তে যেভাবে নাদকার্নি বেনোডের বলকে উইকেটের সামনে থামালেন, তাতে রোমাঞ্চপ্রিয় কলেজ-ছোকরা চেঁচাল—'যেন ডিটেকটিভ গল্প'! কিন্তু এরই মধ্যে নাদকার্নি সজীবতা আনলেন খেলায়। লাঞ্চ খেতে যখন অস্ট্রেলিয়ানরা ফিরছেন, তখন নাদকার্নি আউট হওয়ার জন্য তাঁদের মনে আনন্দ আছে, কিন্তু নতুন নাদকার্নির চিন্তাও জাগছে সেই সঙ্গে।

বোরদে এলেন নাদকার্নির জায়গায়, লাঞ্চের ঠিক আগে মাঠে ব্যাট-হাতে বেড়িয়ে যাবার জন্য।

বোরদে একটা কিছু কর। চমৎকার তোমার ছিমছাম চেহারা, চুল—আহা যেন কেশ-তৈলের বিজ্ঞাপন, ফিল্ডিং-এর সময় বল ছোঁড়ো কী তৎপরতায়, কাল উইকেট নিয়েছ যাদুকরের মতো, আজ একটা কিছু কর।

বোরদে যা করলেন। অনেকদিন পরে একজন ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে দেখলুম যার কাছে উইকেটের মাটি নেচে ফিরবার মেঝে, ধর্মমন্দিরের মত পবিত্র পরিত্যাজ্য, কিংবা আস্তাকুঁড়ের মত জঘন্য প্রত্যাখ্যাত বস্তু নয়। বোরদে বল মারলেন, কাটলেন, ফেরালেন, ঘোরালেন। যথেচ্ছ করলেন। বল মারবার সময় বোরদের কালো চুল ঝলসাতে লাগল রোদে, বল থামাবার সময় বার্জের টাক জ্বলতে লাগল একই রোদে। বোরদে-জয়সীমা ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠ জুটির খেলা খেললেন।

বোরদে দেখিয়ে দিলেন ব্যাট ব্যবহারের বস্তু। যখন ফিরে গেলেন চায়ের জন্য, তখন তাঁর ও জয়সীমার দুজনের উনপঞ্চাশ। দুই 'উনপঞ্চাশ' দেখেও ভয় পাইনি। বোরদে ভারতীয় ব্যাটিং সম্বন্ধে আমাদের কুসংস্কারমুক্ত করে দিয়েছিলেন। ৩টা ২১ মিনিটে বোরদে যখন আউট হয়েছেন, তখন আর আমরা বলছিলুম না, বাছারা বেঁচে থাক, বেঁচে থাকলে রোজগার করবে। যিনি প্রথম দিন বোরদেকে স্থান দেবার বিরুদ্ধে তারস্বরে চেঁচিয়েছিলেন, তাঁর কণ্ঠের তারে আবার নতুন প্রতিবাদ এল—"বোরদেকে বসাবে বলছিল কে? দেখি তার মুখখানা?" সকলে তাঁর অপূর্ব আত্মবিস্মরণটুকু স্নিগ্ধ সমর্থনের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। ২টার সময় যখন বেনোড 'জুটি ভাঙতে ওস্তাদ' ম্যাককে আনলেন, তখনো সকলে নির্ভয়—আজকে বেশী ওস্তাদের হাতে দড়ি পড়বে। ২-৩৬ মিনিটে সুন্দর সন্ধ্যেটা মাটি হোল জেনে দুজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট-বলে 'ফুট টেনিস' খেললেন। এবং যখন চা-এর পর বোরদে ও জয়সীমা দুজনেই পঞ্চাশ করে রান করলেন, তখন ষষ্ঠ টেস্টের টিকিট দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, যে পুলিসটি বেল্টের চাকতির আলো দিয়ে আমাদের ব্যাটসম্যানদের দৃষ্টিভ্রম

ঘটাচ্ছিল, তাকে ক্ষমা করে ফেলেছি, ছুটো পঞ্চাশ-আঁকা স্কোরবোর্ডটি দেখাচ্ছে কবিতার মত, এবং আমরা শীতের দিনে বসন্তে একেবারে ডুবে গেছি।

খেলার উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল প্রতিভাবান বোরদে আউট হয়ে গেলেন— হোন গে। কি ক্ষতি তাতে? তার আগে আমি দেখে নিয়েছি আমার বড় ভালবাসার একটি ছবি বোরদের মধ্যে; বোরদে এগিয়ে লেগে সুইপ করলেন নীচু হয়ে একটা বল, দূরবীন দিয়ে দেখলুম, চিকন যুবকটির কপালের উপর চুলের গোছা এসে পড়েছে—ঠিক দেখাল কম্পটন।

কেনী নামলেন ৩টা ২১ মিনিটে। সূক্ষ্মমূর্তি কেনী, এমনিতে অসুস্থ চেহারা, তার উপর আজ নাকি সত্যই অসুস্থ। সোয়েটার, প্যাণ্ট, প্যাড ও চামড়ায় ঢাকা একটি অস্থিদেহ। 'কেনী নামটাই কেমন সিকৃলি'— আমার পাশের ছোট মেয়েটি বলল। আমি বললুম, তীক্ষ্ণও বটে। খেলার ধার এখনি দেখবে।

কেনী ধারালো ভাবে খেললেন দিনের শেষ পর্যন্ত। অন্য লোকের জন্য যখন জল এসেছিল, অসুস্থ কেনীর জন্য এসেছিল অন্য বলকারক পানীয়। কেনীর মাথায় বাম্পার ছাড়া হয়েছিল। গিন্নী-মত এক মহিলা রাগ করে বললেন, আহা কোন্ প্রাণে রোগা মানুষটিকে মারছ? কেনী যখন দৌড়েছেন মনে হয়েছে রোগশয্যা থেকে দৌড়। কেনী জল খেতে গেলে আমার পাশের ছোট মেয়েটিই বাধা দিয়ে চেঁচাল, খেয়ো না, খেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সেই কেনী এমন বেগে কয়েকটি বল মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন, যে বেগ আয়ত্ত করতে মল্লবীরের কব্জি দরকার।

আজকের দর্শকদের কথা না বললে কিছু বলা হয় না। চল্লিশ হাজার দর্শক আজ সক্রিয়ভাবে ক্রিকেট খেলেছেন। স্নেহভরে আঁকড়ে বাঁচাতে চেয়েছেন খেলোয়াড়দের। বাম্পারের বিরুদ্ধে ন্যায্য ঘৃণা প্রকাশ করেছেন বারবার। ভারতীয় দলের যখন রানের প্রয়োজন, তখন অস্ট্রেলিয়ানদের দৌড়ে বাউণ্ডারী বাঁচাবার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছেন চীৎকার করে। এবং তাঁরা শেষ ওভার পর্যন্ত মাঠে বসেছিলেন আগ্রহভরে,

যন্ত্রণান্তরে। ভালবাসার যন্ত্রণায়। উঠে যাননি অন্য দিনের মত। শেষ কয় ওভারের বলের লক্ষ্য ছিল হয়ত উইকেট, কিন্তু মধ্যবর্তী অংশে বাধা দিয়েছিল চল্লিশ হাজার দর্শকদের উদ্বেগ-ব্যাকুল অদৃশ্য হৃদয়।

এবং মাঠের বিশিষ্ট দর্শকটির একটি আচরণ ভারতীয় ব্যাটিং-এর প্রতীক আচরণ হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিক-আসনের তলায় মাঠের ধারে বসে খেলা দেখছিলেন পশ্চিম বাংলার চীফ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়। কয়েকদিন আগে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে খাঁচার মধ্য থেকেই জনৈক 'রয়েল বেঙ্গল' বঙ্গের প্রধান সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে করমর্দনের চেষ্টা করেছিল। সুন্দরবনের আহ্লাদে রায় মহাশয় কিছু আহত হয়েছিলেন। হাতের ঘা ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে, এসেছেন খেলা দেখতে। ভারতের ও বাংলার বিশিষ্টরা মাঠে আছেন দেখা যাচ্ছে—খেলোয়াড়দের মধ্যে ধ্যানচাঁদ, কিষেনলাল, মানকদ, অমরনাথকে। সংবাদ-অধিনায়ক অশোককুমার সরকার, বিচারপতি জে, পি, মিত্র, পুলিস মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি, পুলিস-প্রধান হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী। বরোদার মহারাজ আছেন এবং আরো নানা রাজা। আছেন দণ্ডকারণ্যের বন্দ্যো এবং কংগ্রেসের কোলে। পুলিসের হীরেন সরকার ও বিরোধী দলের যতীন চক্রবর্তী 'তুমিও বীর' বলে পাশাপাশি। এবং আরো এত বেশী বিশিষ্টরা রয়েছেন যে, এই মুহূর্তে এখানে বোমা পড়লে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষের অপর কিছু অংশকে সঙ্গে করে, রসাতলে যাবে। এঁদেরই মধ্যে সত্যেন্দ্র রায় তাঁর হাতের বাঘের আঁচড় দেখালেন পার্শ্ববর্তী মেহেরচাঁদ খান্নাকে।

এবং হাতে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারুর আঁচড় দেখালেন জয়সীমা তাঁর অধিনায়ক রামচাঁদকে।

জয়সীমা। জয়সীমার কথাই শেষ কথা। জয়সীমা ভারতীয় দলের 'মুক্তি সমাধিতে' একপাশ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাঠে। বেনোডের বলের প্রতারণা, ম্যাকের ক্ষুরধার চালাকি, হার্ভের দুরন্ত ফিল্ডিং কিংবা ডেভিডসন-মেকিফ-লিণ্ডওয়ালের বাম্পার, কিছুই করতে পারেনি তাঁর।

জয়সীমা সুদীর্ঘ তিনশো মিনিটের উপর খেলে করেছেন মাত্র ৫৯ রান। কে বলে 'মাত্র'? ঘনত্বে অপূর্ব, গুরুত্বে অসামান্য তাঁর রান। যে কোনো ভারতীয় খেলোয়াড় তাঁর একটি ডবল সেঞ্চুরী জয়সীমার ৫৯ রানের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হবেন। জয়সীমা যখন মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন, বলতে লজ্জা, বোম্বাইয়ের সেই বাজি-রাখা মেয়েটি সম্বন্ধে আমার একেবারে বিদ্বেষ ছিল না।

অথচ কী ভয়াবহ ছিল অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণ। ক্রূর চক্রান্তের রূপ। গতকাল থেকে জয়সীমা সুরু করেছেন। আজ সকালেও রানের খাতা খুলতে আধ ঘণ্টা লাগল। রানের জন্য জয়সীমা ব্যস্ত ছিলেন না। নেমন্তন্ন বাড়ীতে প্রথম এসেও দেখাশোনার পর শেষ পাতে খাবার মত ভঙ্গি তাঁর। জয়সীমা রান করেছেন প্রতি বল দেখে। যখন বেনোডের স্পিন বল, তখন হয়ত ব্যাট উঁচিয়ে বলের পিছনে ধাওয়া করেছেন, যদি দুষ্টামী করে তো চাপড়ে সায়েস্তা করে দেবেন। যখন মেকিফ ডেভিডসনের দ্রুত বল, কখনো হুক করেছেন, কখনো ডুব দিয়েছেন। এক সময় সামলাতে পারেননি। হাতে লেগেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। দশ মিনিট পরে আবার সামলে ব্যাট ধরেছেন। এবং যখন ধরেছেন, অস্ট্রেলিয়ানরা আলগা দেননি। আহত হবার পর প্রথম যে বলটি পেয়েছেন, সেটিও বাম্পার। এবং আহত মানুষটির চারদিকে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে থাবা বাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ানরা। তবু সেই আত্মস্থ মানুষটি ভয় পাননি।

ক্রিকেট মেঘ রৌদ্রের খেলা। আজকের খেলায় ভারতের আকাশে রোদই বেশী।

খেলা ভেঙেছে—পিছন থেকে এক বন্ধু জড়িয়ে ধরলেন—ভাই, আমরা বেঁচে আছি। আমি বললুম—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

ভারত : প্রথম ইনিংস—১৯৪

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস– ৩৩১

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

কুন্দরাম ব ডেভিডসন	...	০
কন্ট্রাক্টার ক ডেভিডসন ব বেনোড	...	৩০
পি. রায় এল. বি. ডবলিউ ব বেনোড	...	৩৯
জয়সীমা নট আউট	...	৫৯
গোপীনাথ ক গ্রাউট ব বেনোড	...	০
নাদকার্নি ক গ্রাউট ব লিণ্ডওয়াল	...	২৯
বোরদে ব মেকিফ	...	৫০
কেনী নট আউট	...	২৬
	অতিরিক্ত	১০
	মোট (৬ উইকেট)	২৪৩

বোলিং

	ও	মে	রান	উইকেট
ডেভিডসন	৩২	১২	৬৭	১
লিণ্ডওয়াল	২০	৩	৬৭	১
মেকিফ	২৭	২	৩০	১
বেনোড	৩৪	৭	৬২	৩
ম্যাকে	৭	২	৮	০

কী পাইনি

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! সর্বাধিনায়ক আইসেনহাওয়ার বললেন, শান্তি চাই, শান্তি চাইলেন দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বেনোড। অমিত শক্তিশালী রাশিয়ার খ্রুশ্চেভ শান্তির ভিখারী, সংগ্রামী বলে খ্যাত ভারতীয় রামচাঁদও তাই। কেবল জনতা শান্তি চায় না। অন্তত ২৮শে জানুয়ারী রনজি স্টেডিয়াম ও আশেপাশে সমবেত চল্লিশ হাজার ব্যক্তি শান্তি চায়নি। 'যুদ্ধবাজ', 'উত্তেজনালোভী', 'দায়িত্বহীন', ইত্যাদি যত গালাগালিই তাদের করুন, তবু তারা অশান্তির মাদকতা চাইছিল নির্লজ্জভাবে।

স্কুল-কলেজ-অফিস-ব্যবসা কামাই কত হাজার হাজার মানুষ এসেছে ভারত জেতে কি হারে দেখবার জন্য। মনে রাখবেন, 'ড্র' দেখার জন্য নয়। গত সন্ধ্যায় তারা অপূর্ব সম্ভাবনায় সচকিত ছিল। আজ সন্ধ্যায়

যখন হাজার হাজার লোক ইডেন গার্ডেনের চারপাশে স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছিল—তারা প্রায় নিঃশব্দ, বিশেষ ক্ষুব্ধ, এবং চরম বিষণ্ণ। অথচ ভারত আজ পেয়েছে বিশ্ববিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গৌরবময় 'ড্র'। ইতিহাস সেই কথাই বলবে। কিন্তু মানুষগুলো সন্তুষ্ট নয়। তাদের অনেকেই বালকের কৌতূহলে চরম কিছু চেয়েছিল।

তাদের মধ্যে একজন আমি। আজ সকাল থেকে আমি জাতীয়তা-বিরোধী চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম। আমি খুসী হয়েছিলাম যখন ম্যাকে জয়সীমার মাঝকাটি শুইয়ে দিয়েছিলেন। আমার ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি ছেলেটিকে টেস্ট সেঞ্চুরীর লোভে পেয়ে বসে। ইতিমধ্যে সে টেস্টের বিশ্বরেকর্ড করে ফেলেছে—পরপর পাঁচ দিন, প্রতিপদ থেকে পঞ্চমী, কোনো না কোনো সময়ে ব্যাট করে। আমি মনেপ্রাণে ভারতের পরাজয় কামনা করেছি, কারণ সে পরাজয় গৌরবময় হোত। আমার মনোভাব ছিল, লজ্জায় সঙ্গে বেঁচো না, গৌরবের সঙ্গে মরলেও বাঁচবে।

যদি ভারত হারত, তাহলে দর্শকের পয়সার মূল্য উঠত। তাহলে ভারত বাঘের মত যুঝত এবং অস্ট্রেলিয়া তেজের সঙ্গে খেলত। এবং সেক্ষেত্রে ভারতের জয়েরও ক্ষীণ আশা থাকত।

এই নিয়ে আমি ক্ষোভ প্রকাশ করছিলুম। শুনে একজন বিবেচনাশীল ব্যক্তি বললেন, আজ কি অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল? আমি বললুম, না। তাহলে ড্র-ই কি সবচেয়ে সঙ্গত সমাধান নয়? আমি তাতেও বললুম—না। অস্ট্রেলিয়াকে নিজের সত্যকার শক্তিতে হারাতে হলে আমাদের 'কাল নিরবধি' এই মহাবাক্যে বিশ্বাস রাখতে হবে। কানপুরে আমরা সুযোগ গ্রহণ করে জিতেছি। সুতরাং যখন অস্ট্রেলিয়াকে সুযোগে বাঁধবার সুযোগ এসেছে, গ্রহণ কর না কেন?

দায়িত্ব দুজনের—রামচাঁদের এবং বেনোডের। রামচাঁদের হারাবার কিছু ছিল না, না ব্যক্তিগত, না দলগত। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিঃশেষিত খেলোয়াড়। তাই 'সাহস অবলম্বন' ও 'সদর্প ভাষণ'ই তাঁর পক্ষে শ্রেয় ছিল। আর যদি দলের কথা বলতে হয়, হারের পাতালে আমরা বাস করছি, একটা ড্র-এর পাথর ছুঁড়ে সে গর্ত বুজবে না।

সকাল থেকে ভারতপক্ষে কি খেলা দেখলুম? জয়সীমার নিখুঁত, নিরুপদ্রব আত্মরক্ষা। নিরাপত্তার ভক্ত হয়ে উঠলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা। জয়সীমা বাঁচাতে পারেন, আগাতে পারেন না। দুঃখের সঙ্গে সকলে ভাবল, গতকাল জয়সীমা বাঁচিয়েছেন, সে কি আজকের অর্ধমৃত জীবন দান করার জন্য? জয়সীমার দোষ নেই, তিনি দ্রুত রান তোলার উপযোগী খেলোয়াড় নন। জয়সীমা নিজের সুপরিকল্পিত, সুপরিমাপিত নিয়মে বাঁধা খেলোয়াড়।

একমাত্র খেলেছেন কেনী এবং দেশাই। মেকিফকে প্রথম বলে প্রায় বাউণ্ডারীতে পাঠিয়েছেন কেনী। এবং আরো বহু মার মেরেছেন, যাতে ছিল সতর্ক তীক্ষ্ণতা। সমুদ্রলঙ্ঘনের পা বাড়িয়ে কেনী বল আটকেছেন, ড্রাইভ করেছেন রোগা হাতে সজোরে, উনপঞ্চাশে পৌঁছে খাবি খেয়েছেন এবং তারপর ক্রিকেটবলে হার্ভের ফুটবল কিক সত্ত্বেও (কারণ হার্ভে কম্পটন নন) পঞ্চাশে পৌঁছেছেন কাঁসর ঘণ্টা সহযোগে। একমাত্র কেনীই ছিলেন চমৎকার আজকের ভারতীয় ব্যাটিং-এ।

আর উৎসাহব্যঞ্জক ছিল দেশাইয়ের সাহসী ইনিংস এবং প্যাটেলের সহসা-জাগরণের বাউণ্ডারীগুলো। দেশাই যেভাবে অফে স্কোয়ারে মেরেছেন, তাতে প্রমাণ হয়েছে তিনি ব্যাটিং-এ একেবারে আনাড়ী নন। প্যাটেল, যিনি 'কি করি কি করি' ভাবে বেনোডকে কয়েকবার থামিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিও বারবার বাউণ্ডারী করেছেন। এ সবই সুন্দর। তবে সুন্দরতর হোত, যদি ব্যাপারটা লাঞ্চের আগে ঘটত। লাঞ্চের পর এ জিনিসে সময় নষ্ট।

সকাল থেকে দর্শক প্রত্যাশায় অধীর। তারা আতসবাজি দেখতে এসেছিল। তারা ভালবাসল না ভারতের শান্তিনীতি। তারা তাই সকাল থেকে দুঃখের সঙ্গে একজন মুস্তাকের অভাব বোধ করল। একটা নির্বোধ ড্র-এর দিকে খেলা এগোতে তারা চটে গেল, এবং চটে গেল যখন দেখল রামচাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ড্র-এর যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা লাভ। তারা চেয়েছিল একদিনের রোমাঞ্চ, পেয়ে গেলে দৈনন্দিনের কেরানী জীবন।

তাই যখন ১টা ৪০ মিনিটের সময় অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং করতে নামল, তখন সকলের একমাত্র উপায় ছিল একটি পরিচিত ক্রিকেটী প্রবচন

আওড়ান—'ক্রিকেট অনিশ্চিতের খেলা'। তারা পরমোৎসাহে কথাটি আওড়াচ্ছিল, কারণ ভারতের পক্ষে ড্র নিশ্চিত। অনিশ্চিত যদি কিছু ঘটে, সে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে।

তবু ক্ষীণ আশা—অস্ট্রেলিয়া তো। তারা কি ১৫৫ মিনিটে ২০২ রান তোলার চেষ্টা করবে না। নজির যথেষ্ট আছে। স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

জনসাধারণ যথেষ্ট করল অস্ট্রেলিয়াকে শেষ করার। কিন্তু ভারতীয় বোলাররা কিছু করলেন না, বোধহয় ইডেন গার্ডেনের সর্বংসহা পিচ তাঁদের কিছু করতে দিল না! জনতা বলল, দেশাই যদি আউট করতে পার, তোমাকে একশো বলদের রথে চাপাব। বলল, বোরদে তোমার বৃহস্পতির দশা চলছে, ভুলো না। জনতা জানে, কেবল বোলারের হাতই আউট করে না, দর্শকের গলাও করে। তাই তারা কণ্ঠে তুলল সাগর-গর্জন। ক্রুদ্ধ বাঘের লেজের মত তাদের হাততালি আছড়াতে লাগল। 'বলহরি হরিবোল', 'রামনাম সত্য হ্যায়'—ইত্যাদি ধ্বনিতে কেওড়াতলা-নিমতলার পরিবেশ সৃষ্টি করল। যখন বোরদের প্রথম বল হার্ভের প্যাডে লাগল, চল্লিশ হাজার কণ্ঠ আম্পায়ারকে আবেদন জানাল—কিন্তু কিছু হোল না। কিছু করতে পারলেন না দুরন্ত দেশাই, মনোহর বোরদে, ছিপছিপে নাদকার্নি কিংবা কানাডিয়ান ইঞ্জিনবৎ রামচাঁদ। পদ্মশ্রীতে ও প্রত্যাশায় ভারগ্রস্ত প্যাটেল মহত্বের বিনয়ে অবনত রইলেন। এক সময় স্টেডিয়াম স্তব্ধ হয়ে এল। হু' একটি অত্যুৎসাহীর ছিন্ন কণ্ঠ ছন্দোহীনভাবে বাজল, কান্নার সুরে কখনো বিউগিল ডাকল,—তবু কিছু হোল না। শেষকালে সকলে দাবি করল গোপীনাথকে বল দেওয়া হোক। কৌতুকটি বাদ যায় কেন? এমনকি হার্ভে যখন কণ্ট্রাক্টরের বলে কট ও বোল্ড আউট হলেন, যার ঠিক আগের মুহূর্তে ৩৫৲ টাকার আসনে এক বৃদ্ধ টফি-চকোলেটের হরির লুট দিচ্ছিলেন এবং ছেলেবুড়ো সকলে লুফছিল—সে ঘটনাও কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি করল না তাৎপর্য-উৎসুক লেখকের কাছে। আর দর্শকরা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল অস্ট্রেলিয়ানদের খেলা দেখে।

দেখা গেল মধ্যবিত্ত মন এবং গৃধ্নু বণিকবৃত্তি গ্রাস করেছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটকে। মানুষের আনন্দের কোনো মূল্য নেই তার কাছে। হার্ভে আউট হয়ে যেতে 'অন্তত ও'নীলের খেলা দেখা যাবে'—এই কামনার সম্মান পর্যন্ত করলেন না বেনোড। নিজে এলেন ব্যাট করতে। ব্রাডম্যান তো নেই, ব্রাডম্যানের ছায়াও নেই কোথাও। অস্ট্রেলিয়ার উজ্জ্বল খেলা—স্বপ্ন হয়ে রইল। হার্ভে যেমন খেললেন, যে নিখুঁত আত্মরক্ষাত্মক ভঙ্গিতে, সে পঞ্চম দিন, দল যখন নিরাপদ অবস্থায়, তখনকার ক্রিকেট নয়,—স্কুল বালকদের শিক্ষাদানের উপযোগী নির্ভুল টেকনিকের প্রদর্শনী। পাঁচ দিনের শেষে ক্লান্ত আম্পায়ারও বোধহয় একটু লোভী হয়েছিলেন দিনান্ত রক্তরাগের আশায়। ব্যর্থ আশা। মৃত শাবকের চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে রইল দর্শক। একসময় ঢুলে পড়লেন একজন মহিলা। ঘটনাটি আমি নোটে টুকলুম। আমার বৌদি বসেছিলেন পাশে। বললেন, 'ওটা কেটে ফেলা হোক'।—'কেন'?—'চেয়ে দেখ'। দেখি দু' চারটি পুরুষও ঢুলে পড়েছেন এপাশে ওপাশে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, খেলা প্রায় শেষ—পিছন থেকে শুনলুম একটি বীতশ্রদ্ধ গলা,—এক ছোকরা তার বন্ধুকে বলছে,—কাল কত কাব্য হবে কাগজে—আসন্ন সন্ধ্যা, ছায়া নামছে গড়িয়ে, মাঠে অগণিত জনতার ছুটাছুটি। যাচ্ছেতাই।

আমি সত্যই ভেবেছিলাম—ভাঙা খেলা নিয়ে কিছু সুন্দর কথার বিন্যাস করব। কদাপি না। 'বিয়ে বাড়ির পরদিন', 'হাটের শেষ' 'দশমী দিবস'—এ সব বাজে উপমা। আট আনার কোকাকোলা চার আনার পুরোনো দরে ফিরে এসেছে, চপ কাটলেট প্রায় বিনামূল্যে বিকোচ্ছে, সে দিকে তাকালুম না—জনতার সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিলুম ঔদাস্যভরে। মনে মনে বললুম, আর আসছি না ক্রিকেট দেখতে। কখনই না।

ভারত প্রথম ইনিংস—১৯৪

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—৩৩১

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস

কুন্দরাম ব ডেভিডসন	...	০
কন্ট্রাক্টর ক ডেভিসন ব বেনোড	...	৩০
পি রায় এল বি ডবলিউ ব বেনোড	...	৩৯
নাদকার্নি ক গ্রাউট ব লিণ্ডওয়াল	...	২৯
কেনী ক গ্রাউট ব ম্যাকে	...	৬২
গোপীনাথ ক গ্রাউট ব বেনোড	...	০
বোরদে ব মেকিফ	...	৫০
রামচাঁদ ব বেনোড	...	৯
জয়সীমা ব ম্যাকে	...	৭৪
দেশাই নট আউট	...	১৭
প্যাটেল ক বেনোড ব ডেভিডসন	...	১২
	অতিরিক্ত	১৭
	মোট	৩৩৯

বোলিং

	ও	মে	রান	উইকেট
ডেভিডসন	৩৬.২	১৩	৭৬	২
মেকিফ	৩২	২	৪১	১
লিণ্ডওয়াল	২০	৬	৬৬	১
বেনোড	৪৮	২৩	১০৩	৪
ম্যাকে	২১	৭	৩১	২

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস

ক্যাম্ভেল নট আউট	...	৬২
হার্ভে ক ও ব কন্ট্রাক্টর	...	৩৬
ম্যাকডোনাল্ড রান আউট	...	৬
বেনোড নট আউট	...	১০
	অতিরিক্ত	৭
	মোট (২ উইকেট)	১২১

বোলিং

	ও	মে	রান	উইকেট
দেশাই	১১	৪	১৮	০
রামচাঁদ	৩	২	৪	০
প্যাটেল	৭	১	১৫	০
নাদকার্নি	৭	৪	১০	০
বোরদে	১৩	১	৪৫	০
জয়সীমা	৬	২	১৩	০
কন্ট্রাক্টার	৫	১	৯	১

আর মাঠে আসবো না! আসি কি নিজের ইচ্ছায়?

'তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে,

সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে'।

না এসে পারি না তাই আসি। ফুটবল-মাঠে দেখেছি অশীতি-উত্তীর্ণ বৃদ্ধ এসেছেন নাতি নাতনীর হাত ধরে। দেখতে প্রায় পান না। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, চোখের তো এই অবস্থা, খেলা দেখেন কি করে? বৃদ্ধ হেসেছিলেন। মেঘভাঙা বৈকালী আলো এসে পড়েছিল বৃদ্ধের মুখে। তার দিকে ছায়াচ্ছন্ন অস্বচ্ছ চোখ তুলে বৃদ্ধ যে কথা বললেন, কোলাহলের মধ্যেও তার সবকটি শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম,—আমি কি এদের দেখি? দেখি শিবে—বিজে—গোষ্ঠকে।

ক্রিকেটও তাই। অনেক বেশী করে তাই। যে খেলোয়াড়টিকে এখন প্রত্যক্ষ দেখছি, তার মধ্যে সেই সঙ্গে সন্ধান করছি পুরাতনের। বর্তমানের হাতে অতীতের ইতিহাস। নতুন পাত্রের আধারে পুরোনো শ্যাম্পেনের গাঢ় রঙে রঙিন হয়ে আছে ক্রিকেটের জীবন, ক্রিকেটের স্বাস্থ্য।

সেই সকালটিকে ফিরে পাবার জন্য আমি আমার জীবনের অনেক সকাল সন্ধ্যা দান করতে রাজী আছি, যে সকালে প্রথম হাজির হয়েছিলুম ইডেনে। থমকে দাঁড়িয়েছিলুম মাঠের পাশে। পুলকে অপলক চোখ। হেঁটেছি তারপরে অনেক পথ। পথে ও পথের প্রান্তে দেখেছি অনেক কিছু। যত দেখেছি, হারিয়েছি না-দেখার আনন্দ। জানার ক্লান্তি কপালের রেখায়, চোখের কুঞ্চনে। তাই ফিরে যাই ইডেনে নিজেকে ফিরে পাবার জন্য। ইডেন গার্ডেন আমার ফিরে যাওয়ার নিকেতন।

ইডেনে আসবো না!

এম সি সি-র সভাপতি হওয়ার পরে লর্ডস মাঠে প্রবেশ করছেন স্যার পেলহাম ওয়ার্ণার, ক্রিকেটের ধর্মপিতা। তিনি বলছেন,—

"আমার জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্ত এল···আমি জীবনের শিখরে এখন। লর্ডসে উপস্থিত হলুম। সেণ্ট জনস্ উড রোড দিয়ে যাবার সময়ে ১৮৮৭

সালের একটি তারিখকে স্মরণ না করে পারলুম না, যেদিন লর্ডসে আমার প্রথম পদার্পণ। যেতে যেতে ইচ্ছে হোল চলে যাই জীবনগ্রন্থের পাতা উল্টে ৬৩ বছর আগে। 'সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট' গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পারলুম না, সাধারণ দর্শকের ঘোরানো দরজা দিয়ে প্রবেশ করলুম লর্ডসে, যেমন করেছিলুম প্রথম দিনে যেদিন মিঃ ব্রাউন আমাকে এনেছিলেন। প্রবেশপথ ঠিক একই আছে, সেই ঘোরানো দরজা, অবশ্য পুরাতনের বদলে এখন নূতন। মাঠে প্রবেশ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কয়েক মুহূর্ত। মনে তরঙ্গ উঠতে লাগল। সাম্রাজ্যের দূর প্রদেশ থেকে আগত ইটন-জ্যাকেট আর টপ হ্যাট-পরা ৬৩ বছর আগেকার সেই বালকটি কি আজ সত্যই লর্ডসের সভাপতি হয়েছে—হতে পারে? এ যে একটা স্বপ্ন, এত ভাল স্বপ্ন যে, যেন সত্য হবার জন্য সৃষ্ট নয়।"

সভাপতি-কালের শেষ হোল এক সময়। মহান পেলহ্যামের বিদায়ী কণ্ঠ শুনতে পেলুম,—

"আমি আর সভাপতি নই। কৃতজ্ঞতা আর গর্বের সঙ্গে বিদায় নিয়েছি। ক্রিকেট সর্বোচ্চ যে সম্মান দিতে পারে, তার গৌরবে মন ভরে আছে। ......আমার দীর্ঘ ইনিংস শেষ হয়ে আসছে। আরবেরা বলে, প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যলিখন তার কণ্ঠে ঝুলে আছে। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, সকলই লেখা হয়ে গেছে আগেই, আমাদের জন্মক্ষণে। সে কথা সত্য কি মিথ্যা জানি না; এইটুকু জানি যে, ক্রিকেট একটি অত্যন্ত সুখী জীবনে সুখের প্রধানতম কারণ হয়ে আছে।"

ক্রিকেটের এই সেন্টিমেন্ট। মাঠের এই সেন্টিমেন্ট। স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্ণারের কাছে লর্ডসের, পি চৌধুরীর কাছে ইডেনের। চৌধুরী আমাদের বলেছিলেন, দেখ, তোদের রণজি স্টেডিয়াম শেষ হওয়ার আগে যেন আমার শেষ হয়। আমরা সবিস্ময়ে তাকাতে বললেন, বুঝেছি, কথাটা অবুঝ ছেলেমানুষি ঠেকল। তবু কি জানিস, ঐ দেবদারু আর ঝাউগুলো এক হয়ে আছে অনেক দিন ধরে ইডেনে। ওরাও আমার সঙ্গে খেলা দেখেছে, আমার অনেক আগে থেকে। ওদের লুটিয়ে দিয়ে যদি সকলের

আরামের আসন তৈরী হয়, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমরা ভাই বুড়ো হয়ে গেছি, আর কেন, যখন যেতেই হবে ওদের আগেই যেন যাই।

যুক্তিহীন অভিমান। এমনি যুক্তিহীন ভাবাবেগ ভারতীয় খেলোয়াড়টির। সে লর্ডসে প্রথম ঢুকছে। লর্ডসের মক্কায় যারা প্রবেশ করে তীর্থযাত্রীরূপে, তারা টুপি খুলে ফেলে মাথা থেকে। খালি মাথায় ভারতীয়টি প্রবেশ করছে। ১৯৪৬-এর 'ভয়াবহ' প্রথম বসন্ত। বৃষ্টিতে বরফে নারকীয়। ভারতীয় খেলোয়াড়টি নীল হয়ে গেছে শীতে। কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে, দাঁতে দাঁত বাজছে, তুষারে বৃষ্টিতে মাথার চুল মুখে গালে লেপটে আছে। তবু সে খালি-মাথা, মাথা-নামানো।

উদারস্বভাব এক ইংরেজ খেলোয়াড়ের মনে সেটা বাজল। বিদেশীরা এত কষ্ট সহ্য করবে কেন? ইংরেজের অলিখিত রীতি মানার দায় তাদের না থাকাই উচিত। ইংরেজ খেলোয়াড়টির ত্ব'চোখের বিস্ময় আর প্রতিবাদ ভারতীয় খেলোয়াড়ের চোখে পড়ল। তখন সে বলল, অবিস্মরণীয় সম্ভ্রমের সুরে—পারলে আমি জুতো খুলে খালি পায়ে হেঁটে যেতাম। এ আমার কাছে মন্দির, তীর্থ।

ইডেন গার্ডেন আমার কাছে মন্দির নয়, খেলাঘর। কিন্তু অপরূপ সে খেলাঘর। সেখানে আছি নয়ন মেলে। মাঠ বা খেলা নিয়ে অন্যের ভাববাহুল্যে কৌতুক বোধ করি, আবার নিজেই ভেসে যাই আবেগের তরঙ্গে। তখন মনে হয়, হয়ত ওভাল মাঠের পায়রার মত কিছু হয়ে আমাকে জন্মাতে হবে। পায়রাগুলো উড়ে থাকে ওভালের আকাশে আবেশ-মাখা পাখা মেলে। যখনি তার ওভালের অঙ্গনে দেখতে পায় খেলার লাবণ্যচ্ছন্দ, অমনি আকাশে উড়তে উড়তে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্তির মধুর কূজন করে ওঠে। জনৈক ক্রিকেটার পায়রাদলের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, ওরা কি লোকান্তরিত ক্রীড়ানটদের বিমুগ্ধ আত্মা, নবদেহ নিয়ে ফিরে এসেছে নিজেদের অতীত সংগ্রাম ও সাফল্যের রঙ্গভূমির উপর ডানা মেলে? খেলোয়াড়টি বলাকাদলের পাখায় প্রত্যাবর্তনসঙ্গীত শোনেন, আর তাঁর মনে হয়, হয়ত একদিন তিনিও আসবেন, অমনি একটি পাখীর রূপ ধরে তাঁর লীলাক্ষেত্রের উপর, কে বলতে পারে!

আমরা যারা খেলা দেখছি, আমাদের ভাগ্যেও কি অমনি একটি জীবজন্ম আছে ?

জানি না সেকথা সত্য কি না। মনে পড়ে একটি রাতের কথা। ঘাসে ঢাকা গঙ্গার ঢালু পাড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ক্লান্ত শরীরে গিয়েছিলুম প্রিন্সেপ ঘাটের জেটির ধারে। গ্রীষ্ম কাল। গঙ্গার হাওয়া আর ঘাসের বিছানায় শ্রান্ত দেহ কখন ঢলে পড়েছিল জানি না। চোখ মেলে দেখলুম আলোর আর মায়ার জগৎ। আকাশ ভরা নক্ষত্র। জাহাজে জাহাজে আলোর দীপাবলি। অনেক দূরে হাওড়া ব্রিজে 'জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে প্রদীপমালার মত'। ঘুমের ঘোরে অপূর্ব মনে হোল চারিদিক। নিজের অস্তিত্ব কেমন অস্পষ্ট। আবার চোখ বুজলুম। ছলছল কলকল শব্দের জলতরঙ্গ আমাকে ঘিরে ফেলল। জলের শব্দে, আলোর 'শব্দে' আচ্ছন্ন চেতনার মোহ ছিন্ন করে এক সময়ে উঠে পড়তে হোল। অনেক রাত্রি। পিছনে পড়ে রইল কালো লাবণ্য নিয়ে মধ্যরাত্রির গঙ্গা, হাঁটতে সুরু করলুম। এক সময় এসে পৌঁছলুম ইডেনের ধারে। কি মনে হোল পাঁচীল টপকে বাগানে ঢুকলুম। মাঠের একেবারে পাশে। উঁচু উঁচু দেবদারু, পাইন, ফার গাছগুলো। হাওয়া বয়ে এল গঙ্গার দিক থেকে। স্তব্ধতা ভেঙে সন্ সন্ করে উঠল সকলে। ওরা বসেছে নিজেদের সভাগৃহে। হাওয়ায় পাতা উড়িয়ে ওরা আলাপ করছে। কত স্মৃতি, সুখ, আর বেদনায় ভরা মধ্যরাত্রির আলাপচারি। আমার কথা কি ওরা বলছে, যে আমি অগণ্যের নগণ্য ? ওদের অত পাতার গ্রন্থে কি আমার নাম লেখা নেই, যে গ্রন্থে আঁকা আছে খেলার অমর নটদের নাম ? সেই মধ্যরাত্রিতে অব্যক্ত উপেক্ষার একটা বেদনায় বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। তখন মাঠ ডাকল, আরো সরে এস, মাঝখানে এস! শ্রীকান্তকে শ্মশানের ডাকের মত ব্যাপার হোল যে! কৌতুকে কৌতূহলে মাঠের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। খুব ঘুম পাচ্ছে। রাত্রি অনেক হয়েছে। ইচ্ছে হোল এইখানে, মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ি, ছোটছেলের মত। মাঠের এত বয়স, তার কাছে কত ছোট আমি। এই মাঠে কে আমাকে হাত ধরে এনেছিল ?

ফুটপাথে উঠে বুঝলুম, শেষ ট্রাম বহুক্ষণ আগে চলে গেছে। হাঁটতে শুরু করলুম বাড়ীর পথে। মন ভরে রইল একটি কবিতায়—

ক্রিকেট ভালবেসে আসে কজন জানি না,
ক্রিকেট ভালবেসে আসে মোটেই মানি না।
রোদের কোলে হেসে আসে মধুর প্রাণনা,
মাটির ছেলে মাঠে আসে কারণ জান না?

ইডেনে আবার আসব।